তিন গোয়েন্দা

ভলিউম ২৯

রকিব হাসান

সেবা প্রকাশনী

কিশোর থ্রিলার

ভলিউম ২৯

তিন গোয়েন্দা

১১৬, ১১৭, ১২০

রকিব হাসান

সেবা প্রকাশনী

তি. গো. ভ. ১/১[তিন গোয়েন্দা, কঙ্কাল দ্বীপ, রূপালী মাকড়সা] ৩৫/-
তি. গো. ভ. ১/২[ছায়াশ্বাপদ, মমি, রত্নদানো] ৩৫/-
তি. গো. ভ. ২/১[প্রেতসাধনা, চক্তচক্ষু, সাগরসৈকত] ৩২/-
তি. গো. ভ. ২/২[জলদস্যুর দ্বীপ, ১, ২ সবুজ ভূত] ২৮/-
তি. গো. ভ. ৩/১[হারানো তিমি, মুক্তোশিকারী, মৃত্যুখনি] ৩০/-
তি. গো. ভ. ৩/২[কাকাতুয়া রহস্য, ছুটি, ভূতের হাসি] ৩০/-
তি. গো. ভ. ৪/১[ছিনতাই, ভীষণ অরণ্য, ১, ২]
তি. গো. ভ. ৪/২[ড্রাগন, হারানো উপত্যকা, গুহামানব]
তি. গো. ভ. ৫ [ভীতুসিংহ, মহাকাশের আগন্তুক, ইন্দ্রজাল] ৩০/-
তি. গো. ভ. ৬ [মহাবিপদ, খেপা শয়তান, রত্নচোর] ২৮/-
তি. গো. ভ. ৭ [পুরনো শত্রু, বোম্বেটে, ভূতুড়ে সুড়ঙ্গ] ৩০/-
তি. গো. ভ. ৮ [আবার সম্মেলন, ভয়ালগিরি, কালো জাহাজ] ৩০/-
তি. গো. ভ. ৯ [পোচার, ঘড়ির গোলমাল, কানা বেড়াল] ৩২/-
তি. গো. ভ. ১০[বাক্সটা প্রয়োজন, খোঁড়া গোয়েন্দা, অথৈ সাগর ১] ৩২/-
তি. গো. ভ. ১১[অথৈ সাগর ২, বুদ্ধির ঝিলিক, গোলাপী মুক্তো] ৩০/-
তি. গো. ভ. ১২[প্রজাপতির খামার, পাগল সংঘ, ভাঙা ঘোড়া] ৩৪/-
তি. গো. ভ. ১৩[ঢাকায় তিন গোয়েন্দা, জলকন্যা, বেগুনী জলদস্যু] ২৮/-
তি. গো. ভ. ১৪[পায়ের ছাপ, তেপান্তর, সিংহের গর্জন] ৩৪/-
তি. গো. ভ. ১৫[পুরনো ভূত, জাদুচক্র, গাড়ির জাদুকর] ৩৫/-
তি. গো. ভ. ১৬[প্রাচীন মূর্তি, নিশাচর, দক্ষিণের দ্বীপ] ৩৫/-
তি. গো. ভ. ১৭[ঈশ্বরের অশ্রু, নকল কিশোর, তিন পিশাচ] ৩২/-
তি. গো. ভ. ১৮[খাবারে বিষ, ওয়ার্নি বেল, অবাক কাণ্ড] ৩২/-
তি. গো. ভ. ১৯[বিমান দুর্ঘটনা, গোরস্থানে আতঙ্ক, রেসের ঘোড়া] ৩২/-
তি. গো. ভ. ২০[খুন!, স্পেনের জাদুকর, বানরের মুখোশ] ৩২/-
তি. গো. ভ. ২১[ধূসর মেরু, কালো হাত, মূর্তির হুঙ্কার] ৩৭/-
তি. গো. ভ. ২২[চিতা নিরুদ্দেশ, অভিনয়, আলোর সঙ্কেত] ৩৩/-
তি. গো. ভ. ২৩[পুরানো কামান, গেল কোথায়, ওকিমুরো কর্পোরেশন] ৩৫/-
তি. গো. ভ. ২৪[অপারেশন কক্সবাজার, মায়া নেকড়ে, প্রেতাত্মার প্রতিশোধ] ৩৩/-
তি. গো. ভ. ২৫[জিনার সেই দ্বীপ, কুকুর খেকো ডাইনী, গুপ্তচর শিকারী] ৩৫/-
তি. গো. ভ. ২৬[ঝামেলা, বিষাক্ত অর্কিড, সোনার খোঁজে] ৩৬/-
তি. গো. ভ. ২৭[ঐতিহাসিক দুর্গ, রাতের আঁধারে, তুষার বন্দি] ৩৬/-
তি. গো. ভ. ২৮[ডাকাতের পিছে, বিপজ্জনক খেলা, ভ্যাম্পায়ারের দ্বীপ] ৩৯/-

---

বিক্রয়ের শর্ত: এই বইটি ভাড়া দেয়া বা নেয়া, কোনভাবে প্রতিলিপি তৈরি করা, এবং স্বত্বাধিকারীর লিখিত অনুমতি ব্যতীত এর কোন অংশ মুদ্রণ বা ফটোকপি করা নিষিদ্ধ।

আরেক ফ্রাঙ্কেনস্টাইন

প্রথম প্রকাশ: আগস্ট, ১৯৯৮

ঝড় একবার হয়ে গেছে। আকাশের অবস্থা দেখে মনে হচ্ছে শেষ হয়নি, আবারও হবে।

লস অ্যাঞ্জেলেসের ছোট্ট শহর হিলটাউনে দোকানপাট সব আটটা বাজলেই বন্ধ হয়ে যায়। আর এখন বাজে রাত এগারোটা। তার ওপর ঝড়। ঘরের বাইরে লোকজন স্বভাবতই কম।

এখানকার স্ট্রিপ মলটা এমন আহামরি কিছু নয়। একটা লন্ড্রি, একটা ডিপার্টমেন্টাল স্টোর এবং একটা ভিডিও আর্কেড, ব্যস। আর কিছু নেই। স্টোরটা বন্ধ হয়ে গেছে আগেই । লন্ড্রিও বন্ধ। খোলা রয়েছে কেবল ভিডিও আর্কেড। মাঝরাতের আগে কখনোই বন্ধ হয় না।

ভেজা, তেলতেলে হয়ে আছে পার্কিং লট। চকচক করছে। একটামাত্র গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে আজ। একটা ক্লাসিক কনভার্টিবল। ছাতটা খোলা। যেন বৃষ্টিতে ভেজার পরোয়া নেই।

ওটার মালিক লেসলি কার্টারিসও বৃষ্টিকে পরোয়া করে না। করার উপায়ও নেই। তাহলে পেট চলবে না। ঝড়ের মধ্যেও বাড়িতে বাড়িতে পিজ্জা সাপ্লাই দিতে হয়েছে ওকে। বিরক্ত হয়ে গেছে। তাই আর্কেডে এসেছে ভিডিও গেম মেশিনের ওপর রাগ ঝাড়তে।

সে ভেবেছে সে-ই একমাত্র কাস্টোমার, তাকে বিরক্ত করবে না কেউ। ভারটিউয়াল ম্যাসাকার-২ খেলছে। নিজেকে পর্দার একজন ভারটিউয়াল ফাইটার কল্পনা করে নিয়ে তাক করে লাথি মারছে শত্রুকে। যদিও হাই স্কুলের ফুটবল ম্যাচে খেলার মত আনন্দ নেই এতে। কিন্তু স্কুলে খেলতে যাওয়ার আর উপায় নেই। দুই বছর আগেই সে পাট চুকিয়ে এসেছে।

বোতামে টিপ দিয়ে গাড়ির গিয়ারের মত করে জয়স্টিক ধরে টান দিল লেসলি। কয়েক মাস আগেই হাই স্কোর লিস্টে নাম উঠে গেছে তার। BPF নাম সই করে রেখেছে কোন একজন হেরে যাওয়া খেলোয়াড়। শয়তানি করে সমস্ত হাই স্কোর লিস্ট লক করে দিয়েছে আজকে। চাপাচাপি করে তাতে ঢুকে পড়ার চেষ্টা করছিল লেসলি, কিন্তু ভরসা কম। ইতিমধ্যেই দুজন খেলোয়াড়কে হারিয়ে বসে আছে। তৃতীয়টাকেও হারাতে চলেছে···

'এই যে, ভাই,' পেছন থেকে ডেকে বলল একটা ভোঁতা কণ্ঠ, 'আমি খেলছিলাম ওখানে।'

কাঁধের ওপর দিয়ে ঘুরে তাকাল লেসলি। ফ্যাকাসে চেহারার একটা ছেলে দাঁড়িয়ে আছে পেছনে। মাথায় তেলকালি লাগা বেজবল ক্যাপ। গায়ের

টি-শার্টেও কালি।

'বাথরুমে গিয়েছিলাম,' ছেলেটা বলল।

'তো আমি কি করব?' কর্কশ জবাব দিল লেসলি। দেখেই রাগ লাগছে তার। এই ছেলেটাই বোধহয় সেই হেরে যাওয়া খেলোয়াড়। বয়েস আঠারো-উনিশ। বখাটে চেহারা। মোটেও পছন্দ হলো না লেসলির। তার ধারণা, পাড়ায় পাড়ায় মস্তানি আর মেয়েদের পেছনে লাগা ছাড়া এর অন্য কোন কাজ নেই।

পর্দার দিকে নজর ফেরাল সে। দেরি হয়ে গেছে। কারাতের কোপ মেরে তার ভারচুয়াল ফাইটারের ঘাড় মটকে দিয়েছে শত্রুপক্ষের এক যোদ্ধা। তাকে উদ্দেশ্য করে ব্যঙ্গভরা মন্তব্য আর পিত্তিজ্বালানো যান্ত্রিক হাসি ছুঁড়ে দিল মেশিন। আরও রাগিয়ে দেয়ার জন্যেই যেন উজ্জ্বল লাল আলোয় 'গেম ওভার' লেখাটা টিপটিপ করতে লাগল চোখের সামনে।

বিরক্ত হয়ে মেশিনকে এক চড় মারল লেসলি। ঝটকা দিয়ে ঘুরে তাকাল হাড্ডিসার ছেলেটার দিকে। সব রাগ গিয়ে পড়ল ওর ওপর। খেলা পণ্ড করেছে বলে। গর্জে উঠল, 'দিলে তো!'

ক্যাপের ছায়ায় মুখের অনেকটাই আড়াল করে রেখেছে ছেলেটা। 'খেলা তো আপনি আমারটা নষ্ট করলেন। আমি ওখানে খেলছিলাম। মাঝখান থেকে আপনি ঢুকে পড়লেন।'

'তুমি গেলে কেন?'

'বাথরুম পেলে কি করব? আপনি অন্য কোন মেশিনে খেলতে পারতেন। এটাতেই কেন?'

'তুমি যে খেলছিলে কি করে জানব?'

'খেলাটা খোলা ছিল। ছিল না?'

'কতজনে অর্ধেক খেলে ফেলে রেখে চলে যায়...'

'বিলিই খেলছিল ওখানে,' বলে উঠল আরেকটা কণ্ঠ। 'আপনি ওর খেলাটা নষ্ট করেছেন।'

ঘুরে তাকিয়ে মোটাসোটা একটা ছেলেকে দেখতে পেল লেসলি। লম্বা চুল। কোমরে ঝোলানো কয়েন রাখার ব্যাগ। ওর নাম উইলিয়াম ব্রেজব্রুক। কিন্তু সবাই ডাকে পটেটো। নামটা চেহারার সঙ্গে মানিয়ে গেছে। ডাকতে ডাকতে এটাই নাম হয়ে গেছে এখন। আসল নামে কেউ ডাকে না। লোকে জিজ্ঞেস করলে সে নিজেও এই নাম বলে। বোধহয় আসল লম্বা নামটা ভাল লাগে না তারও, খাটোটাই পছন্দ।

'তুমি আবার কে?' খেঁকিয়ে উঠল লেসলি। 'ওর চামচা?'

'না, নাইট ম্যানেজার,' জবাব দিল পটেটো।

মেশিনের দিকে সরে এল বিলি। 'সরুন।'

লেসলির সন্দেহ হলো এই হাড্ডিসার ছেলেটাই মেশিনের রহস্যময় BPF। রাগ বেড়ে গেল তার। বিলির বুকে হাত রেখে জোরে এক ধাক্কা মারল।

একটা টেবিলের পায়ায় পা বেধে উল্টে পড়ল বিলি। টুপিটা খুলে পড়ে গেল। অদ্ভুত একটা দাগ দেখা গেল মাথার একপাশে।

ভুরু কুঁচকে গেল লেসলির। কিসের দাগ? মগজ অপারেশন করেছিল নাকি? ঠিক কাটা দাগের মত নয় দাগটা। বরং পোড়া দাগের সঙ্গে মিল বেশি।

হামাগুড়ি দিয়ে সরে গেল বিলি। লেসলির মনে হলো, একটা কিলবিলে পোকা পায়ের চাপে ভর্তা হওয়ার ভয়ে তাড়াতাড়ি সরে যেতে চেষ্টা করছে নোংরা পাথরের তলায়। কল্পনাই করতে পারল না পোকাটা কি ভয়াবহ বিষাক্ত!

ঠিক এই সময় বিদ্যুৎ চলে গেল।

অন্ধকারে চিৎকার করে উঠল পটেটো, 'মানা করেছিলাম, শুনলেন না! নিজের সর্বনাশ নিজে ডেকে আনলেন! এখন আর কেউ ঠেকাতে পারবে না ওকে...'

★

মাটিতে পড়ে থেকে ধীরে ধীরে লম্বা দম নিল বিলি ফক্স। রাগ কমানোর জন্যে নয়, বরং বাড়ানোর জন্যে। আর্কেড এখন অন্ধকার। পার্কিং লটের বৃষ্টিভেজা বাতিটা থেকে মলিন আলোর আভা এসে পড়েছে ঘরে।

ক্যাপটা কুড়িয়ে নিয়ে উঠে দাঁড়াল সে। শান্ত ভঙ্গিতে মাথায় পরল আবার। আগুন জ্বলছে মনে। কিন্তু প্রকাশ পেতে দিচ্ছে না। উত্তেজিত হয়ে বিস্ফোরণ ঘটানোর চেয়ে এভাবে আস্তে আস্তে খেলে যাওয়ার মজা অনেক বেশি।

কোণের জুকবক্সটা গমগম করে বেজে উঠল হঠাৎ। ঘরে বিদ্যুৎ নেই, তা-ও বাজছে। কোথা থেকে শক্তি পেল ওটা বুঝতে পারল না লেসলি। 'দি নাইটওয়াকার' বাজতে লাগল কানফাটা শব্দে। গানটা যে বিলির প্রিয় গান, তা-ও জানা নেই ওর।

লেসলির কাছে সরে এল বিলি। চিবিয়ে চিবিয়ে বলল, 'তোমার দান তুমি খেলেছ। এবার আমার পালা।'

বিলির কণ্ঠে এমন কিছু রয়েছে, অস্বস্তি বোধ করতে লাগল লেসলি। আর লাগার সাহস পেল না। পিছিয়ে এল। 'হ্যাঁ, খেয়ে আর কাজ পেলাম না, তোমার সঙ্গে ফালতু সময় করি!' কণ্ঠের সেই একটু আগের জোরটাও নেই আর।

দরজার দিকে রওনা দিল সে।

★

পার্কিং লটের খোলা বাতাসে বেরিয়ে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল লেসলি। আর্কেডের ব্যাপারটা বুঝতে পারছে না সে—সময়মত বিদ্যুৎ চলে যাওয়া, বিদ্যুৎ ছাড়াই জুকবক্স বেজে ওঠা...কৌতূহল থাকলেও সাহস দেখাতে পারল না। বরং তাড়াতাড়ি পালিয়ে যাওয়ার একটা প্রবল ইচ্ছে তাগাদা দিচ্ছে মনে।

গাড়িতে উঠে ইগনিশনে মোচড় দিল সে। ফুল ভলিউমে বেজে উঠল রেডিও। গানটা পরিচিত। অতি পরিচিত।

দি নাইটওয়াকার!

আর্কেডের জুকবক্সে এই গানই বাজছিল।

ও কিছু না! স্রেফ কাকতালীয়! মন থেকে ভয় ঝেড়ে ফেলার চেষ্টা করল। মোচড় দিয়ে অফ করে দিল রেডিওর সুইচ।

কিন্তু বেজেই চলল গান।

অসম্ভব! এ হতেই পারে না! নব ঘুরিয়ে কাঁটাটা পার করে দিল ডজনখানেক স্টেশন।

গান বন্ধ হলো না।

ফিরে তাকিয়ে দেখল আর্কেডের দরজায় এসে দাঁড়িয়েছে হাড্ডিসার ছেলেটা। শান্ত ভঙ্গিতে তাকিয়ে আছে এদিকে।

ফার্স্ট গিয়ার দিল লেসলি। অ্যাক্সিলারেটর চেপে ধরল। ভেজা চত্বরে পিছলে গেল চাকা। তারপর এগোতে শুরু করল।

মনে পড়ল, কিছুদিন থেকে বিচিত্র সব ঘটনা ঘটছে এই ছোট্ট শহরটাতে। রহস্যময়ভাবে মারা যাচ্ছে মানুষ। চৌরাস্তায় পর পর কতগুলো দুর্ঘটনা ঘটেছে, সেগুলোও রহস্যময়। যারা ভূত বিশ্বাস করে, তাদের কেউ কেউ বলছে ভূতের উপদ্রব।

আর্কেডের ঘটনাটাও ভূতুড়ে মনে হচ্ছে লেসলির কাছে। বিদ্যুৎ ছাড়া যন্ত্র বাজে কিভাবে? বুঝে গেছে, আর্কেডের দরজায় দাঁড়ানো ওই ছেলেটার সঙ্গে এসবের নিশ্চয় কোন সম্পর্ক রয়েছে। অতএব পালাতে হবে ওর কাছ থেকে। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব।

গেটের কাছে এসে বন্ধ হয়ে গেল এঞ্জিন। মিসফায়ার করল না। পুটপুট করল না। কোন আগাম সঙ্কেত দিল না। এঞ্জিন বন্ধ হওয়ার কোন রকম নিয়ম-কানুন না মেনে স্রেফ থেমে গেল। গাড়িটাও দাঁড়িয়ে গেল সঙ্গে সঙ্গে।

মরিয়া হয়ে ইগনিশনে মোচড় দিতে লাগল লেসলি। কাজ হলো না। চালু হলো না এঞ্জিন। কোন শব্দই করল না।

রেডিওতে বেজেই চলেছে দি নাইটওয়াকার।

দরজায় একই ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে তাকিয়ে আছে আজব ছেলেটা।

হঠাৎ আলোর বিস্ফোরণ ঘটল যেন। সেই সঙ্গে তীক্ষ্ণ একটা শব্দ। ঝট করে ঘুরে গেল লেসলির মুখ। গাড়ির অ্যানটেনায় লাগানো পিজ্জা ডেলিভারি সাইনটাতে আগুন লেগে গেছে। পরক্ষণে ভয়ঙ্কর এক ধাক্কা লাগল শরীরে। বুক থেকে শুরু হয়ে ছড়িয়ে পড়ল হাত, পা, আর মাথায়। মনে হলো কোটর থেকে খুলে বেরিয়ে যাচ্ছে চোখ। প্রচণ্ডভাবে মোচড় খেতে শুরু করল দেহটা। সীটের ওপর লাফাতে লাগল পানি থেকে তোলা মাছের মত। পেশীর ব্যথা অসহ্য।

বুঝে নিল লেসলি, এই পার্কিং লট থেকে জীবন্ত বেরোতে পারবে না সে। মুঠো হয়ে গেল হাতের আঙুল। ওগুলোর মাথা থেকে ছিটকে বেরোচ্ছে

বিদ্যুৎ-স্ফুলিঙ্গ। কোনমতে হাত বাড়িয়ে দরজাটা খোলার চেষ্টা করল সে। এত বেশি হাত কাঁপছে, হাতলটাই ধরতে পারল না। কাঁপুনির চোটে মাথাটা গিয়ে বাড়ি খেল দরজার পাশে।

কিন্তু কিছুই করার নেই আর ওর!

কিছুই করার নেই মৃত্যুযন্ত্রণা সহ্য করা ছাড়া!

★

আর্কেডের দরজায় দাঁড়িয়ে লেসলিকে মারা যেতে দেখল বিলি। কোন রকম আবেগ তৈরি হলো না তার মনে। করুণা জাগল না।

অবশেষে গাড়ির রেডিও থেকে তার মনো-আকর্ষণ সরিয়ে আনল সে। চুপ হয়ে গেল রেডিও। নীরব হলো পার্কিং লট। কনভার্টিবলের সামনের সীট থেকে একঝলক পোড়া ধোঁয়া বেরিয়ে উঠে গেল স্ট্রীট ল্যাম্পের আলোর দিকে।

এতক্ষণে ঘুরে দাঁড়াল বিলি। ঢুকে গেল আবার আর্কেডের ভেতর।

পেছনে তার অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে আছে পটেটো। বিলি তাকাতেই হেসে একটা কয়েন বাড়িয়ে দিল ওর দিকে।

কিন্তু নিল না বিলি। গেম মেশিন চালু করতে ওটার আর প্রয়োজন নেই। যে-কোন বৈদ্যুতিক যন্ত্র এখন তার গোলাম। ইলেকট্রনিক যন্ত্রপাতির সার্কিটে ঢোকার এক অসাধারণ ক্ষমতা আছে ওর মনের। বিদ্যুৎ সরবরাহ করার সামর্থ্য আছে।

ভুরু থেকে এক ফোঁটা ঘাম মুছে ফেলে মেশিনের সামনে এসে দাঁড়াল সে। তাকাল শুধু ওটার দিকে। তাতেই যেন জাদুমন্ত্রের বলে আপনাআপনি চালু হয়ে গেল মেশিন!

মুখের একটা পেশী কাঁপাল বিলি। মুহূর্তে শুরু হয়ে গেল নতুন খেলা। কয়েন ফেলার পর যেমন করে হয়।

'ক্রমেই ক্ষমতা বাড়ছে আমার,' আপনমনে বিড়বিড় করল সে। 'নতুন আরেক রেকর্ড তৈরি করব খুব শীঘ্রি।'

দুই

হিলটাউনের কাউন্টি বিল্ডিংটা আহামরি কিছু নয়। রঙ ওঠা, পুরানো। নতুন এলেও দ্বিতীয়বার ওটার দিকে চোখ তুলে তাকানোর কথা ভাববে না কেউ। করনির্ধারক, সমাজসেবকের আস্তানা আর হলভর্তি রেকর্ডপত্র আছে ওটাতে। আর আছে কাউন্টি করোনার হিউগ ওয়াগনারের অফিস।

অস্বস্তি বোধ করছেন করোনার। যে রায় দিয়েছেন, তাতে নিজেই সন্তুষ্ট হতে পারছেন না। জীবনে অনেক দেখেছেন, অনেক তাঁর অভিজ্ঞতা। কিন্তু গত কিছুদিন ধরে যা শুরু হয়েছে হিলটাউনে, এরকম কাণ্ড ঘটতে আর

দেখেননি কোনদিন। অন্য চারটা মৃত্যুর মত লেসলি কার্টারিসের মৃত্যুটাকেও 'অপঘাতে মৃত্যু' বলে রায় দিতে বাধ্য হয়েছেন তিনি। কিন্তু খুঁতখুঁত করছে মনটা।

তাকিয়ে আছেন ওদের দিকে। তিনটে কিশোর ছেলে আর একজন সুন্দরী মহিলা। লাশটা দেখছে ওরা।

তিরিশ মিনিট আগে তাঁর অফিসে ঢুকেছিল। 'তিন গোয়েন্দা'র একটা কার্ড আর পুলিশ চীফ ক্যাপ্টেন ইয়ান ফ্লেচারের একটা প্রশংসাপত্র তাঁর সামনে বাড়িয়ে দিয়ে লাশটা দেখার অনুমতি চেয়েছিল ছেলেগুলো। মহিলা জানিয়েছে, সে একজন ডাক্তার। লাশটা পরীক্ষা করতে চায়।

একবার রায় দেয়ার পর সেটা নিয়ে আর দ্বিতীয়বার ভাবতে চান না ওয়াগনার। তবে এক্ষেত্রে ব্যাপারটা আলাদা। ওরা যদি নতুন কিছু বের করতে পারে করুক না। ক্ষতি কি?

ঘটনাটা সত্যি অদ্ভুত। নমুনা দেখে 'বজ্রপাতে মৃত্যু' ছাড়া আর কিছুই বলা যায় না একে। কিন্তু লেসলি যখন মারা গেছে, তখন একবারও বজ্রপাত হয়েছে বলে রেকর্ড নেই।

লাশের ওপর ঝুঁকে দাঁড়িয়েছে ডাক্তার এলিজা। চোখে লাগানো প্রোটেকটিভ গগলস। পেশাদারী দৃষ্টিতে তাকাল মৃত ছেলেটার বাঁ কানের ভেতর। লাশের মাথা পুরো নব্বই ডিগ্রি ঘুরিয়ে একই ভাবে দেখল ডান কানের ভেতরটাও। ভাল করে দেখে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে তাকাল তিন গোয়েন্দার দিকে, যারা ওকে অনুরোধ করে নিয়ে এসেছে এখানে। অবশ্য নিজেরও খানিকটা ইচ্ছা আর কৌতূহল জন্মেছিল গত কিছুদিনে হিলটাউনের অদ্ভুত মৃত্যুগুলোর কথা পত্রিকায় পড়ে।

রকি বীচ হাসপাতালের ডাক্তার এলিজা। তিন গোয়েন্দার বন্ধু। একবার একটা বিশেষ কাজে তাকে সাহায্য করেছিল ওরা। সেই থেকে বন্ধুত্ব হয়ে গেছে।

'দুটো কানের পর্দাই ফেটে গেছে,' তিন গোয়েন্দাকে জানাল সে। ভোঁতা কণ্ঠস্বর। সামান্য একটা দীর্ঘশ্বাস পড়ল কি পড়ল না।

ডাক্তারী পাস করতে গিয়ে বহু লাশ পরীক্ষা করেছে এলিজা। অনেক ধরনের মৃত্যু দেখেছে। মানুষের শরীর অনেক কাটাকুটি করেছে। কিন্তু লাশ দেখলে তার এখনও মন কেমন করে। কেবলই মনে হয়, হাড়-মাংসে তৈরি এই নিথর দেহটাও একদিন তার মতই জ্যান্ত ছিল, চলেফিরে বেড়াত, কথা বলত। এরও আশা ছিল, নেশা ছিল, স্বপ্ন ছিল···

দস্তানা পরা হাতের আঙুল দিয়ে লাশের এক চোখের পাতা টেনে খুলল সে। মৃত চোখের দিকে তাকাল। মণিটা একধরনের ঘোলাটে পাতলা পর্দায় ঢাকা পড়েছে। অন্য চোখটা পরীক্ষা করেও একই জিনিস দেখতে পেল।

'দুই চোখেই ছানি,' কিশোর বন্ধুদের জানাল এলিজা। কণ্ঠস্বর এখনও ভোঁতা। কিশোর পাশার দিকে তাকিয়ে বলল, 'অতিরিক্ত উত্তাপের কারণে হয়েছে সম্ভবত।'

'সম্ভবত কেন?' এলিজার কথায় অবাক হয়েছে কিশোর। 'শিওর হতে পারছেন না?'

জবাব দিল না এলিজা। কি বলবে, ভাবছে। অ্যানাটমিক্যাল স্কেলের ওপর রাখা একটা প্লাস্টিকের ব্যাগ তুলে নিল। মুখ খুলে ভেতরে তাকাল।

ব্যাগের ভেতরের জিনিসটাকে প্রথম দর্শনে মনে হয় পোড়া মাংসের টুকরো। পুড়ে বিকৃত হয়ে গেছে। কিন্তু অভিজ্ঞ ডাক্তারের চোখ ঠিকই চিনতে পারল। জিনিসটা মানুষের হৃৎপিণ্ড। ময়না তদন্তের সময় লাশের বুক থেকে কেটে বের করে আনা হয়েছে।

'বুকের মধ্যেই হার্টটা পুড়ে কাবাব হয়ে গেছে,' এলিজা বলল। 'আশ্চর্য!' করোনারের দিকে তাকাল সে। 'মিস্টার ওয়াগনার, আপনার কি ধারণা?'

হাঁ করে তাকিয়ে আছে মুসা আর রবিন। কিছু বুঝতে পারছে না। বোঝার জন্যে মাথাও ঘামাচ্ছে না। ডাক্তারই যখন পারছে না ওরা কি বুঝবে? তবে কৌতূহল আর আগ্রহ নিয়ে শুনছে এলিজার কথা।

করোনার বললেন, 'এভাবে হার্টের টিস্যু ড্যামেজ হতে দেখিনি আর। তবে...' গাল চুলকালেন তিনি। মনে মনে কথা সাজিয়ে নিলেন বোধহয়। 'বক্ষাস্থির নিচে এভাবে পুড়ে কিংবা পাঁজরের হাড় ফেটে যেতে পারে একটা কারণেই—হাই-ভোল্টেজে প্রচণ্ড বৈদ্যুতিক শক খেলে। বজ্রপাতে...'

বাধা দিয়ে বলল এলিজা, 'কিন্তু কোন্ জায়গা দিয়ে বিদ্যুৎ প্রবেশ করেছে শরীরে, তার কোন চিহ্ন নেই। তারের ছোঁয়া লাগলে সেখানে দাগ কিংবা ক্ষত থাকার কথা।'

'আমার কাছেও এটাই অবাক লাগছে। দাগ নেই কেন?'

ছেলেটা মারা গেছে ইলেকট্রিক শকে, কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু শকটা লাগল কোনদিক দিয়ে, সেটা বোঝা যাচ্ছে না।

ঢোক গিললেন ওয়াগনার। 'আমার অনুমান, গাড়ির ছাতে পড়েছিল বজ্রটা। সেখান থেকেই কোনভাবে ছেলেটার শরীরে ঢুকেছে।'

'তারমানে বলতে চাইছেন ধাতব বডির ছোঁয়া? তাতেও চামড়া পুড়বে। দাগ কোথায়?'

'কি জানি! এই প্রশ্নটার জবাব পেলে তো সব পরিষ্কারই হয়ে যেত।'

'তাহলে অপঘাতে মৃত্যু রায় দিলেন যে?'

'তাতে ভুল করিনি। অপঘাত মৃত্যুই তো। ইলেকট্রিক শক। আমরা কেবল শিওর হতে পারছি না, শকটা লাগল কিভাবে।'

করোনারের মতই এলিজাও কিছু বুঝতে পারছে না। কিশোরের দিকে তাকাল। যুক্তি যেখানে অচল সেখানে কল্পনার আশ্রয় নিতে হয়। আর সেটা খুব ভাল পারে এই ছেলেটা। কল্পনার দৌড় আর বুদ্ধি এত বেশি, কিভাবে যেন প্রায় শূন্য থেকেও বের করে নিয়ে আসে মূল্যবান সূত্র। ইতিমধ্যেই কোন জবাব, কোন উদ্ভট ব্যাখ্যা তার মাথায় ঠাঁই গেড়ে ফেলেছে কিনা বুঝতে চাইল। অবাস্তব কোন কিছুতে বিশ্বাস করে না কিশোর। ভূতুড়ে ঘটনাকে ভূতের কাণ্ড না ভেবে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যাখ্যা দেয়ার চেষ্টা করে।

দেখা যাক, এই ঘটনাটার কি ব্যাখ্যা দেয়।

কিশোর কিছু বলার আগেই দরজার দিকে ঘুরে গেল করোনারের চোখ। সেটা লক্ষ করে এলিজাও তাকাল সেদিকে। দরজা জুড়ে দাঁড়িয়ে আছেন একজন বিশালদেহী লোক। বুকে শেরিফের ব্যাজ।

কোন কেসের দায়িত্ব নিলে পুলিশ কিংবা স্থানীয় প্রশাসনের সঙ্গে খাতির রাখার চেষ্টা করে কিশোর। নইলে তদন্তে প্রচুর অসুবিধে হয়। শেরিফ যদি ওদের কাজে বাধা দেন, পছন্দ না করেন, তাঁর এলাকা থেকে বের করে দেন, কিছু করার থাকবে না। হিলটাউনে যখন পৌঁছেছিল ওরা, শেরিফ ছিলেন না এখানে। জরুরী একটা কাজে পাশের শহরে গিয়েছিলেন। সেই সুযোগে কোন রকম বাধার মুখোমুখি না হয়ে সহজেই করোনারের অফিসে ঢুকে পড়েছিল ওরা। এখন তিনি এসেছেন। ওদের তদন্তটাকে কোন্ চোখে দেখবেন কে জানে। করোনারের মত এত সহজে যদি তদন্ত করার অনুমতি না দেন?

এলিজার এসব নিয়ে মাথাব্যথা নেই। লাশ পরীক্ষা করতে এসেছে, করছে। করা হয়ে গেলে চলে যাবে। গোয়েন্দাগিরি করার জন্যে থাকতে হবে না এখানে। অতএব শেরিফের তোয়াক্কা তার না করলেও চলবে। কিভাবে ঘটনাটা ঘটেছে ভাবতে ভাবতে হঠাৎ ফিরে তাকাল করোনারের দিকে, 'এ নিয়ে এরকম মৃত্যুর ঘটনা পাঁচটা ঘটল হিলটাউনে। পত্রিকায় পড়লাম। বাকি লাশগুলোর গায়েও কি কোন রকম দাগ ছিল না?'

পায়ের ওপর ভার বদল করলেন ওয়াগনার। অস্বস্তিবোধটা বাড়ল। 'না, ছিল না। ওগুলোকেও বজ্রপাতে মৃত্যু ঘটেছে—এই রায় দিতে বাধ্য হয়েছি আমি।'

'তারমানে আপনি বিশ্বাস করেন না বজ্রপাতেই মারা গেছে লোকগুলো?' আচমকা যেন প্রশ্নটা ছুঁড়ে দিল কিশোর।

অপ্রস্তুত হয়ে গেলেন ওয়াগনার। জবাব দিতে পারলেন না। কিংবা আসল কথাটা স্বীকার করতে হয় বলে ইচ্ছে করেই দিলেন না।

দরজায় দাঁড়িয়ে বুকের ওপর আড়াআড়ি হাত রেখে কথাগুলো শুনলেন শেরিফ। তারপর কাশি দিয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন সবার। করোনারের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'এরা কারা?'

পরিচয় দিলেন ওয়াগনার।

'হুঁ! তাহলে তোমরা গোয়েন্দা,' মাথা ঝাঁকালেন শেরিফ। এক এক করে নজর বোলালেন তিনজনের মুখে। 'তোমাদের জানা না-ও থাকতে পারে, তাই নিজের পরিচয়টা দিয়েই নিই। আমি শেরিফ মরফি রবার্টসন।'

'দেখেই অনুমান করে নিয়েছি, স্যার,' খুশি করার জন্যে বিনীত ভঙ্গিতে বলল কিশোর। 'রহস্যময় মৃত্যুর খবরগুলো পত্রিকায় পড়ে ইনটারেস্টেড হয়েছি। শখের গোয়েন্দা আমরা,' একটা কার্ড বের করে দিল সে।

ভুরু কুঁচকে তিনটে নামের নিচে প্রশ্নবোধক চিহ্নগুলোর দিকে তাকালেন শেরিফ। 'এগুলো কেন? নিজেদের কাজের ব্যাপারে সন্দেহ আছে নাকি?'

'সন্দেহ নেই,' কণ্ঠস্বরটাকে বড়দের মত ভারিক্কি করে তুলে কিশোর

বলল, 'এগুলোর মানে, যে কোন ধরনের রহস্যের তদন্ত করতে আগ্রহী আমরা। জটিল, উদ্ভট কিংবা ভূতুড়ে কেস হলে আরও ভাল। এমন অনেকগুলো কেসের কিনারা করেছি আমরা, বহুদিন ধরে পুলিশ যার কোন সমাধান খুঁজে পায়নি। এই দেখুন না,' ইয়ান ফ্লেচারের প্রশংসাপত্রটা বের করে দেখাল সে। 'আমাদের সার্টিফাই করেছেন ক্যাপ্টেন নিজে।'

কার্ডটা ফিরিয়ে দিতে দিতে আবার মাথা ঝাঁকালেন শেরিফ। 'হুঁ!' তারপর তাকালেন ডাক্তারের দিকে।

'আমি ডক্টর এলিজা,' হাত বাড়িয়ে দিল এলিজা।

হাত মেলালেন শেরিফ। 'কি সাহায্য করতে পারি, বলুন?'

স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল কিশোর। বুঝে গেল, এক্ষুণি বেরিয়ে যেতে বলবেন না শেরিফ। তবে শেষ পর্যন্ত তদন্ত করতে দেবেন কিনা স্পষ্ট নয় এখনও।

কিশোরের দিকে তাকাল এলিজা। আবার ফিরল শেরিফের দিকে। 'এখানে গত কিছুদিনে বজ্রপাতের কারণে যেসব মৃত্যু ঘটেছে বলে বলা হয়েছে, সেগুলোর সপক্ষে তেমন কোন ব্যাখ্যা দেয়া হয়নি···'

'কিছু মনে করবেন না, ডাক্তার, বজ্রপাতের ব্যাপারে আপনি কতখানি জানেন?'

'জানি। অনেক কিছুই।'

'আপনি কি জানেন, বাড়িতে ঘরের মধ্যেও অনেকে বজ্রপাতের শিকার হয়? হয়তো শাওয়ারে গোসল করছিল তখন, কিংবা টেলিফোনে কথা বলছিল। এমনও দেখা গেছে, হলঘরে অনেকে মিলে নাচার সময় তাদের মধ্যে কোন একজন বাজ পড়ে মরে গেছে। বাকিদের কারও কিচ্ছু হয়নি। শিওর হয়ে কেউ বলতে পারে না কখন, কোথায় বাজ পড়বে। সাধারণ বিজ্ঞান বইতে আমরা পড়ি মেঘে মেঘে ঘর্ষণের ফলে বিদ্যুৎ উৎপন্ন হয়, আর তাতেই বজ্রপাতের সৃষ্টি। কিন্তু ভেতরে এত প্রশ্ন আর রহস্য রয়ে গেছে, অনেক বড় বড় বিজ্ঞানীও তার জবাব দিতে পারেন না। জানেন সেটা?'

'আসলে আপনি কি বলতে চাইছেন, শেরিফ?'

এতক্ষণে হাসি ফুটল শেরিফের মুখে। 'বলতে চাইছি, শরীরের দাগ নিয়ে যে প্রশ্নটা আপনি তুলেছেন, সাধারণ ইলেকট্রিক শকের বেলায় সেটা থাকাটা স্বাভাবিক। কিন্তু বজ্রপাত একটা অস্বাভাবিক ব্যাপার···হিলটাউনে বাস না করলে হয়তো আপনার মতই কথা বলতাম। কিন্তু এখন আর বলব না। কারণ রোজ সকালে এখানকার বেশ কিছু বিজ্ঞানীর সঙ্গে বসে আমাকে নাস্তা খেতে হয়।'

চোখ মিটমিট করল এলিজা, 'তাতে কি?'

'বুঝলেন না?' শেরিফের চোখ দুটোও এখন হাসছে। 'এখানে এই হিলটাউনে বজ্র উৎপাদন করে আমাদের বিজ্ঞানীরা। বিশ্বাস হয়?'

জবাব দিল না এলিজা।

'আমরা বজ্র বানাই,' শেরিফ বললেন। 'শহরের ধারে অস্টাডোরিয়ান লাইটনিং অবজারভেটরিতে। আকাশের দিকে মাথা তুলে চেয়ে থাকে ওখানে

একশো আইওনাইজড রড। বিদ্যুৎকে খুঁচিয়ে বজ্র তৈরি করে ওগুলো।'

জোরে নিঃশ্বাস ফেলল এলিজা, 'এখবরটা তো জানতাম না!'

'তারমানে ঠিকমত হোমওয়ার্ক করেন না আপনি,' রসিকতা করলেন শেরিফ।

'বজ্রের ব্যাপারে যা-ই বলেন না কেন, স্যার, এই ময়না তদন্তের রিপোর্টে গলদ আছে।'

'কে বলল?'

'একজন ডাক্তার হিসেবে আমি বলছি। কারণ দাগ নেই...'

'সেই কথাটাই তো বোঝাতে চাইছি এতক্ষণ ধরে। সাধারণ শক হলে দাগ থাকত। এটা হয়তো কোন ধরনের অসাধারণ শক, তাই নেই। বজ্রপাত সম্পর্কে এখনও সব জানেন না বিজ্ঞানীরা, আগেই তো বললাম। হতে পারে, কিছু কিছু বজ্রপাতে বিদ্যুৎ এমন ভাবে ঢুকে যায় মানুষের শরীরে, ভেতরটা ঠিকই পুড়ে কয়লা হয়, কিন্তু চামড়ায় বা অন্য কোথাও কোন দাগ বা ক্ষত থাকে না...'

'রিমোট কন্ট্রোলড ইলেকট্রিক শক!' বিড়বিড় করল কিশোর।

'কি বললে?' ঝট করে তার দিকে ঘুরে গেলেন শেরিফ। 'রিমোট? বুদ্ধিমান ছেলে! হয়তো ঠিকই বলেছ, রিমোট কন্ট্রোলড লাইটনিং। স্পর্শ ছাড়াই বিদ্যুৎ পাচার করে দেয় মানুষের শরীরে...কে জানে!' কিশোরের দিকে তাকালেন তিনি। একে একে চোখ বোলালেন রবিন আর মুসার দিকে। সন্তুষ্ট হয়ে মাথা ঝাঁকালেন, 'দেখে অবশ্য চালাক-চতুরই লাগছে তোমাদের। ঠিক আছে, করো তদন্ত, বাধা দেব না। তবে এমন কিছু করবে না, কারও ব্যক্তিগত ব্যাপারে নাক গলাবে না, যাতে কেউ তোমাদের বিরুদ্ধে নালিশ করতে পারে। যদি করে, শহর থেকে তোমাদের চলে যেতে বলতে বাধ্য হব আমি।'

'থ্যাংকিউ, স্যার,' হাসি ফুটল কিশোরের মুখে। 'কেউ খারাপ রিপোর্ট করবে না, কথা দিতে পারি।'

★

'কিভাবে মারা গেছে, কি মনে হয় তোমার?' কিশোরকে জিজ্ঞেস করল এলিজা।

করোনারের অফিস থেকে বেরিয়ে এসে একটা কফিশপে নাস্তা আর কফি খেতে বসেছে ওরা।

'আমি ডাক্তার নই। আপনাদের আলোচনা থেকে যা বুঝলাম, একটা কথা জোর দিয়ে বলতে পারি,' কিশোর বলল, 'বজ্রপাতে মৃত্যু ঘটেনি লেসলির।'

মুসা বলল, 'শেরিফের সঙ্গে তো একমত হয়ে এলে...'

'বজ্রপাতে মারা গেছে এ ব্যাপারে একমত হইনি। বলেছি ইলেকট্রিক শক। বজ্রপাত আর ইলেকট্রিক শক এক জিনিস নয়।'

'কিন্তু বজ্রপাতে বিদ্যুতের কারণেই মারা যায় মানুষ।'

'তা যায়। তবে লেসলি বাজ পড়ে মারা যায়নি। কিংবা সাধারণ ইলেকট্রিক শকও খায়নি। তাহলে শরীরে দাগ নিশ্চয় থাকত।'

'তাহলে কিসে মরল?' ভুরু নাচিয়ে জানতে চাইল রবিন।

'ইলেকট্রিক শকেই মরেছে, তাতে কোন সন্দেহ নেই। তবে সেই বিদ্যুৎটা বড় আজব! পরিবহনের জন্যে তার লাগে না এর, কোন মাধ্যম লাগে না। বাতাসের ইথারই যথেষ্ট। আরও একটা ব্যাপার। যেন মন আছে, মগজ আছে, চিন্তা-ভাবনা করে শিকার বেছে নেয়ার ক্ষমতা আছে ওটার।'

'এমন করে বলছ যেন ওটা একটা প্রাণী!'

'কেন, প্রাণীরা কি বিদ্যুৎ উৎপাদন করতে পারে না?'

তা তো পারেই। অনেক প্রাণীই আছে যারা নিজের দেহে বিদ্যুৎ তৈরি করতে সক্ষম। চুপ হয়ে গেল রবিন।

একপাশে চেয়ারে রাখা ব্রীফকেস খুলে একটা ফাইল বের করল কিশোর। সেটা থেকে এক টুকরো কাগজ বের করে টেবিলে বিছাল। কি লেখা, দেখার জন্যে গলা বাড়িয়ে দিল রবিন আর মুসা।

'দেখুন,' এলিজাকে বলল কিশোর, 'একটা হিসেব বের করেছি। এই এলাকায় যারা যারা বজ্রপাতের শিকার হয়েছে তাদের সবারই বয়েস সতেরো থেকে একুশ। সবাই পুরুষ। লেসলি কার্টারিসও সেই দলেই পড়ে। এর মানে কি? মনে কি হয় না, বুঝেশুনে, শিকার বাছাই করে মৃত্যুবাণ মারছে সেই আজব বিদ্যুৎ?'

বিস্মিত হলো এলিজা। তাকিয়ে রইল কিশোরের দিকে।

'লেসলি কার্টারিস কোন্ জায়গায় মারা গেছে, একবার দেখা দরকার,' কিশোর বলল। 'আপনার কাজ আপনি করে দিয়েছেন। যা বোঝার বুঝে নিয়েছি। আপনাকে না দেখালে শিওর হতে পারতাম না। যাই হোক, এবার আমাদের তদন্ত শুরু। দেখা যাক আমার যুক্তির সপক্ষে কোন সূত্র মেলে কিনা। আপনি আমাদের সঙ্গে যেতে চান?'

মাথা নাড়ল এলিজা, 'যাওয়ার তো খুবই ইচ্ছে ছিল। কিন্তু আরেকটা জরুরী কাজ আছে। নতুন কিছু জানলে জানাবে অবশ্যই। আমার সাহায্যের প্রয়োজন আছে বুঝলে তখন নাহয় চলে আসব। এখন তো আমাকে আর কোন দরকার নেই তোমাদের?'

মাথা নাড়ল কিশোর, 'না, নেই।'

তিন

স্ট্রিপ মলের পার্কিং লট থেকে এখনও বের করে আনা হয়নি লেসলি কার্টারিসের গাড়িটা। শেরিফের লোকেরা গাড়ি ঘিরে অরেঞ্জ-কোন বসিয়ে গাড়িটাকে আলাদা করে রেখেছে। কেউ যাতে ওটার কাছে না যায়, কিছু না ধরে।

গাড়িটার পেছনে হাতখানেক দূরে ঝুঁকে বসল কিশোর। স্কিড করে যাওয়া চাকার দাগ দেখতে পেল।

গাড়ির ভেতরে উঁকি দিচ্ছে মুসা।

একটা ফাইল হাতে তার কাছে দাঁড়িয়ে আছে রবিন। ফাইল পড়ে বলল, 'রাত বারোটা সতেরো মিনিটে এই গাড়ির ভেতরে লেসলির লাশটা পেয়েছে পুলিশ। শর্ট সার্কিট হয়ে নষ্ট হয়ে গেছে সমস্ত ইলেকট্রিক্যাল সিসটেম। ওয়্যারিঙের তার সব পুড়ে, গলে গেছে।'

কিশোরের কাছে এসে দাঁড়াল সে।

এখনও ঝুঁকে বসে আছে কিশোর। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চাকার দাগগুলোর দিকে তাকিয়ে কি যেন বোঝার চেষ্টা করছে। সেগুলো রবিনকে দেখিয়ে বলল, 'মনে হচ্ছে তাড়াহুড়ো করে পালাতে চেয়েছিল লেসলি।'

রবিন জিজ্ঞেস করল, 'কার কাছ থেকে? কেন?'

উঠে দাঁড়াল কিশোর। মলের দিকে তাকাল। 'কখন শেষ পিজ্জাটা ডেলিভারি দিয়েছিল লেসলি?'

ফাইল দেখল রবিন। 'এগারোটা থেকে সাড়ে এগারোটার মধ্যে। কেন?'

'এগারোটার মধ্যে বন্ধ হয়ে যায় এখানকার সব স্টোর,' ভিডিও আর্কেডের ওপর স্থির হলো কিশোরের দৃষ্টি। 'সম্ভবত ওই আর্কেডটা বাদে।'

★

আর্কেডের ভেতরের ম্লান নীলচে আলো চোখে সইয়ে নিতে সময় লাগল তিন গোয়েন্দার। সামনের কাউন্টারে বসে কয়েন গুণে গুণে কাগজের টিউবে ভরে রাখছে একটা সতেরো-আঠারো বছরের ছেলে।

'দশ...এগারো...বারো...' গুণছে সে। কাউন্টারে ঝুঁকে গভীর মনোযোগে কাজ করছে। প্রতিটি মুদ্রা ভালমত দেখছে। 'তেরো...'

'এক্সকিউজ মি!' ছেলেটার প্রায় কানের কাছে গিয়ে বলল রবিন।

ময়লা একটা আঙুল তুলে রবিনকে অপেক্ষা করতে ইশারা করে গুণে চলল ছেলেটা। 'তেরো...উঁম, চোদ্দ...'

কিশোরের সঙ্গে দৃষ্টি বিনিময় করল রবিন।

অহেতুক দাঁড়িয়ে না থেকে আর্কেডের ভেতরটা দেখতে শুরু করল কিশোর। মুসা যেখানে ছিল সেখানেই দাঁড়িয়ে রইল।

ছেলেটার দিকে ঘুরল রবিন। আগের চেয়ে জোরে বলল, 'এক্সকিউজ মি, প্লীজ!'

ঘর্মাক্ত, গোলআলুর মত একটা গোল মুখ ঘুরল রবিনের দিকে। ছোট ছোট দুই চোখের দৃষ্টি স্থির হলো ওর মুখের ওপর। অবাক হয়ে ভাবতে লাগল রবিন, ছেলেটার মুখ কি কোনকালে বন্ধ হয়? নাকি সব সময়ই ওরকম অর্ধেক ফাঁক হয়ে খুলে থাকে?

অপেক্ষা করছে রবিন। 'কি চাই', 'কি সাহায্য করতে পারি,' এ ধরনের কোন প্রশ্নের অপেক্ষা। কিন্তু কিছুই বলল না ছেলেটা। তাকিয়ে রইল হাঁ করে। শেষে রবিনকেই কথা শুরু করতে হলো, 'কি নাম তোমার?'

'অ্যাঁ?' এই একটা শব্দ উচ্চারণ করে আবারও দীর্ঘ মুহূর্ত রবিনের দিকে তাকিয়ে রইল ছেলেটা। আস্তে করে মাথা ঝাঁকিয়ে যেন কথা বের করার চেষ্টা চালাল মগজের ভেতর থেকে। শেষে কোনমতে বলল, 'পটেটো।'

মাথা ঝাঁকাল রবিন। হাসল। চমৎকার নাম। একেবারে মানানসই। 'পটেটো, তোমার একটা মিনিট সময় নষ্ট করতে পারি আমি?'

'হ্যাঁ,' মলিন হাসি হাসল পটেটো। 'বলো।'

জ্যাকেটের পকেট থেকে তিন গোয়েন্দার একটা কার্ড বের করল রবিন। পটেটোকে দেখিয়ে বলল, 'আমি একজন গোয়েন্দা।'

পলকে পটেটোর প্রায় ফ্যাকাসে মুখটা আরও রক্তশূন্য হয়ে যেতে দেখল সে। ইঁদুরের মত চিঁ চিঁ করে উঠল, 'তো আমি কি করব?'

কার্ডটা সরিয়ে রাখল রবিন। 'কাল রাতেও কি এখানে তোমারই ডিউটি ছিল?'

মাথা ঝাঁকাল পটেটো, 'হ্যাঁ। রোজ রাতেই থাকে।'

একটা ছবি দেখাল রবিন, 'এই লোকটাকে চিনতে পারো?'

ছবিটা দেখল পটেটো। কুঁচকে যাচ্ছে ভুরু। দ্রুত চিন্তা চলেছে তার মনে, মুখ দেখেই বোঝা যায়। 'নাহ্,' অবশেষে জবাব দিল সে, 'কখনও দেখিনি।'

এমনভাবে মানা করে দেবে ছেলেটা, ভাবেনি রবিন। বলল, 'দেখো না, আরেকটু ভালমত দেখো। কাল রাত এগারোটা থেকে সাড়ে এগারোটার মধ্যে এখানে এসেছিল সে।'

ধীরে ধীরে মাথা নাড়তে লাগল পটেটো। যেন কে ঢুকল কে বেরোল এসব নিয়ে কোন মাথাব্যথা নেই তার। ভঙ্গি দেখাল যেন কথাও বুঝতে পারছে না।

এমন সরাসরি মিথ্যে বলছে ছেলেটা! এভাবে যে মিথ্যে বলে তার মুখ থেকে কথা আদায় করা কঠিন। অসহায় বোধ করল রবিন। মুসার দিকে তাকাল।

পায়ে পায়ে কাছে এসে দাঁড়াল মুসা। কঠিন দৃষ্টিতে তাকাল পটেটোর দিকে। চিবিয়ে চিবিয়ে বলল, 'শোনো, আলু মিয়া, মনে করিয়ে দিচ্ছি তোমাকে। তোমাদের পার্কিং লটে খুন হয়েছে ছবির এই লোকটা,' পড়ে থাকা আধপোড়া গাড়িটা দরজা দিয়ে পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে। সেটা দেখিয়ে বলল, 'ওই যে ওটা এর গাড়ি। ওই সময় তুমি এখানে থাকলে দৃশ্যটা তোমার চোখে না পড়ার কথা নয়। একটা গাড়ি আগুনে পুড়ছে, আর তুমি কিছু দেখোনি...'

'তাই তো,' আস্তে করে বলল পটেটো। বড় বড় হয়ে গেল চোখ। ওপর-নিচে দ্রুত ওঠানামা শুরু করল তার মাথা। মুসার বাহুর শক্তিশালী পেশীর দিকে তাকিয়ে যেন হঠাৎ করে মনে পড়ে গেছে। আড়চোখে তাকিয়ে দেখল নিগ্রো ছেলেটার ঘুসি ছুটে আসছে কিনা তার গোল নাকের ডগাটাকে ভোঁতা করে দেয়ার জন্যে। 'হায় হায়...' গাড়ির দিকে আঙুল তুলে সেটা

আবার ঠেকাল রবিনের হাতের ছবিতে, 'এই লোকটাই সে?'

★

আর্কেডের একেবারে পেটের মধ্যে সারি সারি ভিডিও গেম মেশিনের পাশ দিয়ে চলেছে কিশোর। ওগুলোর সামনে দাঁড়ানো ছেলেগুলো বেশির ভাগই তার সমবয়েসী, কেউ দু'এক বছরের ছোট, কেউ বড়। পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় চোখ তুলে কেউ কেউ শূন্য দৃষ্টিতে তাকাচ্ছে তার দিকে। হয়তো ভাবছে ওদের মতই কিশোরও ভিডিও গেম খেলতে এসেছে।

একটা ক্লাসিক উরলিটজার জুকবক্সের পাশ কাটাল সে। কমপ্যাক্ট ডিস্ক লাগানো আছে ওটাতে। ভিডিও গেম মেশিনগুলোর কাছে কেমন ভারিক্কি দেখাচ্ছে ওটার চেহারা।

মেশিনগুলোর পাশ কাটাতে গিয়ে একটা মেশিন দৃষ্টি আকর্ষণ করল তার। থমকে দাঁড়াল। Virtual Massacre-II মেশিন। পর্দায় স্তম্ভ তৈরি করে ফুটছে খেলে রেখে যাওয়া খেলোয়াড়দের নাম, সই, তারিখ আর সময়। একটার নিচে আরেকটা।

তাকিয়ে রইল কিশোর। নামের সারি শেষ হতেই একটা ভয়ঙ্কর দৃশ্য ফুটল। একজন যোদ্ধা কারাতের কোপ দিয়ে মেরে ফেলল আরেকজন যোদ্ধাকে। মুমূর্ষু যোদ্ধার মুখ থেকে ফোয়ারার মত ছিটকে বেরিয়ে এল এক ঝলক রক্ত। পরক্ষণে বলে উঠল একটা যান্ত্রিক কণ্ঠ: খেলবে, এসো। আমি জানি তোমার পকেটে একটা সিকি আছে…

'শেষ ওকে দেখেছি এই মেশিনটাতে একটা সিকি ঢোকাতে,' পাশ থেকে বলল আরেকটা কণ্ঠ।

ফিরে তাকাল কিশোর। গোলআলুর মত মুখওয়ালা টিনেজ অ্যাটেনডেন্ট রবিনের সঙ্গে কথা বলছে মেশিনটার দিকে তাকিয়ে। পেছনে দাঁড়িয়ে আছে মুসা।

'তারপর বেরিয়ে গেল,' পটেটো বলছে। 'কিছুক্ষণ পর শুনলাম অ্যাম্বুলেন্সের সাইরেন।'

কৌতূহলী দৃষ্টিতে ওকে দেখতে লাগল কিশোর। কিন্তু একটা চোখ রয়েছে মেশিনের পর্দায়। নামের স্তম্ভ ফিরে আসার অপেক্ষা করছে।

পটেটোর দিকে তাকাল রবিন, 'অ্যাম্বুলেন্স আসার আগে বাইরে অস্বাভাবিক কিছু চোখে পড়েছে তোমার?'

মাথা নাড়ল পটেটো। শূন্য দৃষ্টিতে তাকাল। চোখ মিটমিট করল। 'বলা কঠিন। আমি বলতে চাইছি, এতটাই শোরগোল শুরু হয়েছিল, আলাদা করে কিছু বোঝা যাচ্ছিল না,' বলেই ঝট করে ফিরে তাকিয়ে দেখে নিল মুসাকে, সে আবার অস্বাভাবিক কিছু ঘটানোর তালে আছে কিনা। 'এরকম ঘটনা ঘটলে যা হয় আরকি।'

'কাছাকাছি এমন কাউকে দেখেছ, যে মনে করতে পারবে কোন কিছু দেখেছে?'

'অ্যা…না…মনে পড়ছে না।'

পটেটোর পা থেকে মাথা পর্যন্ত চোখ বোলাল কিশোর। কথা গোপন করার জোর চেষ্টা চালাচ্ছে টিনেজ অ্যাটেনডেন্ট, বুঝতে অসুবিধে হলো না তার। কাকে বাঁচাতে চাইছে সে? কেন? মেশিনের পর্দায় ফিরে গেল তার দৃষ্টি। আবার ফিরে এসেছে নামের স্তম্ভ।

'অই, আলু,' চিৎকার করে উঠল একটা ছেলে, 'আমার ভাঙতি পয়সা কই?'

বাঁচল যেন পটেটো। 'এক্সকিউজ মি' বলে তাড়াতাড়ি ছুটে গেল সেদিকে।

'রবিন, এদিকে এসো,' হাত নেড়ে ডাকল কিশোর। পর্দার দিকে হাত তুলল, 'দেখো।'

'কি?' চোখের পাতা সরু করে তাকাল রবিন।

'ফাইল। বজ্রপাতের শিকার অন্য ছেলেগুলোর নাম কি ছিল?'

ফাইল খুলল রবিন। একটা লিস্ট দেখল। 'হ্যারি গাটস···মরিস নিউম্যান···বিলি ফক্স···বব···'

'দাঁড়াও দাঁড়াও! বিলি ফক্স। ওর মিডলনেমটা কি? লেখা আছে?'

'আছে।'

'বিলি পিটার ফক্স?'

'হ্যাঁ।'

'বজ্রপাতের শিকার হয়েছিল পাঁচজন। তাদের মধ্যে একজন বেঁচে গিয়েছিল। তার নাম বিলি পিটার ফক্স। তাই তো?'

ফাইলের দিকে আরেকবার তাকিয়ে মাথা ঝাঁকাল রবিন, 'হ্যাঁ। তুমি জানলে কি করে?'

'ওই দেখো,' আবার পর্দার দিকে হাত তুলল কিশোর। 'হাই স্কোরারদের মধ্যে ওর নাম সই করা আছে। নামের আদ্যক্ষর। বি পি এবং এফ। কি দাঁড়াল? বিলি পিটার ফক্স।'

পর্দার কাচে সইটার ওপর আঙুল রাখল সে। ধীরে ধীরে পাশে সরাল আঙুলটা। তারিখ এবং সময় লেখা আছে। লেসলি কার্টারিসের নাম আছে। কখন খেলেছে, সময় লেখা আছে।

পর্দা থেকে হাত সরিয়ে এনে ঘুরে দুই সহকারীর মুখোমুখি হলো কিশোর। 'এর একটাই মানে—লেসলি কার্টারিস খুন হওয়ার সময় বিলিও এখানে ছিল।'

চার

ওয়াকম্যানের হেডফোন কানে লাগিয়ে একটা বুইক গাড়ির পেটের নিচে ঢুকে কাজ করছে বিলি ফক্স। এ শহরের অর্ধেক ছেলেই মেকানিক। বিলিকে যা

দিচ্ছেন তার অর্ধেক বেতনে ওর চেয়ে দক্ষ মেকানিক রাখতে পারতেন জোসেফ হাওয়ার্ড। কিন্তু ছেলেটাকে দেখে মায়া হয়েছে। তাই ইচ্ছে করেই বেতন বেশি দিচ্ছেন।

চিত হয়ে থেকেই পিঠ উঁচু করে পিঠের নিচের গদিটা টেনে ঠিক করল বিলি। পাশে হাত বাড়াল রেঞ্চের জন্যে। পেল না। কোথায় ওটা দেখার জন্যে মুখ ঘুরিয়ে তাকাল। চোখে পড়ল একজোড়া সুন্দর পা।

হাসিতে ঠোটের একটা পাশ নিচে নেমে গেল ওর। যে কোন জায়গায় লক্ষ পায়ের মধ্যে ওগুলোকে চিনে নিতে পারবে সে। স্কুলে, এখানে ওখানে, নানা জায়গায় ওই পা আর পায়ের মালিককে হাজার বার দেখেছে। জীবনে 'এক জিনিস' বলতে সবচেয়ে বেশি দেখেছে বোধহয় ওই পা-জোড়া।

গ্যারেজের কংক্রীটের মেঝেতে হাই-হীলের খটখট শব্দ তুলে গাড়িটার দিকে এগিয়ে আসছে পায়ের মালিক। চিত হয়েই হাত আর পায়ের সাহায্যে নিজের শরীরটাকে মুচড়ে গাড়ির নিচ থেকে বের করে আনল বিলি। স্প্রিঙের মত লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াল।

ওকে হঠাৎ এভাবে উঠে দাঁড়াতে দেখে চমকে গেল হাই-হীলের মালিক পিছিয়ে গেল এক পা।

তাড়াতাড়ি কানের ওপর থেকে হেডফোন সরিয়ে নিল বিলি। বেজবল ক্যাপটা টেনে ঢেকে দিল মাথার কাটা দাগ। তার সবচেয়ে মধুর আর মোলায়েম হাসিটা উপহার দিয়ে বলল, 'মিলি, কেমন আছ?'

'ওফ, বিলি, যা কাণ্ড করো না! ভয় পাইয়ে দিয়েছিলে!'

কথা হারিয়ে ফেলল বিলি। ভয় দেখানো দূরে থাক, কোনমতেই সামান্য চমকে দিতেও চায় না সে মিলিকে।

'সরি, মিলি,' মেয়েটার চোখের দিকে তাকিয়ে বলল সে। তার মতে পুরো কাউন্টিতে এত সুন্দর চোখ অন্য কোন মেয়ের নেই। হয়তো পুরো আমেরিকাতেও এত সুন্দরী নেই আর কেউ। এটাও কেবল ওর ধারণা। মিলি হলো বিলির বয়েসী একেবারে নিখুঁত সুন্দরী একটা মেয়ে।

নিজের হাতের দিকে তাকাল সে। তেলকালি মাখা। গ্যারেজে থাকলে সব সময়ই হাতে ময়লা লেগে থাকে। হাত দুটো সরিয়ে নিল।

'বাবা কোথায়?' জানতে চাইল মিলি।

প্রশ্নটা নিরাশ করল বিলিকে। সে ভেবেছিল শুধু তার সঙ্গেই দেখা করতে এসেছে মিলি। ওর সঙ্গে কথা বলতে।

'একটা নষ্ট গাড়ি আনতে গেছেন।'

মিলির মুখের দিকে তাকিয়ে রইল বিলি। ওকে সামনে দেখলে কিছুতেই চোখ সরাতে পারে না। লক্ষ করেছে এতে অস্বস্তি বোধ করে মিলি। কিন্তু সে সরাতে পারে না, কি করবে? এত সুন্দর একটা মুখের ওপর থেকে চোখ সরায় কি করে মানুষ? শিল্পীর হাতেগড়া চেহারা!

'আর কি করতে পারি তোমার জন্যে?' জিজ্ঞেস করল বিলি।

'আর কিছু না। বাবা বলেছিল, আজ একসঙ্গে লাঞ্চ খাব আমরা।'

দ্রুত ভাবনা চলল বিলির মাথায়। মিস্টার হাওয়ার্ড যখন নেই, সে নিজেও তো খাওয়ানোর প্রস্তাব দিতে পারে মিলিকে। ও নিশ্চয় সেটা পছন্দ করবে।

'তোমার কি খিদে পেয়েছে?' জানতে চাইল বিলি। 'তোমাকে আমি খাওয়াতে পারি। কি খাবে?' হেসে বলল, 'আমার কাছে জেলি ডোনাট আছে। কালকের বানানো। তবে এখনও তাজা। খাবে একটা?'

নিজের অজান্তেই এক পা আগে বাড়ল সে।

পিছিয়ে গেল মিলি। মাথা নাড়ল।

বিলি মনে করল তার নোংরা পোশাক দেখেই সরে গেছে মিলি। ওর ঝলমলে জামাকাপড় আর চকচকে জুতোর দিকে তাকিয়ে একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল বিলির বুক থেকে। 'খাবে না কেন? কালকের বলে?'

এই সময় একটা টো ট্রাক ঢুকতে দেখা গেল গ্যারেজের গেট দিয়ে। এসে গেছেন মিস্টার হাওয়ার্ড—মিলির বাবা এবং বিলির বস্।

ট্রাকটাকে দেখামাত্র তাড়াতাড়ি দুই পা পিছিয়ে গেল বিলি।

কাছে এসে দাঁড়াল ট্রাক। ক্যাব থেকে বেরিয়ে এলেন জোসেফ হাওয়ার্ড। লম্বা, সুদর্শন। মিলির দিকে তাকিয়ে হাসিমুখে বললেন, 'সরি, দেরি হয়ে গেল। অনেকক্ষণ এসেছিস?'

মাথা নাড়ল মিলি, 'না, এই এলাম।'

'ওই অভাগা পিজ্জা-বয়টার পোড়া গাড়িটা আনতে আনতে দেরি হয়ে গেল।'

মেয়ের সঙ্গে কথা শেষ করে বিলির দিকে তাকালেন হাওয়ার্ড। 'বিলি, পোড়া গাড়িটার একটা ব্যবস্থা করো। তাড়াহুড়ো নেই। ও হ্যাঁ, ভাল কথা, রেডিওতেই তোমাকে বলতে চেয়েছিলাম— কয়েকটা ছেলে তোমার সঙ্গে দেখা করতে আসবে। শখের গোয়েন্দা। আমাকে এসে ধরল। বললাম, আমার গ্যারেজেই কাজ করে। ছেলেগুলোকে ভাল মনে হলো আমার। বলে দিলাম, তুমি অবশ্যই দেখা করবে।'

বিষণ্ণ, গম্ভীর ভঙ্গিতে মাথা ঝাঁকাল বিলি। মনে মনে প্রশ্ন করল নিজেকে, 'গোয়েন্দা, না? আমার কাছে কি কাজ ওদের? গাড়ি সেরে দেয়ার জন্যে ভাল মেকানিক চায়?'

কিন্তু নিশ্চিত জবাবটা পেল না।

মেয়ের সঙ্গে হেসে হেসে কথা বলছেন হাওয়ার্ড। সেদিকে দীর্ঘ একটা মুহূর্ত তাকিয়ে থেকে টো ট্রাকটার দিকে পা বাড়াল সে।

★

'হুঁ, এই বোকাটাই তাহলে মারা পড়েছে?'

লেসলি কার্টারিসের ছবিটার দিকে তাকিয়ে মনে মনে বলল বিলি। লেসলির স্কুল জীবনের ছবি। ঝাঁকড়া চুল, সুন্দর স্বাস্থ্য, মিষ্টি হাসিতে দুনিয়া জয় করার ভঙ্গি। এধরনের মানুষকে অপছন্দ করে বিলি, দুচোখে দেখতে পারে না। নিজের চেয়ে ভাল স্বাস্থ্য আর সুন্দর চেহারার কাউকে দেখলেই ঈর্ষা হয় তার। ঘৃণা হয়। একে শেষ করে দিয়েছে বলে অনুশোচনা তো দূরে

থাক, খুশি হলো মনে মনে।

'ঘটনাটা খুব দুঃখজনক,' নীরস কণ্ঠে বলল সে।

ছবিটা দিয়েছে কিশোর। কিন্তু রবিনের হাতে ফিরিয়ে দিল বিলি। কিশোরের তীক্ষ্ণ চোখের দিকে তাকানোর সাহস হচ্ছে না তার। দৃষ্টি তো নয়, যেন ধারাল ছুরি। অন্তরের অন্তস্তলটা পর্যন্ত যেন দেখে নেয়। রবিন কিংবা মুসার দিকেও তাকাল না সে। যন্ত্রপাতি নিয়ে খুটুরখাটুর শুরু করল। অনুভব করল, তিন জোড়া চোখ এখন তাকিয়ে আছে তার দিকে। নিচের দিকে মুখ নামিয়ে রেখে কাজ করার ভান করতে করতে জানতে চাইল, 'কি করে মারা গেল?'

'শেরিফ আর করোনারের কাছে শুনলাম বজ্রপাতে,' জবাব দিল কিশোর।

না হেসে পারল না বিলি। 'হ্যাঁ, এরকম ঘটনা এখানে আজকাল হরহামেশাই ঘটে।' মোড়ক খুলে একটা চিউয়িং গাম মুখে ফেলে চিবাতে শুরু করল। 'কোথায় মরল?'

'ভিডিও আর্কেডের বাইরে,' জানাল কিশোর। 'লোকটা যখন মারা গেছে আকাশে মেঘ থাকলেও একবারও বিদ্যুৎ চমকায়নি। বজ্রপাতের শব্দ শোনা যায়নি।'

বিলির ওপর থেকে ক্ষণিকের জন্যেও চোখ সরাচ্ছে না সে।

অস্বস্তি বোধ করতে লাগল বিলি। এভাবে তাকিয়ে আছে কেন ছেলেটা? কিছু আঁচ করে ফেলেছে? নাকি কায়দা করে ওর পেটের কথা বের করার চেষ্টা এটা?

'কাল রাতে তুমি ওখানে গিয়েছিলে, তাই না?' জিজ্ঞেস করল কিশোর।

'হ্যাঁ,' সত্যি জবাবটাই দিল বিলি। নিজেকে বোঝাল, মিথ্যে যত কম বলে পার করা যায়, ততই মঙ্গল। এই ছেলেটাকে ফাঁকি দেয়া সহজ হবে না।

'তাহলে নিশ্চয় অস্বাভাবিক কিছু চোখে পড়েছে তোমার?'

মাথা নাড়ল বিলি। 'দেখো, আমি যখন খেলা নিয়ে মেতে থাকি, দুনিয়ার কোন কিছুই চোখে পড়ে না আমার। অ্যাটম বোমা ফাটালেও শুনতে পাব না আমি।'

'কেন, কালা নাকি ব্যাটা তুই?' মনে মনে রেগে উঠল মুসা। প্রথম দর্শনেই অপছন্দ করেছে এই মোটর মেকানিককে।

যেন তার মনের কথাটাই শুনে ফেলল বিলি। চট করে চোখ তুলে তাকাল মুসার দিকে। ওর দিকেই তাকিয়ে আছে নিগ্রো ছেলেটা। তবে কোঁকড়া-চুল ছেলেটার মত দৃষ্টির তীক্ষ্ণতা নেই এর, আছে ঝাঁজ।

আবার চোখ নামিয়ে নিজের কাজে মন দেয়ার ভান করল বিলি।

কিশোর বলল, 'বিলি, একটা ব্যক্তিগত প্রশ্ন করি? নিজেকে কি ভাগ্যবান মনে করো তুমি?'

'আমি?' নিজের বুকে হাত রাখল বিলি। মনে মনে বলল, 'বেকুবটা বলে

কি? আমি ভাগ্যবান হলে দুনিয়ায় হতভাগা মানুষ আর কে? নাহ্, চোখ দেখে যতটা মনে হয়েছে, ততটা বুদ্ধিমান তো নয়।' জবাব দিল, 'না, সেটা মনে করবার কোন কারণ নেই।'

'কেন ভাগ্যবান, বুঝিয়ে দিচ্ছি আমি। তোমার মাথায়ও বাজ পড়েছিল। কিন্তু বেঁচে গেছ। বাকি সব কজন মারা গেছে। ওদের চেয়ে তুমি ভাগ্যবান নও?'

হঠাৎ মাথার কাটা দাগটা চুলকাতে শুরু করল বিলির। বাজ পড়েছিল ঠিক ওখানটাতেই। অন্য যে কেউ হলে সঙ্গে সঙ্গে পরপারে চলে যেত। কিন্তু সে তো যায়ইনি, বেঁচে গেছে, আগের চেয়ে ক্ষমতাশালী হয়েছে আরও। ওর বেঁচে যাওয়াটা ডাক্তারদের কাছে একটা বিস্ময়।

'হ্যাঁ, সেদিক থেকে আমাকে ভাগ্যবান বলতে পারো অবশ্য।' প্রশ্নটা অস্বস্তিতে ফেলে দিয়েছে বিলিকে। কিশোরকে বিদেয় করার জন্যে একটা বুদ্ধি বের করল সে।

'কিশোর!' চেঁচিয়ে উঠল রবিন। 'আগুন! তোমার পকেটে ধোঁয়া!'

চট করে চোখ ফেরাল কিশোর। সত্যিই তার জ্যাকেটের পকেট থেকে ধোঁয়া বেরোচ্ছে।

হাসি ঠেকানোর জন্যে জোরে জোরে চিউয়িং গাম চিবাতে লাগল বিলি।

পকেট থেকে সেলুলার ফোনটা টেনে বের করল কিশোর। ধোঁয়া বেরোচ্ছে ওটা থেকে।

'আগুন লাগল কি করে?' চোখ বড় বড় করে তাকিয়ে আছে মুসা। 'ব্যাটারি কখনও এভাবে পোড়ায় বলে তো শুনিনি!'

হাতে ছ্যাঁকা লাগতে তাড়াতাড়ি যন্ত্রটা ফেলে দিল কিশোর। মাটিতে পড়ে গলতে শুরু করল ওটার প্লাস্টিক বডি। ধোঁয়া বেরোচ্ছে অনবরত। হাতের তালুতে আঙুল বোলাতে লাগল সে।

পুড়ে যাওয়া ফোনটার দিকে তাকিয়ে আনমনে মাথা নাড়ার ভঙ্গি করল বিলি, 'এসব আধুনিক যন্ত্রপাতির ওপর বিশ্বাস নেই। কখন যে কোন অঘটন ঘটাবে...' কিশোরের দিকে এতক্ষণে মুখ তুলে তাকাল সে। 'তোমাদের কথা শেষ হলে যেতে পারো। আমার জরুরী কাজ পড়ে আছে।'

গম্ভীর হয়ে ওর দিকে তাকিয়ে রয়েছে কিশোর। তারপর বলল, 'সাহায্যের জন্যে ধন্যবাদ। অনেক বিরক্ত করলাম তোমাকে।'

'না-না, ও কিছু না।'

একটা এঞ্জিন খোলায় মন দিল বিলি।

পাঁচ

ছোট্ট যে বাংলো বাড়িটাতে বাস করে বিলি আর তার মা, এই এলাকার

সবচেয়ে পুরানো বাড়ি ওটা। রঙ চটে গেছে বহুকাল আগে। কাত হয়ে পড়েছে একপাশে। সামনের সিঁড়ির তিনপাশ ঘিরে আগাছা জন্মেছে। ড্রাইভওয়েটা ঘাস আর আগাছায় ঢেকে গিয়ে চেনাই যায় না। বাড়ির সামনে স্তূপ হয়ে আছে জঞ্জাল।

বাড়ি ফিরে বিলি দেখল তন্ময় হয়ে টেলিভিশনের দিকে তাকিয়ে রয়েছেন তার মা। নিজের সমান লম্বা একটা কাউচে কনুইয়ে ভর দিয়ে কাত হয়ে শুয়েছেন। টক-শো হচ্ছে টিভিতে। গভীর মনোযোগে ওদের বাদানুবাদ শুনছেন তিনি।

দরজায় দাঁড়িয়ে মুচকি হাসল বিলি। পর্দার দিকে বিশেষ দৃষ্টিতে তাকাল। সঙ্গে সঙ্গে চ্যানেল বদলে গিয়ে দেখা গেল এমটিভি।

ঝটকা দিয়ে ফিরে তাকালেন মা। চিৎকার করে বললেন, 'রিমোট টেপাটেপি করছিস কেন? দে আগেরটা!'

গায়ে শক্ত কি যেন লাগল তাঁর। চোখ নামিয়ে দেখেন রিমোটটা তাঁর পাশে কাউচেই পড়ে আছে। বিস্মিত চোখ তুলে তাকালেন ছেলের দিকে।

বিলি তখন টিভির দিক থেকে নজর সরিয়ে নিয়েছে। চকোলেট মিল্কের একটা ব্যাগ কাটতে ব্যস্ত। রিমোট টিপে অনুষ্ঠান আবার আগের চ্যানেলে ফিরিয়ে আনলেন মা।

'কি যে ছাইপাঁশ দেখো তুমি, মা,' বিলি বলল। 'যত সব ছাগলের দল!'

'ছাগল হোক আর যাই হোক, টেলিভিশন তো ওদেরকে দাওয়াত করে নিয়ে যায়,' কাটা জবাব দিলেন মা। 'তোকে তো নেয় না।'

'ছাগলে ছাগল চেনে, পাগলে পাগল,' যেন কি একটা মস্ত রসিকতা করে ফেলেছে ভেবে খিকখিক করে হাসতে লাগল বিলি। বিশ্রী ভঙ্গিতে শব্দ করে ঢেকুর তুলল।

মাথা নাড়তে নাড়তে মা বললেন, 'ভদ্রব্যবহার করতে পয়সা লাগে না, বিলি। তুই আর মানুষ হবি না কোনদিন। কোন্ মেয়ে তোর এই জঘন্য ঢেকুর তোলা সহ্য করবে?'

'যে করবে, তাকে দেখলে তোমার জবান বন্ধ হয়ে যাবে, মা।'

ছেলের দৌড় জানা আছে মায়ের। তার কথাকে গুরুত্বই দিলেন না। আবার মনোযোগ ফেরালেন টেলিভিশনের দিকে।

'মা যতই খোঁচা দিয়ে কথা বলুক,' ভাবছে বিলি, 'টেলিভিশনের ওই গর্দভগুলোর দলে কোনদিন যোগ দেব না আমি। ওদের চেয়ে অনেক বেশি ক্ষমতা আমার, অনেক বড় কাজ করতে পারি। সারা পৃথিবীকে কাঁপিয়ে দিতে পারি।'

মনে মনে নানা রকম পরিকল্পনা করতে লাগল বিলি। সবগুলোই মিলিকে জড়িয়ে। ওকে বাদ দিয়ে কোন কিছু করার ইচ্ছে নেই তার। মিলি তার সঙ্গে অন্য মেয়েদের মত খারাপ আচরণ করে না। তাকে অবহেলা করে না। এড়িয়ে চলে না। তাকে বোকা বলে না। তার রসিকতায় হাসে। তার খাতায় ভাল ভাল কথা লিখে দেয়। তাকে উৎসাহ দেয়। তাকে যে পছন্দ করে, তার

জন্যে মায়া আছে, তার খারাপ কিছু হলে কষ্ট পাবে, এটা স্পষ্টই বুঝিয়ে দেয়। তাকে বেঁচে থাকার প্রেরণা জোগায়।

দরজায় টোকার শব্দ ভাবনার জগৎ থেকে ফিরিয়ে আনল বিলিকে। বিশেষ ধরনের পরিচিত টোকা। পটেটো এসেছে। দরজা খুলতে যাওয়ার আগে টেলিভিশনের দিকে তাকাল বিলি আরেকবার। মুহূর্তে হট্টগোল শুরু হয়ে গেল তাতে। ছবি ঠিকই থাকল, শব্দ হয়ে গেল গোলমেলে। কিছু বোঝা যায় না। মুচকি হাসল সে। গেল বিরক্তিকর গাধাগুলোর বকবকানি।

মা কিছু বলার আগেই ঘর থেকে ছুটে বেরিয়ে গেল সে। দরজায় দাঁড়িয়ে আছে পটেটো। ঠোঁটে আঙুল রেখে তাকে এখানে কথা না বলতে ইশারা করল। নেমে গেল আঙিনায়।

পিছন পিছন গেল পটেটো। 'বললে বিশ্বাস করবে না, বিলি। আজ কারা এসেছিল আর্কেডে, তুমি কল্পনাও করতে পারবে না!'

'অনুমান করতে বলছ? গোয়েন্দা।'

থমকে দাঁড়াল পটেটো। 'কি করে জানলে?'

'গ্যারেজেও হানা দিয়েছিল ওরা।'

'তোমাকে খুঁজে বের করল কিভাবে?'

'সেটাই তো আমি জিজ্ঞেস করতে চাই তোমাকে!' কঠিন হয়ে উঠল বিলির কণ্ঠ। 'নিশ্চয় কোন ফাঁকে ভুল করে আমার নামটা বলে দিয়েছ ওদের কাছে।'

হাঁটার গতি বাড়িয়ে দিল বিলি। ওর সঙ্গে তাল রাখতে হিমশিম খেয়ে গেল পটেটো।

'না না, আমি একবারও তোমার নাম বলিনি। সত্যি।'

মাঠে বেরিয়ে এসেছে ওরা। বিলিদের বাড়ির পেছনের তৃণভূমিটা বছরের এসময়ে সবুজ ঘন ঘাসে ভরা থাকে। এক সময় এটা ফক্স পরিবারের সম্পত্তি ছিল, বিলির দাদার। কিন্তু পরে হাতছাড়া হয়ে যায়। যেমন করে সব কিছু খুইয়েছে ওরা।

কাঁটাতারের বেড়াটা লাফ দিয়ে পেরিয়ে এল বিলি। তারের মাঝের ফাঁক দিয়ে ঢোকার চেষ্টা করতে লাগল পটেটো।

'থাকো ওখানেই!' বিলি বলল।

ঢাল বেয়ে পাহাড়ে উঠতে শুরু করল সে।

পটেটো ভাবল ওর ওপর রেগে যাওয়ায় ওকে সঙ্গে যেতে মানা করছে বিলি। 'সত্যি বলছি, বিলি, আমি কিছু বলিনি। তোমার কোন ক্ষতি কি আমি করতে পারি?'

পাহাড়ের ওপরে ছোট একটা চত্বরমত জায়গা আছে। ঘাস খেতে খেতে ওখানে উঠে যায় গরুর পাল। রাতে বেশির ভাগ নেমে আসে। কিছু কিছু বেশি দুঃসাহসী গরু আছে, বাড়ি ফিরতে ইচ্ছে করে না, রাতেও থেকে যায় ওখানেই। গরু কি করে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ঘুমায়, ভাবতে অবাক লাগে বিলির।

'তুমি চলে যাও, পটেটো,' ফিরে তাকিয়ে বলল বিলি। 'আমার এখন

কাবাব খেতে ইচ্ছে করছে।'

ভারী দম নিল পটেটো। কাঁপা গলায় বলল, 'এখন? না না বিলি, গরু ঝলসানোর সময় এটা নয়!'

জবাবে হা-হা করে হাসল বিলি। 'যাও, চলে যাও। প্র্যাকটিসটা চালু রাখতে হবে আমাকে। নইলে শেষে দেখা যাবে অস্ত্র ভোঁতা হয়ে গেছে। ঠিকমত কাজ করছে না আর।'

'প্লীজ, বিলি, এখন ওসব করতে যেয়ো না!'

ওর কাকুতি-মিনতিতে কান দিল না বিলি। আবার হেসে উঠল। সে কিছু করতে গেলে পটেটোর এভাবে বাধা দেয়া দেখে মজা পায়।

মানুষের সাড়া পেয়ে এক এক করে জেগে উঠতে শুরু করেছে গরুগুলো। বাঁ বাঁ করে ডাকছে। বুঝতেই পারছে না কি ভয়ঙ্কর ব্যাপার ঘটতে যাচ্ছে ওদের ভাগ্যে।

পটেটোর কাছ থেকে সরে এসেছে বিলি। পাহাড়ের ওপরে উঠে আকাশের দিকে চোখ তুলে তাকাল। মেঘ জমেছে। তারা ঢেকে দিচ্ছে। ঝোড়ো বাতাস বইতে শুরু করল।

ফুলে উঠল মেঘ। ঘন নীল হয়ে গেল রঙ। বিদ্যুৎ-শক্তিতে বোঝাই। প্র্যাকটিস করার উপযুক্ত সময়।

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, শুনতে পাচ্ছি আমি,' আকাশের দিকে তাকিয়ে মেঘের সঙ্গে কথা বলতে শুরু করল বিলি। 'আমি রেডি। চলে এসো!'

আরও ছড়িয়ে পড়ল মেঘ। সব তারা ঢেকে দিল। ঝোড়ো বাতাসের গর্জনের মাঝে গরুগুলোর ডাকাডাকি বেড়ে গেল। আকাশের অনেক উঁচুতে বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে ঘন ঘন।

'আমি এখানে!' চিৎকার করে বলল বিলি। 'এই যে এখানে! পারলে এসে ধরো আমাকে!' বলেই যতটা জোরে সম্ভব দৌড়াতে শুরু করল সে। গরুগুলোর মাঝখানে চলে এল।

'কই আসছ না কেন?' আকাশের দিকে তাকিয়ে আরও জোরে চিৎকার করে উঠল সে। 'এসো! ধরো আমাকে!'

দুই হাত ছড়িয়ে দিয়েছে সে। তাকিয়ে আছে রেগে যাওয়া মেঘের দিকে।

'এসো এসো! ধরো! আমি অপেক্ষা করছি!' ওপর দিকে দুই হাত তুলে দিল সে। 'এসো! ধরো আমাকে।'

বিলি দেখেছে, এভাবে ওপর দিকে হাত তুলে দিলে বিদ্যুৎ ছুটে আসে তার দিকে। বাড়ির ছাতে বসানো দণ্ডের মত আকর্ষণ করে সে বিদ্যুৎকে।

ফেটে পড়ল যেন আকাশটা। কোটি কোটি সাপের আঁকাবাঁকা জ্বলন্ত লেজ সৃষ্টি করে দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়ল বিদ্যুৎ-শিখা। বজ্রপাত ঘটতে লাগল ধরণী কাঁপিয়ে।

অন্যান্যবারের মত এবারেও ব্যতিক্রম ঘটল না। বিদ্যুৎ-শিখা ছুটে ছুটে আসতে লাগল তার দিকে। গরুগুলোর মাঝখান দিয়ে ছুটে বেড়াতে লাগল

সে। বিদ্যুৎ তাকে ধরতে না পেরে যেন প্রচণ্ড আক্রোশে গরুগুলোকে আঘাত হানতে লাগল। ভয়ে চিৎকার শুরু করেছে ওগুলো। বজ্রপাতে ঝলসে যাচ্ছে। মাংসপোড়া দুর্গন্ধে ভরে গেল বাতাস।

একটা বজ্র আঘাত হানল বিলিকে। শিরা বেয়ে তীব্র গতিতে বিদ্যুৎ ছড়িয়ে গেল সারা শরীরে। হাতের আঙুলের মাথা দিয়ে ছড়ছড় করে ছিটকে বেরোতে লাগল স্ফুলিঙ্গ। পায়ের পাতা আর আঙুল বেয়ে নেমে গেল মাটিতে।

পড়ে গেল বিলি।

থেমে গেল বজ্রপাত। কমে এল বিদ্যুৎ চমকানো।

মাটিতে লুটিয়ে পড়ে আছে বিলি। যেন অগ্নিপরীক্ষায় ক্লান্ত। দেহটা অসাড়। হাত-পা ঠিকমত নড়াতে পারছে না। অন্য কোন মানুষ হলে পুড়ে ছাই হয়ে যেত। বিলির কিছু হয়নি। তবে প্রচণ্ড ইলেকট্রিক শক সামলে নিতে কিছুটা সময় লাগবে।

দূর থেকে এতক্ষণ এই ভয়াবহ দৃশ্য প্রত্যক্ষ করেছে পটেটো। দৌড়ে এল কাছে। পড়ে থাকা দেহটার ওপর ঝুঁকে উদ্বিগ্ন কণ্ঠে জানতে চাইল, 'বিলি! তুমি ঠিক আছ তো? বিলি!'

'খবরদার! ধোরো না এখন আমাকে!' ফোঁস করে উঠল বিলি। উঠে বসল। ওর কানের দুল, দাঁতের গর্ত ভরাট করা ধাতুতে এখনও স্পার্ক করছে বিদ্যুৎ। শরীরের মধ্যে বিদ্যুৎ জমে আছে। বাতাসে বিদ্যুতের গন্ধ।

'খুব ভাল আছি,' হাসিমুখে জবাব দিল সে।

ছয়

একটা মরা গরুর সামনে এসে দাঁড়ালেন শেরিফ রবার্টসন। হতভাগ্য প্রাণীটার খোলা নিষ্প্রাণ দুই চোখে এখনও মৃত্যুক্ষণের বিস্ময়ের ছাপ প্রকট। ওটার সামনে থেকে সরে গিয়ে সেলুলার ফোন তুলে কানে ঠেকালেন। হিলটাউন শেরিফ ডিপার্টমেন্টে মান্ধাতার আমলের যন্ত্রপাতি সরিয়ে কিছু কিছু যেসব আধুনিক জিনিস ঢোকানো হচ্ছে, এই ফোনটা তার একটা।

পুরানো বন্ধু অস্টাডরিয়ান লাইটনিং অবজারভেটরির প্রোজেক্ট ডিরেক্টর হোমার বেলের সঙ্গে কথা বলছেন তিনি। গতরাতের বিদ্যুৎ-ঝড় সম্পর্কে শেরিফকে বিস্তারিত জানাচ্ছেন বেল।

'হুঁ-হাঁ' করে করে বেলের কথার জবাব দিচ্ছেন শেরিফ। এই সময় একটা খয়েরি রঙের সীডান গাড়ি এসে থামতে দেখলেন।

'ফ্যাক্স করে আমার অফিসে পাঠিয়ে দিতে পারবে?' গোয়েন্দাদের দিকে চোখ রেখে ফোনে বললেন শেরিফ। 'পারলে এখনই পাঠাও। অনেক ধন্যবাদ তোমাকে, হোমার। রাখি?'

সুইচ টিপে লাইন কেটে যন্ত্রটা পকেটে রেখে দিলেন শেরিফ। কাত হয়ে

আরেকটা মরা গরুর পাশ কাটিয়ে গাড়িটার দিকে এগোলেন।

গাড়ি থেকে নেমে আসছে তিন গোয়েন্দা।

আরও একটা গরুর পাশ কাটালেন শেরিফ। মাছি ভনভন করছে এটার ওপর।

ছেলেগুলোর মুখোমুখি হতে অস্বস্তি বোধ করছেন তিনি। এরকম ঝামেলায় আর জীবনে জড়াননি। হিলটাউনে অপরাধ খুব কম হয়। মাঝেসাঝে দু'চারটে মাতলামি, ঠগবাজি আর ছিঁচকে চুরির ঘটনা ছাড়া উল্লেখযোগ্য কিছুই ঘটে না। বড় বড় চুরি-ডাকাতি ঘটার মত সম্পদ নেই শহরটাতে।

ঢাল বেয়ে উঠে আসতে আসতে ওপর দিকে তাকাল কিশোর। কোমরে হাত দিয়ে ওদের দিকে ভুরু কুঁচকে তাকিয়ে আছেন শেরিফ এমন ভঙ্গি করে আছেন কেন? অস্বস্তি বোধ করছেন নাকি?

এগিয়ে এসে তাঁর সামনে দাঁড়াল কিশোর।

শেরিফ বললেন, 'খবর তাহলে পেয়ে গেছ?'

হেসে মাথা ঝাঁকাল কিশোর। 'কি দেখলেন? বজ্রপাতেই মারা গেছে?'

'কেন, অন্য কিছু আশা করেছিলে নাকি?'

'পত্রিকাওলারা তো বজ্রপাতে মারা যাওয়ার কথাই লিখেছে,' ঘুরিয়ে জবাব দিল কিশোর।

মাথা ঝাঁকালেন শেরিফ। আঙুল তুলে দেখালেন। পাহাড়ের ওপরের ঘাসে ঢাকা চত্বরে তিনটে গরু মরে পড়ে আছে।

এগিয়ে গিয়ে ভাল করে দেখল কিশোর। প্রতিটা গরুর শরীর ঝলসে গেছে। রস মত বেরোচ্ছে। ফিরে এসে বলল, 'তারমানে আসল বজ্রপাতেই মারা গেছে এগুলো,' বিড়বিড় করল সে। শেরিফের দিকে তাকাল, 'রিমোট কন্ট্রোলড নয়।'

মাথা দুলিয়ে বললেন শেরিফ, 'তাই তো মনে হয়। অবজারভেটরির হোমার বেলের সঙ্গে কথা বললাম এইমাত্র। ওই বনের ওপাশে মাইলখানেক দূরে ওটা।'

ফিরে তাকাল কিশোর। যেন গাছপালার মধ্যে কোথায় লুকিয়ে আছে অবজারভেটরিটা দেখতে চায়।

'বজ্রপাতের কথা কিছু বলেছে?'

'বলেছে। কাল রাতে বেশ কিছু বাজ পড়েছে এই পাহাড়ের ওপর। পৃথিবীর যে কোন জায়গার যে কোন বজ্রপাতের ঘটনা ধরা পড়ে ওদের যন্ত্রে। রেকর্ড থেকে যায়। বিদ্যুৎ চমকালে একটা নির্দিষ্ট ফ্রিকোয়েন্সিতে বেতার-তরঙ্গ ছড়িয়ে দেয়...'

'শূম্যান রেজোন্যান্স বলে একে,' শেরিফের মুখ থেকে কথাটা প্রায় কেড়ে নিয়ে বলল কিশোর। বিজ্ঞতা জাহির করে আনন্দ পেতে দিল না তাঁকে। 'প্রতি সেকেন্ডে আট সাইকেল। সাধারণ ট্র্যানজিসটর রেডিও দিয়েও ধরা যায়।'

চুপ হয়ে কিশোরের দিকে তাকিয়ে আছেন শেরিফ। এই ছেলেটার সঙ্গে

সতর্ক হয়ে কথা বলতে হবে। এ ডক্টর এলিজা নয়। কখন লজ্জা দিয়ে দেবে কে জানে!

হেসে খোঁচাটা দিয়েই দিল কিশোর, 'দেখলেন তো, আমি হোমওয়ার্ক ঠিকমতই করি।'

হেসে ফেললেন শেরিফ। 'কাল রাতে যে সাধারণ বজ্রপাতেই মারা গেছে গরুগুলো, এ ব্যাপারে সন্দেহ থাকার কারণ নেই।'

'তারমানে সন্দেহ আছে আপনার?'

দ্বিধা করলেন শেরিফ, 'একটা ব্যাপারেই খটকা লাগছে—একসঙ্গে একই জায়গায় এতগুলো বাজ পড়ল কিভাবে? অবস্থা দেখে মনে হয় যেন কেউ ওগুলোকে ঠিক এখানেই পড়তে বাধ্য করেছিল!'

কয়েক গজ সরে গিয়ে একটা সমতল জায়গায় দাঁড়ালেন তিনি। ঘাস ওখানে পাতলা। হাত নেড়ে ডাকলেন, 'এসো, দেখে যাও।'

এগিয়ে গেল তিন গোয়েন্দা।

আঙুল তুললেন শেরিফ। জুতোর খোঁচায় সরিয়ে দিলেন খানিকটা জায়গার বালি।

একসঙ্গে ঝুঁকে তাকাল মুসা, কিশোর আর রবিন।

'দেখেছ?' কালো একটা জিনিস পা দিয়ে দেখিয়ে জিজ্ঞেস করলেন শেরিফ, 'বলো তো এটা কি?' ভাবলেন, এটার জবাব অন্তত দিতে পারবে না কিশোর। চোখে চ্যালেঞ্জ নিয়ে মাথা তুলে হাসিমুখে তাকালেন ওর দিকে।

আরেকটু নিচু হয়ে ভাল করে দেখল কিশোর। মুখ তুলে বলল, 'ফুলগারাইট। তাই না?'

হাসি চলে গেল শেরিফের মুখ থেকে। 'এটাও জানো!'

নিরীহ কণ্ঠে জবাব দিল কিশোর, 'বজ্রপাতে এরকম হয়। বজ্র যেখানে পড়ে, প্রচণ্ড তাপে সেখানকার বালি গলে কাঁচ হয়ে যায়।'

মাথা ঝাঁকালেন শেরিফ। 'উঁ?'

হাত দিয়ে ডলে কালো জিনিসটার ওপরের বালি সরাল কিশোর।

'কি করছ?'

'তদন্ত।'

একটা মুহূর্ত চুপ করে রইলেন শেরিফ। তারপর বললেন, 'করতে থাকো। তবে এখানে নতুন আর কিছু পাবে বলে মনে হয় না। আমি যাই। আমার কাজ আছে।'

বলে আর দাঁড়ালেন না তিনি। লম্বা লম্বা পায়ে হাঁটতে শুরু করলেন নিজের গাড়ির দিকে।

বসে পড়ল কিশোর। কালো জিনিসটার একপাশে আঙুল ঢুকিয়ে টেনে তোলার চেষ্টা করতে লাগল।

'কি করছ?' শেরিফের প্রশ্নটাই করল আবার রবিন।

'সূত্র খুঁজছি?'

'কিসের?'

'এখনও শিওর নই। দেখি আগে।'

আর কিছু বলল না রবিন। মুসাও চুপচাপ দেখছে।

কালো, শক্ত কাঁচটা টেনে তুলতে গিয়ে খানিকটা ভেঙে ফেলল কিশোর। হাতে নিয়ে লেগে থাকা বালির কণা সরিয়ে চোখের সামনে এনে দেখতে লাগল। তারপর বাড়িয়ে দিল দুই সহকারীর দিকে, 'দেখো এখন। বজ্রপাতে বালি গলে কাঁচ হয়, এটা বৈজ্ঞানিক সত্য। কিন্তু কাঁচের মধ্যে মানুষের পায়ের ছাপ পড়ে, এটা কোন সত্য?'

'খাইছে! বলো কি? ভূতুড়ে কাণ্ড নাকি?' ভয়ে ভয়ে কাঁচটার দিকে তাকাল মুসা। হাতে নেয়ার সাহস করল না।

কিন্তু রবিনের ওসব ভয় তেমন নেই। কাঁচটা নিয়ে দেখতে লাগল। কালো, পুরু কাঁচের মধ্যে সত্যিই একটা জুতোর ছাপ। জুতোর তলার সামনের অংশ। পুরোটাই পড়েছিল। পেছনটা রয়ে গেছে মাটিতে গেঁথে থাকা কাঁচের ভাঙা অংশে।

বিশ্বাস করতে পারছে না। হাত দিয়ে ডলে সরিয়ে দিতে চাইল ছাপটা। বুঝতে চাইল, সত্যি ছাপ, না কাঁচের গায়ে পড়া আলোর কারসাজি।

নাহ্, সত্যিই ছাপ! কোন সন্দেহই নেই আর তাতে।

'এক কাজ করো না কেন?' সহকারীদের দিকে তাকিয়ে বলল কিশোর। 'এটা নিয়ে কোন ফরেনসিক ল্যাবরেটরিতে চলে যাও পরীক্ষা করানোর জন্যে।'

'তুমি কি করবে?'

বনের দিকে মুখ ফেরাল সে, 'অবজারভেটরিতে যাব।'

সাত

'হিলটাউনের বজ্রপাত সম্পর্কে কিছু বলুন, স্যার,' অনুরোধ করল কিশোর।

'তেমন কিছু বলার নেই। সারা বছরই বজ্রপাত ঘটে এখানে। সময় অসময় নেই।'

অস্টাডোরিয়ান লাইটনিং অবজারভেটরির পরিচালক ডক্টর হোমার বেলের সঙ্গে দেখা করতে এসেছে কিশোর। পাহাড়ের ঢালে ওক বনের আড়ালে লুকিয়ে রাখা হয়েছে বিরাট বিল্ডিংটা। যেন বাইরের কেউ দেখে ফেললে কি জানি কি ক্ষতি হয়ে যাবে। চ্যাপ্টা, লম্বা বাড়িটার ছাতে রেডার অ্যান্টেনা আর মাইক্রোওয়েভ ট্র্যান্সমিটারের মিলিত চেহারার একটা যন্ত্র বসানো। পুরো ছাতে খাড়া করে বসানো সারি সারি লাইটনিং রড।

ভেতরে বড় একটা সাজানো গোছানো ঘরে আলোকিত ইলেকট্রনিক ডিসপ্লে শো করছে বিদ্যুতের ইতিহাস। যে কোন স্কুলছাত্র বিপুল আগ্রহ নিয়ে হাঁ করে তাকিয়ে থাকবে ঘরটার দিকে। তবে দেখার জন্যে ওদের যে ঢুকতে দেয়া হয় না, অনুমান করে নিয়েছে কিশোর। শেরিফ রবার্টসন সাহায্য না

করলে সে নিজেও ঢুকতে পারত না।

ধূসর হয়ে আসা চুলদাড়ির ফাঁক দিয়ে হাসি দেখা গেল ডক্টর বেলের ঠোঁটে। 'সব সময় এখানকার আকাশে মেঘ জমে, মেঘের ফাঁকে বিদ্যুৎ চমকায়, শোনা যায় বজ্রের গুড়ুগুড়ু।'

'এর কারণ কি, স্যার?'

ভুরু উঁচু করলেন বেল। 'সেটাই তো জানার চেষ্টা করছি আমরা। এত বেশি জমে কেন এখানে?'

স্কাইলাইটের ভেতর দিয়ে আকাশের দিকে তাকাল কিশোর। ছাতের কোন জায়গা বাদ দেয়া হয়নি। এমনকি স্কাইলাইটেও বসানো হয়েছে লাইটনিং রড। কাঁচের ভেতর দিয়ে ছাতের বিরাট কিম্ভূত যন্ত্রগুলো চোখে পড়ছে।

'ওই রড বসানোর আসলেই কি কোন দরকার ছিল?'

'বজ্রকে বিশ্বাস নেই। কখন যে কোথায় গিয়ে পড়বে কেউ জানে না। যত বেশি রড লাগানো যাবে, ওগুলোর আকর্ষণে তত বেশি ছুটে আসবে বজ্র। কেন ওগুলো ছুটে আসে, জানা সহজ হবে। কেউ কেউ জীবন্ত প্রাণীর সঙ্গে তুলনা করে একে। বলে, বজ্রের মন আছে, চিন্তা করার ক্ষমতা আছে।'

ডিসপ্লের সামনে পায়চারি শুরু করলেন ডক্টর। তাঁর পাশে হাঁটতে হাঁটতে নানা প্রশ্ন করতে লাগল কিশোর। নোটবুকে টুকে নিল। ডিসপ্লেতে নানা ধরনের বজ্রের কথা লেখা আছে। মনোযোগ দিয়ে পড়ল সেগুলো।

নানা রকম যন্ত্রপাতির মধ্যে রয়েছে টেসলা কয়েল। বাতাস থেকে বিদ্যুৎ শুষে নেয়। আরেকটা আছে জ্যাকবস্ ল্যাডার। সমান্তরাল দুটো দণ্ডের একটা আরেকটাকে লক্ষ্য করে ক্রমাগত নীল বিদ্যুৎ ছুঁড়ে দিচ্ছে। এরকম একটা গবেষণাগারের পরিচালক হওয়ার জন্যে গর্ব বোধ করবেন যে কোন বজ্র-বিজ্ঞানী। ডক্টর বেলও তাই করছেন।

'ছাতের ওই যন্ত্রটা দিয়ে কি হয়, স্যার?' জানতে চাইল কিশোর।

এক মুহূর্ত দ্বিধা করে জবাব দিলেন ডক্টর, 'কেমিক্যাল স্টোরেজ। ওয়েট সেল।'

রীতিমত অবাক হলো কিশোর। 'মানে ব্যাটারি?'

আঙুল তুলে ঘরের চারপাশটা দেখালেন ডক্টর। 'এখানকার সমস্ত যন্ত্রপাতি বজ্র থেকে শক্তি আহরণ করে চলে, কিশোর। ছাতের রডগুলোতে আঘাত হানে বজ্র। তাকে ধরে ফেলি আমরা। শক্তিটাকে জমিয়ে রেখে কাজে লাগাই। ধরার ব্যবস্থাটা এখনও নিখুঁত করতে পারিনি। তবে আশা করছি, করে ফেলতে পারব।'

'তার মানে আকাশের যে কোনখান থেকে বজ্রকে টেনে আনার ব্যবস্থা করেছেন আপনারা। যদি কোন কারণে আপনাদের লাইটনিং রডে আঘাত না হানে বজ্র? অন্য কোনখানে গিয়ে পড়ে, তখন? মানে, আমি বলতে চাইছি, স্যার, অ্যাক্সিডেন্ট তো ঘটতেই পারে, তাই না?'

প্রশ্ন শুনে আস্তে করে ডিসপ্লের দিক থেকে কিশোরের দিকে ঘুরলেন

ডক্টর। কিশোরের আপাদমস্তক দেখতে দেখতে চেহারায় ভাবের পরিবর্তন ঘটল।

'দেখো, লোকে মনে করে আমরা এখানে বসে বজ্র তৈরি করি। যন্ত্রপাতিগুলোর সাহায্যে আকাশে মেঘ জমাই, সেটা থেকে বজ্র...' শান্তকণ্ঠে বললেন তিনি। 'কিন্তু আমরা সেটা করি না। আকাশে আপনাআপনি মেঘ জমে, বজ্র তৈরি হয়, আমরা সেটা নিয়ে গবেষণা করি মাত্র। বজ্রপাতে শুধু হিলটাউনেই নয়, সারা পৃথিবীতেই মানুষ মারা যায়। তাদের মৃত্যুর জন্যে যেমন আমরা দায়ী নই, হিলটাউনের মর্মান্তিক দুর্ঘটনাগুলোর জন্যেও আমরা দায়ী নই। আমাদের অবজারভেটরি বসানোর বহু বহুকাল আগে থেকেই বজ্রপাত হত এখানে।'

'কিন্তু এখনকার মত এত নিশ্চয় হত না?'

থমকে দাঁড়ালেন ডক্টর বেল। ভুরু কোঁচকালেন। 'কি বলতে চাও?'

'কিছু মনে করবেন না, স্যার। আমি বলতে চাইছি, আপনাদের অবজারভেটরি কোনভাবে এখানকার আকাশে মেঘ জমানোয় সাহায্য করছে না তো? হয়তো তাতেই বজ্রপাত হচ্ছে বেশি বেশি...'

'মোটেও না!' রেগে উঠলেন ডক্টর। বোঝা গেল, এই প্রশ্নের মুখোমুখি তাঁকে আরও বহুবার হতে হয়েছে। 'হিলটাউনের আকাশে সব সময়ই মেঘ বেশি জমত, বজ্রপাত হত বেশি, সেজন্যেই অবজারভেটরি তৈরির জন্যে বেছে নেয়া হয়েছে এই জায়গা।'

'সরি, স্যার। আমি কিছু ভেবে ওকথা বলিনি...'

আবার পায়চারি শুরু করলেন ডক্টর। নরম হলো না ভঙ্গি।

প্রসঙ্গ থেকে সরে যাওয়ার জন্যে বলল কিশোর, 'স্যার, বজ্রপাতে মারা যাওয়া মানুষদের রেকর্ড রাখেন আপনারা?'

কাঁধ ঝাঁকিয়ে প্রশ্নটাকে যেন ঝেড়ে ফেলে দিলেন ডক্টর। 'না, রাখি না। আমরা শুধু কবে কোথায় কতবার বজ্রপাত ঘটল, তার রেকর্ড রাখি। মানুষ মরল কি বাঁচল, সে-খবরে আমাদের কোন প্রয়োজন নেই।'

'তারমানে হিলটাউনে বজ্রাহত হয়ে কতজন বেঁচে গেল, সেটাও নিশ্চয় বলতে পারবেন না?'

ভুরু কুঁচকে ফেললেন বেল। 'সেটা জানলে কি লাভ হবে তোমার?'

'দেখতাম আরকি, গায়ে বাজ পড়ার পরেও বেঁচে যায়, ওরা কেমন মানুষ?'

'কেমন আবার। তোমার আমার মতই স্বাভাবিক মানুষ।'

'কোনও অসাধারণ ক্ষমতা নেই ওদের বলতে চাইছেন?'

নিরাশ ভঙ্গিতে মাথা নাড়তে নাড়তে বললেন ডক্টর, 'কিশোর পাশা, অযথা সময় নষ্ট করছ তুমি আমার। আমাদের এই প্রতিষ্ঠান একটা বৈজ্ঞানিক গবেষণাগার। ভুডু কিংবা ব্ল্যাক ম্যাজিকের আখড়া নয়।'

একটা ব্রোঞ্জের মূর্তির দিকে তাকাল কিশোর। দেবরাজ জিউসের মূর্তি। হাতের দণ্ড থেকে বিদ্যুতের স্ফুলিঙ্গ ছুটছে। মিথলজি যদি বিজ্ঞান গবেষণাগারে

থাকতে পারে ম্যাজিক থাকলে দোষ কি?—প্রশ্ন করতে ইচ্ছে করল তার। বলল, 'আমিও বিজ্ঞানের কথাই বলছি, স্যার। জাদুবিদ্যা নয়। জানতে চাইছি, বজ্রপাতে আহত মানুষদের মধ্যে এমন কোন পরিবর্তন ঘটে কিনা, এমন কোন ক্ষমতা জন্মায় কিনা, যেটা বিস্ময়কর, অথচ তার বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা আছে।'

কাঁধ ঝাঁকালেন ডক্টর। শূন্যে দুই হাতের তালু চিত করে বললেন, 'ক্ষমতা জন্মায় কিনা জানি না, তবে বজ্রাহত হয়েও বেঁচে যায় কিছু কিছু মানুষ। বিদ্যুৎ সহ্য করার ক্ষমতা খুব বেশি ওদের। সব মানুষের সব কিছু সহ্য করার ক্ষমতা এক রকম হয় না। সহজ একটা উদাহরণ দিচ্ছি। পেটের কথাই ধরো। বাদুড়ের পোকা লাগা কাঁচা মাংস খেয়ে হজম করে ফেলতে দেখেছি আমি অস্ট্রেলিয়ান আদিবাসীদের। তুমি-আমি কি সেসব খাওয়ার কথা কল্পনা করতে পারব? যদি বা গিলি, পেটে সহ্য হবে না। ফুড পয়জনিং হয়েই মরে যাব। মানুষের নানা রকম সহ্য ক্ষমতার এমন ভুরি ভুরি উদাহরণ দেয়া যায়। তাই বলে ওদেরকে অস্বাভাবিক বলা যাবে না কোনমতেই।'

'আমিও ঠিক এই কথাটাই জানতে চাইছি, স্যার,' নিজের ধারণার সঙ্গে মিলে যাওয়ায় খুশি হলো কিশোর। 'ওসব জিনিস গিলে হজম করতে পারাটাও একটা বিশেষ ক্ষমতা, এটা নিশ্চয় অস্বীকার করবেন না। নইলে আমি-আপনি পারি না কেন?'

'তা অবশ্য ঠিক। তবে ক্ষমতা না বলে একে অভ্যাস বললেই ঠিক হবে। আফ্রিকায় কিছু ওঝাকে দেখেছি, ভয়াবহ বিষাক্ত মাম্বা সাপের কামড়েও কিচ্ছু হয় না ওদের। জিজ্ঞেস করেছিলাম। প্রথমে মুখ খুলতে চাইল না। পরে বলল, ছোটবেলা থেকে অল্প অল্প করে বিষ রক্তে ঢুকিয়ে সহ্য করতে করতে শেষে এমন সহ্যক্ষমতা জন্মেছে, কোন বিষেই আর কিছু হয় না।' ঘড়ি দেখলেন ডক্টর বেল। 'তোমার আর কোন প্রশ্ন আছে?'

'না, স্যার। অনেক সময় দিলেন। অনেক ধন্যবাদ আপনাকে। চলি, গুডবাই।'

দরজার দিকে পা বাড়াল কিশোর।

★

হুয়ারটন কাউন্টি বিল্ডিঙের ফরেনসিক ল্যাবরেটরির ওয়েইটিং রুমে বসে আছে মুসা আর রবিন। দুটো কারণে অপেক্ষা করছে—একটা, ফুলগারাইটের ছাঁচ শুকানোর। আরেকটা, কিশোরের আসার।

বার বার ছাঁচটার দিকে তাকাচ্ছে রবিন। টিপে দেখছে শক্ত হলো কিনা। মুসার দিকে ফিরে বলল, 'ভাল একটা সূত্র পাওয়া গেল।'

'তা তো গেল,' মুসা বলল। 'কিন্তু এই সূত্র ধরে এগোনোর উপায়টা কি?'

ঘরে ঢুকল কিশোর।

ফুলগারাইটের স্তর থেকে আস্তে করে ছাঁচটা টেনে খুলে আনল রবিন। চমৎকার একটা নকল তৈরি হয়েছে। স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে আধখানা জুতোর ছাপ। কিশোরকে দেখিয়ে বলল, 'অনেক তথ্য জমা হয়ে আছে এখানে, কি

বলো?'

একটা ব্রাশ দিয়ে ছাঁচের গায়ে লেগে থাকা আলগা প্লাস্টিক আর বালির কণা ঝেড়ে ফেলতে ফেলতে বলল, 'দেখে মনে হচ্ছে স্ট্যান্ডার্ড মিলিটারি বুট। সাড়ে আট নম্বর।'

ভুরু কোঁচকাল কিশোর। 'বিরাট পা।'

'কার, কিছু অনুমান করতে পারছ?'

কিশোর জবাব দেবার আগেই মুসা বলল, 'বিলি ফক্স?'

'সেই সম্ভাবনাই বেশি,' কিশোর বলল। 'এখনই গিয়ে ওর জুতো পরীক্ষা করা দরকার।'

আট

মহাসড়কের মাঝখানে একটা চৌরাস্তা। চারকোনাতেই ট্র্যাফিক লাইট আছে। গত কয়েক মাস ধরে অতিরিক্ত অ্যাক্সিডেন্ট হচ্ছে এখানে। কারণটা বুঝতে পারছে না কর্তৃপক্ষ। মহাসড়কে সাধারণত একটানা দ্রুতগতিতে গাড়ি চালিয়ে হঠাৎ ট্র্যাফিকপোস্টে লাল আলো জ্বলতে দেখলে থামতে চায় না চালকেরা, কিংবা থামতে গড়িমসি করে। সেকারণে দুর্ঘটনা ঘটে অনেক সময়। কিন্তু এ হারে নয়।

সেদিনকার বিষণ্ণ, নিরানন্দ দিনটিতে দুটো গাড়ি ছুটে যাচ্ছে চৌরাস্তার দিকে। বাদামী ক্রাইসলার গাড়িটা দূর থেকেই সবুজ আলো দেখেছে। গতি না কমিয়ে ছুটতে থাকল। অন্য রাস্তা ধরে আসা নীল ইমপালাটাও সবুজ আলো দেখে গতি কমাল না। দুটো গাড়ির একজন চালকও লক্ষ করল না—করার কথাও নয়—চারটে পোস্টের সবুজ বাতিই একসঙ্গে জ্বলে উঠেছে।

তীব্র গতিতে চৌরাস্তার দিকে ছুটে গেল দুটো গাড়ি। পরক্ষণে নীরবতা খান্‌খান্‌ হয়ে গেল টায়ারের তীক্ষ্ণ আর্তনাদে। সাঁই সাঁই স্টিয়ারিং ঘুরিয়ে একে অন্যের পথ থেকে সরে যাওয়ার চেষ্টা করল।

বেঁচে গেল নেহাত ভাগ্যের জোরে। প্রায় গায়ে গা ছুঁয়ে পাশ কাটাল একটা আরেকটার।

'অ্যাই, পাগলের বাচ্চা পাগল!' গাল দিল এক ড্রাইভার।

'বাপের রাস্তা পেয়েছে?' বলল আরেকজন।

দুই চালক খেঁকিয়ে উঠে যেন গায়ের ঝাল মেটাতে গাড়ি ছোটাল আরও জোরে।

আপনমনে হাসল বিলি ফক্স। একটা পরিত্যক্ত বাড়ির ছাতে উঠে ছাতের কিনারে পা ঝুলিয়ে বসে আছে। এই লাল আর সবুজ আলোর খেলাটা ভিডিও গেমের চেয়ে তার কাছে অনেক বেশি মজার। মানুষকে ভড়কে দিতে পেরে আনন্দ পায় সে। যাদের চমকে দিচ্ছে তারা প্রায় সবাই পরিচিত বলে মজাটা আরও বেশি।

সব মানুষকেই ভড়কে দিতে চায় না বিলি। যারা শত্রু, শুধু তাদের। ভয় দেখায় ওই সব সহপাঠীদের যারা ওকে নর্দমার কীট মনে করে। ওই সব দোকানদারদের, সে দোকানে ঢুকলেই যারা সন্দেহের চোখে তার দিকে তাকায়। ওই সব শহরবাসীদের যারা তার দিকে তাকিয়ে মুখ বাঁকায়, পেছনে আজেবাজে কথা বলে। ওদের কাউকেই ছাড়তে রাজি নয় সে। সুযোগ পেলেই ভোগাবে, এটা তার স্থির সিদ্ধান্ত। ভিডিও আর্কেডে পিজ্জাওলাটার হৃৎপিণ্ড কাবাব বানিয়েছে। একটা মথকে আগুনে পুড়তে দেখলে যতখানি দুঃখ হবে, সেটুকুও নেই তার জন্যে। সামান্যতম অনুশোচনা নেই।

গাড়ি দুটো কোনমতে বেঁচে চলে যাওয়ার পর অপেক্ষা করে বসে আছে সে, এই সময় পটেটোকে আসতে দেখল।

বাড়ির কাছে এসে ওপরে তাকিয়ে বিলি আছে কিনা দেখল পটেটো। তারপর সিঁড়ি বেয়ে উঠে আসতে শুরু করল ওপরে।

জায়গাটা খুব পছন্দ বিলির। চারপাশে বহুদূর চোখে পড়ে। অনেক কিছু দেখা যায়। নিরিবিলি বসা যায়। তার নতুন আবিষ্কৃত এই খেলাটা এখানে বসার আনন্দ বাড়িয়ে দেয় বহুগুণ

রাস্তার দিকে তাকিয়ে আরও দুটো গাড়ি আসতে দেখল বিলি। নতুন মডেলের গাড়ি। নিশ্চয় অ্যান্টিলক ব্রেক। এ ধরনের ব্রেক কতটা কাজের পরখ করে দেখা যাক, ভাবল সে।

পটেটো এসে বসল তার পাশে। 'কি খবর, দোস্ত? কি করছ?'

'কিছু না,' রাস্তার দিকে তাকিয়ে জবাব দিল বিলি।

'কিছু তো একটা করছই।'

জবাব দিল না বিলি। চৌরাস্তার দিকে তাকিয়ে একটা মাইন্ড-পালস ছাড়ল। মনের জোরে ঘটনা ঘটানোর ব্যাপারটার নাম দিয়েছে সে মাইন্ড-পালস। এরই সাহায্যে ট্র্যাফিক লাইটের লাল আলোকে সবুজ করে দেয় সে, সবুজ আলোকে লাল। দুদিক থেকে যে দুটো গাড়ি আসছে তার একটা জীপ, আরেকটা মিনিভ্যান। সবুজ আলো দেখে গতি কমাল না কেউ। একেবারে কাছাকাছি হওয়ার আগে কেউই বুঝতে পারল না যে অন্যজন গতি কমাবে না। সবুজ আলো দেখেছে দুজনেই, কমাবে কেন? একেবারে শেষ মুহূর্তে ব্রেক চেপে থেমে দাঁড়াল গাড়ি দুটো। বোঝা গেল কাজের জিনিস অ্যান্টিলক ব্রেক।

'বাইরে কোথাও যেতে ইচ্ছে করছে,' পটেটো বলল। 'এটা শহর না ইঁদুরের গর্ত! বেরোনো উচিত আমাদের। আর ভাল্লাগছে না এখানে। চলো, লাস ভেগাসে চলে যাই। ধ্বংস করার...' হেসে ফেলল পটেটো। তাড়াতাড়ি শুধরে নিয়ে বলল, 'মানে, আমি বলতে চাইছি, খেলার অনেক নতুন জিনিস পেয়ে যাবে ওখানে।'

মাথা নাড়ল বিলি। 'লাস ভেগাসে যাচ্ছি না আমি। কোথাও যাব না...মিলিকে ফেলে।'

মিলির নাম উচ্চারণ করতেও ভাল লাগে তার। মনটা আনন্দে ভরে যায়।

'মিলি, মিলি' বলে বার বার চিৎকার করতে ইচ্ছে হয়।

বিলির দিকে তাকাল পটেটো। চোখ ঘুরিয়ে বলল, 'কি করে ভাবলে বললেই ও তোমার সঙ্গে চলে যাবে? স্কুলে ও তোমার দিকে তাকায় না। কথা বলে না।'

কথাটা ঠিক। এ নিয়ে অনেক ভেবেছে বিলি। হতে পারে, স্কুলে অন্য কারও সামনে তার দিকে তাকাতে লজ্জা পায় মিলি। কত ধরনের লাজুক মেয়ে থাকে না। মিলিও হয়তো তেমনি। তার মানে এই নয় মিলি ওকে ভালবাসে না। অন্য কেউ সামনে না থাকলে তো কথা বলে। বলবে না-ই বা কেন? বিলি খারাপটা কিসে? স্বাস্থ্য ভাল না। ও অনেকেরই থাকে না। গরীব। সে তো পৃথিবীর বেশির ভাগ লোকই। কিন্তু তার মত অসাধারণ ক্ষমতা আর কার আছে? এই ক্ষমতা ঠিকমত ব্যবহার করতে পারলে কোটিপতি হতে বেশিদিন লাগবে না।

'স্কুলের কথা বাদ দাও,' বিলি বলল। 'ওকে বোঝানো দরকার যে আমি ওকে ভালবাসি।'

'কি করে?'

চৌরাস্তার দিকে তাকিয়ে ভাবতে শুরু করল বিলি। কি করে মন জয় করা যায় মিলির? কি করে বোঝানো যায় সে একজন যোগ্য লোক? গাড়ির দিকে মন নেই আর তার। ট্র্যাফিক লাইটের দিকে তাকাচ্ছে না। বিড়বিড় করছে, 'ওকে বোঝাতে হবে ওকে আমি কতটা ভালবাসি। ওর কথা ছাড়া আর কিচ্ছু ভাবি না আমি।'

পটেটো প্রশ্নটা করায় খুশিই হলো বিলি। কি করে মিলিকে তার প্রতি আকৃষ্ট করা যায়, এই ভাবনাটা জোরাল হলো তার মনে।

পটেটোর প্রথম প্রশ্নটার জবাব এখনও দিতে পারেনি বিলি, আরেকটা প্রশ্ন তার পাতে তুলে দিল পটেটো, 'জনাব মজনু সাহেব, আরও একটা কথা—মিলি তোমার বসের মেয়ে। সেকথাটা ভুলে যেয়ো না।'

পা তুলে হাঁটু ভাঁজ করে বসল বিলি। দুই হাত দিয়ে বুকের ওপর চেপে ধরল দুই পা। 'সেটা কোন সমস্যাই না।'

'কেন, সমস্যা নয় কেন?'

'ওটার ব্যবস্থা আমি করে ফেলতে পারব,' কাঁধ ঝাঁকাল বিলি। 'দিলাম নাহয় ওর মনটাও ধ্বংস করে।'

বিলির কথা ঠিক বুঝতে পারল না পটেটো। 'ওর মন? ও তোমার বস্, বিলি...'

'মরে গেলেই ও আর আমার বস্ থাকবে না,' খারাপ কথাটা এরকম করে বলতে চাইল না বিলি। কিন্তু পটোটোকে নিয়ে সমস্যা হলো ভেঙে না বললে ও কিছু বুঝতে পারে না। 'মন থাকে হৃৎপিণ্ডে। ওটা কাবাব বানিয়ে দেব। যাবে নষ্ট হয়ে।' নিজের রসিকতায় মজা পেয়ে নিজেই হেসে উঠল।

আঁতকে উঠল পটেটো। 'পাগল নাকি! খবরদার, ওই টিকটিকিগুলোর কথা ভুলো না। ওদের ছোট করে দেখলে ভুল করবে। বিশেষ করে

কোঁকড়াচুলোটাকে। ওর চোখ দেখেছ? চোখের দিকে তাকালেই ভয় লাগে। মনের ভেতর কি আছে সব যেন দেখতে পায়। মিস্টার হাওয়ার্ডের ক্ষতি করতে যাওয়া তোমার ঠিক হবে না, বিলি। আরেকটা কথা ভেবেছ? ওর মেয়ে যদি বুঝে ফেলে তুমি ওর বাপকে খুন করেছ, কোনদিন আর ভালবাসবে? চরম ঘৃণা করবে তখন। বরং, অন্য কোনভাবে মিলির মন জয় করার চেষ্টা চালাও।'

ঠিক কথাই বলেছে পটেটো। কিন্তু কোন কিছু নিয়ে বেশি ভাবনা-চিন্তা করতে ভাল লাগে না বিলির। ঝট করে সিদ্ধান্ত নিয়ে কাজ শেষ করে ফেলাই ওর পছন্দ। দেরি সহ্য হয় না। তবু এক্ষেত্রে চিন্তা এবং সহ্য করা ছাড়া উপায় নেই।

'মিলি সুন্দরী,' পটেটো বলল, 'তা ছাড়া ধনীর একমাত্র কন্যা। ওর মত মেয়ে কোন গুণধর লোককেই বিয়ে করতে চাইবে।'

পটেটোর চোখের দিকে তাকাল বিলি, 'আমার গুণ আছে।'

চোখ সরিয়ে নিল পটেটো, 'হ্যাঁ, তা আছে।'

দূরে পাহাড়ী রাস্তা বেয়ে একটা বড় ট্রাককে নেমে আসতে দেখা গেল। অন্যদিকে হিলটাউন পাস ধরে ছুটে আসছে একটা সাদা ফোর্ড গাড়ি।

'বেশ,' বিলি বলল, 'কতটা গুণ আর যোগ্যতা আমার আছে, মিলিকে দেখাব আমি।'

মুখ ফেরাল পটেটো। দীর্ঘ একটা মুহূর্ত তাকিয়ে রইল বিলির দিকে। 'কি করে দেখাবে?' গলা কাঁপছে ওর।

হাসল বিলি। 'আমার ক্ষমতা সম্পর্কে এখনও তোমার পুরোপুরি ধারণা নেই, পটেটো। অনেক কিছু করতে পারি আমি।' রাস্তার গাড়িগুলোর দিকে চোখ ফেরাল সে। খেলাটা এখন আর খেলা নেই ওর কাছে, জরুরী কাজ হয়ে উঠেছে। ওর পরিকল্পনার একটা অংশ। একটা সাংঘাতিক পরীক্ষা। ভাবতে গিয়ে হাসি ছড়িয়ে পড়ল মুখে। এ পরীক্ষায় জয়ী হতে পারলে A+ দেয়া উচিত তাকে, ভাবল সে।

মিলিও তখন বুঝে যাবে ওর ক্ষমতা। ওর যোগ্যতার প্রমাণ পাবে। ওর প্রতি দুর্বল হয়ে পড়বে।

কাছাকাছি চলে এসেছে দুটো গাড়ি। ট্র্যাফিক লাইটের দিকে মন ফেরাল বিলি। মগজের কোন এক রন্ধ্রে যেন নাড়ীর স্পন্দনের মত টিকটিক করে বাজতে শুরু করল একটা বিশেষ শক্তি। স্পষ্ট টের পাচ্ছে সে। অনুভব করতে পারছে। মাইন্ড-পালসকে কাজে লাগিয়ে ইচ্ছাশক্তির জোরে বিদ্যুৎ-সঙ্কেত পাঠিয়ে দুদিকের লাল আলোকে সবুজ করে দিল। গুনতে শুরু করল: এক···দুই···তিন···

ধ্রাম!

প্রচণ্ড শব্দ। সাদা গাড়িটার পেটে গুঁতো মেরেছে ট্রাক। ডিগবাজি খেয়ে ঘুরতে ঘুরতে পথের পাশের খাদে গিয়ে পড়ল গাড়িটা। ট্রাকের ড্রাইভারও নিয়ন্ত্রণ হারিয়েছে। এলোপাতাড়ি ছুটছে। ঝাঁকি লেগে রাস্তায় ছড়িয়ে পড়তে

লাগল ওতে বোঝাই বাঁধাকপি। একটা টেলিফোন পোস্টে গুঁতো খেয়ে অবশেষে থামল ওটা।

হেসে উঠল বিলি। 'আহ্, কি খেলটাই না দেখাল!' পায়ের ওপর থেকে হাত সরিয়ে নিল সে। উঠে দাঁড়াল। 'সত্যি দারুণ! এমনটা সচরাচর দেখা যায় না!'

জোর করে হাসল পটেটো। না হাসলে যদি আবার বিলি রেগে যায়। কিন্তু খুশি মনে হলো না ওকে।

ওর বাহুতে থাবা মারল বিলি, 'কি ব্যাপার, খুশি না নাকি? দেখো, দেখে যাও। এমন খেলা পয়সা দিয়েও পাবে না।'

জবাব দিল না পটেটো।

'চলো,' পটেটোর হাত ধরে টান দিল বিলি। 'কাছে গিয়ে দেখি।'

নয়

বিলিদের আগাছাভরা পুরানো চত্বরে বড়ই বেমানান লাগছে তিন গোয়েন্দার ভাড়া করে আনা চকচকে নতুন গাড়িটা।

টোকা দিতে দরজা খুলে দিলেন বিলির মা। ঘরে নিয়ে গেলেন তিন গোয়েন্দাকে। ওদের অনুরোধে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখাতে লাগলেন বাড়ির ভেতরটা। হলের শেষপ্রান্তের একটা পুরানো দরজা ধরে টান দিলেন। ক্যাঁচকোঁচ করে প্রতিবাদ জানাল মরচে পড়া কব্জা। বিলির ঘরের বদ্ধ বাতাসের ভাপসা গন্ধ গোয়েন্দাদের নাকে এসে ধাক্কা মারল যেন।

'আমার ছেলের স্বভাব ভাল না,' মা বললেন, 'আমি নিজেই স্বীকার করছি সেটা। যে কারণে অনেকেই ওকে দেখতে পারে না। কিন্তু কারও ক্ষতি করার···একটা পিঁপড়ে মারারও ক্ষমতা নেই ওর।···কি করেছে ও?'

দুই সহকারীর দিকে তাকাল কিশোর। ইঙ্গিতে চেপে যেতে বলল ওদের। বিলির মায়ের দিকে ফিরে বলল, 'এঘরে কয়েকটা মিনিট আমরা একা থাকতে চাই, মিসেস ফক্স। কোন অসুবিধে আছে?'

ঘর থেকে পিছিয়ে বেরিয়ে গেলেন বিলির মা। আস্তে করে দরজাটা লাগিয়ে দিল কিশোর। যত আস্তেই লাগাক, কব্জার প্রতিবাদ বন্ধ করতে পারল না।

বাড়ির বাকি ঘরগুলোও শোচনীয়, তবে এটার অবস্থা সবচেয়ে খারাপ। নরক বানিয়ে রেখেছে বিলি। দিনের বেলাতেও অন্ধকার। জানালার সমস্ত পর্দা টেনে দেয়া। বাতাস চলাচল করতে পারে না বলে স্যাঁতসেঁতে হয়ে আছে। ভাপসা গন্ধের মধ্যে শ্বাস নেয়া কঠিন। বিছানাটা অগোছাল। মেঝেতে ছিটানো বহুকালের অধোয়া ময়লা কাপড়-চোপড়। যেখানে সেখানে ফেলে রেখেছে মোটর গাড়ির বাতিল যন্ত্রাংশ। ছাত আর দেয়ালের হেন জায়গা নেই, যেখানে গাড়ির ছবি আর ভিডিও গেমের পোস্টার লাগায়নি। বড় একটা ফিশ

অ্যাকোয়ারিয়ামও দেখা গেল। তবে ওটা বিলির কিনা বোঝা গেল না। বহু আগেই শুকিয়ে গেছে। শ্যাওলা শুকিয়ে কালো হয়ে গিয়ে লেগে রয়েছে নোংরা কাঁচের দেয়াল আর তলার পাথরে। মাছের চিহ্নও নেই।

পোস্টারগুলোর ওপরে আবার বিভিন্ন ম্যাগাজিন থেকে ছবি কেটে নিয়ে লাগিয়েছে বিলি। বিখ্যাত সব খেলোয়াড়, গায়ক, মডেল আর অভিনেতার ছবি, যাদের সঙ্গে কোনকালে দেখা হয়নি ওর। ওগুলোর পাশে সাঁটানো ছোট একটা সাদাকালো ছবি দৃষ্টি আকর্ষণ করল কিশোরের। একটা মেয়ে! মডেলগুলোর চেয়ে কম সুন্দরী নয়। বয়েস খুবই কম। কিশোরীই বলা চলে। নিষ্পাপ চাহনি।

বিলির আলমারি খুঁজতে লাগল মুসা আর রবিন।

আজেবাজে জিনিসের মধ্যে ঘাঁটতে ঘাঁটতে একটা ছেঁড়া জুতো পেয়ে গেল মুসা। বের করে দেখাল। 'কিশোর, দেখো, সাইজটা বোধহয় ঠিকই আছে।'

'সাড়ে আট?'

মাথা ঝাঁকাল মুসা।

'শুধু এতেই প্রমাণ হয় না লেসলি কার্টারিসকে খুন করেছে সে,' রবিন বলল।

জবাব না দিয়ে আবার ছবিটার দিকে ফিরল কিশোর।

'পেলে কিছু ওর মধ্যে?' ছবিটা দেখিয়ে জানতে চাইল রবিন।

'বুঝতে পারছি না,' নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটল কিশোর। 'তবে মনে হচ্ছে কোন বৈশিষ্ট্য আছে।'

কিশোরের পাশে এসে দাঁড়াল রবিন।

আরও জুতো পাওয়া যায় কিনা খুঁজছে মুসা।

ছবিটার দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করল রবিন, 'মেয়েটা কে?'

'জানি না,' চিন্তিত ভঙ্গিতে কিশোরও তাকিয়ে আছে ওটার দিকে। 'মনে হচ্ছে কোন বর্ষপঞ্জি থেকে কেটে নেয়া।'

ঘুরে দাঁড়াল মুসা। আলমারি থেকে একটা বর্ষপঞ্জি বের করে দেখিয়ে বলল, 'এটা থেকে নেয়নি তো?'

কোন পাতা থেকে ছবিটা কাটা হয়েছে, বের করতে সময় লাগল না। যে পাতায় ছবিটা ছিল, সেখানে চারকোনা কাটা। নিচে একটা নাম।

'মিলি হাওয়ার্ড,' পড়ল রবিন।

হাওয়ার্ড! চোখের পাতা সরু করে ফেলল কিশোর। পরিচিত লাগছে না!

★

টো ট্রাকে বসে কফি খাচ্ছেন জোসেফ হাওয়ার্ড, এই সময় ফোন এল। দুই ঢোকে বাকি কফিটুকু শেষ করে কাগজের কাপটা ছুঁড়ে ফেললেন বাইরে। এঞ্জিন চালু করে গিয়ার দিয়ে তাড়াতাড়ি গাড়ি ঘোরালেন। ছুটলেন হিলটাউন পাসে।

গত দুই মাসে কতবার যে তিনি এখানে এসেছেন, হিসেব নেই আর।

চৌরাস্তায় অতিরিক্ত অ্যাক্সিডেন্ট হচ্ছে ইদানীং। বহুবার আসতে হয়েছে তাঁকে এখানে, দোমড়ানো গাড়ি সরিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্যে। ব্যাপারটা খুব রহস্যময় মনে হচ্ছে তাঁর কাছে। বিশেষজ্ঞ ডেকে এনে চৌরাস্তার ট্র্যাফিক লাইটগুলো পরীক্ষা করে জানা দরকার, সমস্যাটা কোথায়? কাউন্টি প্ল্যানিং কমিশনে চিঠি লেখার কথাও ভেবেছেন তিনি।

তবে আজ আর ওসব কথা ভাবছেন না। আনমনে গাড়ি চালাতে চালাতে বরং ভাবছেন ছেলেটার কথা। বিলি ফক্স। গতকাল লাঞ্চের সময় গ্যারেজে গিয়েছিল মিলি। ওকে নার্ভাস মনে হয়েছে। আচরণে অস্থিরতা ছিল। কয়েকবার ওকে জিজ্ঞেস করার পর শুধু বিলির নামটা বলেছে। আর কিছু বলেনি।

কয়েক মাস আগে মিলির চাপাচাপিতে ছেলেটাকে কাজে নিয়েছিলেন তিনি। ধীরে ধীরে একটা মায়া জন্মে গেছে ওর ওপর। পিতৃস্নেহই বলা যায়। ছেলেটার ভাঙা স্বাস্থ্য, বিষণ্নতা, অমিশুক আচরণ এবং কাজের দক্ষতা ও বিশ্বস্ততা এ সব কিছু তার প্রতি মমতা বাড়িয়ে দিয়েছে তাঁর।

কিন্তু যত মমতাই জন্মাক, বিলি যদি তাঁর একমাত্র মেয়ের অশান্তির কারণ হয়ে থাকে, ওকে বিদেয় করা ছাড়া উপায় থাকবে না। কিন্তু কি বলে ওকে বিদেয় করবেন? কাজের ব্যাপারে কোন খুঁত পাওয়া যায়নি তার। কোন ছুতো দেখিয়ে বরখাস্ত করা যাবে না। মিথ্যে বলতে পারবেন না তিনি। ছেলেটাকে তিনি পছন্দ করেন, মুখের ওপর 'এসো না'-ও বলে দিতে পারবেন না। তাহলে? আজ বিলির ছুটি। সময় আছে। পরে শান্ত মাথায় ভেবেচিন্তে একটা উপায় বের করা যাবে।

অ্যামবুলেন্সের পেছন পেছন চৌরাস্তায় পৌঁছলেন হাওয়ার্ড। গাড়ি থামিয়ে কাজ শুরু করার আগে চারপাশে একবার চোখ বোলালেন। গর্তে পড়ে আছে নতুন মডেলের একটা ফোর্ড। একটা পুরানো ট্রাক টেলিফোন পোস্টে নাক ঠেকিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। পেছনটা এমন করে রাস্তা জুড়ে রয়েছে, পুবদিকে যাওয়ার পথ বন্ধ করে দিয়েছে। গাড়ি জমে গেছে। এই শূন্যতার মাঝেও কি করে যেন ভিড় জমে গেছে কৌতূহলী দর্শকের।

পার্কিং ব্রেক টেনে দিয়ে গাড়ি থেকে নামলেন হাওয়ার্ড। ট্রাকের পেছনের সরু ফাঁক দিয়ে একবারে একটামাত্র গাড়ি বেরোতে পারে। শেরিফের অফিসের একজন ডেপুটি ওখানে দাঁড়িয়ে গাড়িগুলোকে বের করে দেয়ার চেষ্টা চালাচ্ছে।

সেদিকে এগিয়ে গেলেন হাওয়ার্ড। 'কি হয়েছে?'

'কি আর হবে,' বিরক্তকণ্ঠে চেঁচিয়ে জবাব দিল ডেপুটি, 'পোলাপানের কাণ্ড! বাপের নতুন গাড়ি পেয়েছে। নতুন লাইসেন্স পেয়েছে। চালানো শুরু করেছে বেপরোয়া। ফলে যা ঘটার ঘটেছে। গাড়ির একেবারে পেট বরাবর মেরে দিয়েছে ট্রাক।'

'ছেলেটার কি অবস্থা?'

'বাঁচবে বলে মনে হয় না।'

'আহ্হা!'

বিলির ওপর নতুন করে মায়াটা বেড়ে গেল হাওয়ার্ডের। ওকে তাগানোর চিন্তাটা মাথা থেকে আপাতত বাদ দিলেন। কিছু করার আগে ব্যাপারটা নিয়ে মিলির সঙ্গে ভালমত আলোচনা করতে হবে। বিলির কতখানি দোষ, বিবেচনা করা দরকার। এমনও হতে পারে···

বুকের বাঁ পাশে তীক্ষ্ণ একটা ব্যথা ভেঙে তছনছ করে দিল সমস্ত চিন্তা-ভাবনা। মুখ বিকৃত করে ফেললেন। দম নিতে কষ্ট হচ্ছে। ব্যথা সহ্য করে কোনমতে ফুসফুসে বাতাস টেনে নিয়ে ধীরে ধীরে ছাড়লেন।

কি হলো? বুঝতে পারছেন না তিনি। এমন লাগছে কেন? আরেকবার দম নিলেন। বাঁ কাঁধটা অবশ হয়ে যাচ্ছে। এটাকেই কি বলে হার্টবার্ন? হার্ট অ্যাটাক হচ্ছে? মিলির আশঙ্কাই ঠিক। অনেক দিন থেকে তাঁকে চর্বিওয়ালা জিনিস খেতে বারণ করে আসছে। শোনেননি। চর্বিই তাঁর বেশি পছন্দ।

খসখসে গলায় ডেপুটিকে জিজ্ঞেস করলেন, 'ট্রাকটা সরাব?'

লাইন দিয়ে দাঁড়িয়ে যাওয়া গাড়িগুলোকে সরাতে ব্যস্ত ডেপুটি হাওয়ার্ডের দিকে না তাকিয়েই বলল, 'শেরিফকে জিজ্ঞেস করুন।'

ট্রাকের কাছে দাঁড়িয়ে আছেন শেরিফ। ড্রাইভারের স্টেটমেন্ট নিচ্ছেন।

হাওয়ার্ডের বুকের ব্যথাটা কমছে না। বরং বাড়ছে। বুক ডলতে ডলতে ঘন ঘন শ্বাস নিচ্ছেন। শ্বাস নিতেও কষ্ট। একবারে বাতাস টেনে ফুসফুস ভরে না ফেলে অল্প অল্প করে টানছেন।

ফিরে তাকাতে তাঁর ওপর চোখ পড়ল ডেপুটির। 'কি হয়েছে, মিস্টার হাওয়ার্ড? এমন লাগছে কেন আপনাকে? অসুস্থ নাকি?'

সমস্যাটা বলতে যাচ্ছিলেন হাওয়ার্ড, এই সময় ভিড়ের কিনারে একটা পরিচিত মুখ চোখে পড়ল।

বিলি ফক্স! ওকে এখানে দেখবেন ভাবেননি···

একটা অদ্ভুত অনুভূতি হলো তাঁর। মনে হলো বুকের মধ্যে ঢুকে গেছে বিলি। ব্যথাটাকে জ্বলুনি থেকে আস্তে আস্তে ঠেলে ভয়াবহ যন্ত্রণার দিকে নিয়ে যাচ্ছে। বুকের মধ্যে আগুন জ্বলতে আরম্ভ করল যেন তাঁর।

বিলি কি করে তাঁর ভেতরে ঢুকবে! এই উদ্ভট ভাবনা কেন?

অনুভূতিটা কিছুতেই যাচ্ছে না মন থেকে। হৃৎপিণ্ড খামচি দিয়ে ধরে তাঁকে খুন করছে ছেলেটা।

ডেপুটির দিকে ফিরে কথা বলার জন্যে মুখ খুললেন। যন্ত্রণাকাতর একটা গোঙানি বেরোল শুধু। ব্যথার আরেকটা বর্শা এসে ঘ্যাচ করে বিঁধল যেন হৃৎপিণ্ডে। চোখের সামনে মহাসড়কটা আবছা হয়ে এল।

হাওয়ার্ডের দেহটা বাঁকা হয়ে যেতে দেখল ডেপুটি। গাড়ি সরানো বাদ দিয়ে দৌড়ে এসে ধরে ফেলল তাঁকে।

★

ভিড়ের কিনারে দাঁড়িয়ে আরও অনেকের সঙ্গে স্বরচিত বাস্তব নাটকটা দেখছে বিলি।

'কি হলো, বিলি?' শঙ্কিত কণ্ঠে জানতে চাইল পটেটো।
কানেই তুলল না বিলি। জবাব দিল না।
হাওয়ার্ডের হৃৎপিণ্ডটা তাঁর বুকের খাঁচায় বেঁচে থাকার জন্যে আকুলি-বিকুলি করছে। রাস্তার ওপর শুইয়ে দেয়া হয়েছে তাঁকে। চিৎকার করে ডাক্তারদের ডাকছে ডেপুটি।
হাওয়ার্ডকে মাটিতে দেখে দৌড়ে এলেন একজন ডাক্তার।
আপনমনে হাসল বিলি। কিছুই করতে পারবে না ওরা, ভাবল সে। বোকার দল। চেষ্টাই হবে সার। কাজের কাজ কিছু হবে না।
'কি হয়েছে?' চিৎকার করে জানতে চাইলেন ডাক্তার।
হাওয়ার্ডের পাশ থেকে উঠে গিয়ে ডাক্তারকে জায়গা করে দিল ডেপুটি। 'বুঝলাম না! বেহুঁশ হয়ে গেলেন হঠাৎ!'
ভাল করে দেখার জন্যে পাশে সরল বিলি।
পটেটোও সরে এল তাঁর সঙ্গে সঙ্গে।
হাওয়ার্ডের গলার কাছে আঙুল চেপে ধরে নাড়ী দেখছেন ডাক্তার।
আনমনে মাথা নাড়ছে বিলি। যেন ক্রিকেট খেলায় নিজের দলকে হারতে দেখে হতাশ হয়েছে খুব।
'নাড়ী তো নেই!' এক সহকারীর দিকে তাকিয়ে চিৎকার করে উঠলেন ডাক্তার। 'জলদি ব্যাগটা নিয়ে এসো!'
অ্যামবুলেন্সের দিকে দৌড় দিল সহকারী।
লম্বা দম নিয়ে পা বাড়াল বিলি।
তার হাত খামচে ধরল পটেটো।
ঝাড়া মেরে সরিয়ে দিল বিলি।
'কি করছ?' ফিসফিস করে বলল আতঙ্কিত পটেটো। 'চলো, পালাই!'
ঠাণ্ডা, চিকন ঘাম ফুটেছে তার কপালে।
কিন্তু ফিরেও তাকাল না বিলি। এগিয়ে চলল দৃঢ়পায়ে।
শার্টের বুকের কাছটা খুলে ফেলেছেন ডাক্তার। স্টেথো লাগিয়ে দেখতে শুরু করলেন। তাঁর মুখের ভঙ্গিই বলে দিচ্ছে হাওয়ার্ডের অবস্থা।
খুব খারাপ!
মুমূর্ষু বসের দিকে এগিয়ে চলেছে বিলি। কেউ লক্ষ করল না তার উপস্থিতি। কিংবা করলেও গুরুত্ব দিল না। সবাই উত্তেজিত। নানা কারণে। কার্ডিয়াক কিট নিয়ে দৌড়ে এল ডাক্তারের সহকারীরা। প্রথমজনের সঙ্গে আরও একজন এসেছে। ডাক্তার তখন হাওয়ার্ডের বুকে ম্যাসেজ করছেন। জাগিয়ে তুলতে চাইছেন নিথর হয়ে পড়া হৃৎপিণ্ডটাকে।
দ্রুতহাতে হাওয়ার্ডের শরীরে ইলেকট্রোডের তার লাগানো শুরু করল ডাক্তারের সহকারীরা। একঘেয়ে শব্দ কানে আসছে বিলির। মনিটরে দেখতে পাচ্ছে হার্টের গতিবিধির সবুজ রেখাটা। আঁকাবাঁকা ঢেউ তোলার বদলে স্থির হয়ে আছে।
পাম্প শুরু করলেন ডাক্তার। হৃৎপিণ্ডটাকে সতেজ করার আপ্রাণ চেষ্টা

করতে লাগলেন।

মেশিনের সঙ্গে যুক্ত তারগুলোর দিকে তাকিয়ে আছে বিলি। সিনেমায় কারও হার্ট অ্যাটাক হলে হাসপাতালে নিয়ে গিয়ে এভাবে তার লাগায়, দেখেছে সে।

কিছুতেই কিছু করতে না পেরে সহকারীর দিকে তাকালেন ডাক্তার, 'তিনশো জুল দাও।'

'দিয়েছি। চার্জ হয়ে আছে,' জবাব দিল এক সহকারী।

'কই, হয়নি তো।'

'কিন্তু আমি তো দিয়েছি...'

হাঁ করে যন্ত্রের দিকে তাকিয়ে আছেন ডাক্তার এবং তাঁর দুই সহকারী। মাটিতে পড়ে থাকা মানুষটার মতই যন্ত্রও নিথর। মৃত।

মনে মনে হাসল বিলি। যন্ত্রের ব্যাটারি শুষে নেয়া কিছুই না তার জন্যে। ট্র্যাফিক লাইট বদলে দেয়ার চেয়ে অনেক সহজ।

'ঘটনাটা কি? কাজ করছে না কেন?' অবাক হয়ে গেছেন ডাক্তার। 'যাও তো, আরেকটা নিয়ে এসো।'

উঠে আবার অ্যামবুলেন্সের দিকে দৌড় দিল এক সহকারী। অন্যজন ডাক্তারের সঙ্গে বসে মেশিনটা চালানোর চেষ্টা করেই চলেছে।

পায়ে পায়ে কাছে এসে দাঁড়াল বিলি।

নড়ে উঠল হাওয়ার্ডের চোখ। তার কথা তিনি শুনতে পাবেন কিনা, বুঝবেন কিনা জানে না বিলি। বোঝার চেষ্টাও করল না। তার কাজ এখন সে করে যাবে। বিড়বিড় করে শান্ত, মোলায়েম কণ্ঠে বলল, 'চিন্তা করবেন না, মিস্টার হাওয়ার্ড। টিভিতে কি করে ভাল করে ওরা আমি দেখেছি।'

ডান হাতের আঙুলগুলো ছড়িয়ে সামনে বাড়িয়ে ধরল দুই হাত। হাওয়ার্ডের বুকের দিকে তাক করল।

'জীবন আর মৃত্যুর সন্ধিক্ষণ এক অদ্ভুত জিনিস, ভাবল বিলি। 'একে নিয়ন্ত্রণ করা কি সাংঘাতিক উত্তেজনার কাজ!'

মনের মধ্যে বিদ্যুৎ-স্ফুলিঙ্গ ছোটাতে শুরু করল সে। ঘুরতে ঘুরতে মগজে জমা হচ্ছে। অনুভব করতে পারছে। তীরে আছড়ে পড়ার জন্যে ছুটে চলা ঢেউয়ের মত শক্তি সঞ্চয় করছে স্ফুলিঙ্গগুলো। মগজ থেকে বের করে আনল সে। ঘাড়ে নামাল। সেখান থেকে পার করে দিতে লাগল ডান হাতে। বাহু আর আঙুল বেয়ে পৌঁছে গেল আঙুলের ডগায়। ইথারে ভর করে অদৃশ্য বিদ্যুৎ-শক্তি ঢুকে যেতে শুরু করল হাওয়ার্ডের বুকে।

চার্জ হয়ে যাচ্ছে নিথর হৃৎপিণ্ড। আচমকা ঝটকা দিয়ে ধনুকের মত পেছনে বাঁকা হয়ে গেল হাওয়ার্ডের শরীর। মাটির ওপর থেকে ফুটখানেক ওপরে উঠে গেল পিঠ। ধড়াস করে পড়ল আবার।

ততক্ষণে দ্বিতীয় মেশিনটা নিয়ে এসেছে ডাক্তারের সহকারী। কিন্তু ওটার আর প্রয়োজন নেই। চালু হয়ে গেছে হৃৎপিণ্ড।

মনিটরও সচল হয়ে গেছে আবার। কোন্ জাদুবলে আবার চার্জ হয়ে

গেছে ওটার ব্যাটারি। সবুজ রেখাটা ঢেউ তুলতে শুরু করেছে। কানে স্টেথো লাগানোই আছে ডাক্তারের। নিখুঁত, স্পষ্ট হার্টবীট কানে বাজছে তাঁর। সুস্থ, সবল মানুষের হৃৎপিণ্ডের মত। খানিক আগে যে মারাত্মক অ্যাটাক হয়েছিল, তার কোন লক্ষণই নেই।

অবিশ্বাসীব দৃষ্টিতে হাওয়ার্ডের দিকে তাকিয়ে আছেন ডাক্তার আর তাঁর দুই সহকারী।

'হার্ট তো চলছে! চালু হলো কি করে?'

বুঝতে পারছেন না ডাক্তার। এতক্ষণে চোখ পড়ল বিলির ওপর। খানিক দূরে দাঁড়িয়ে আছে সে। চোখাচোখি হতেই হাসি ছড়িয়ে পড়ল মুখে। সিনেমার অভিনেতাদের কায়দায় কাঁধ ঝাঁকাল। কোন ব্যাখ্যা দেয়া থেকে বিরত রইল।

হিরো হয়ে গেল সে। এমন হিরো, যাকে সবাই ভালবাসে।

ওকে নিয়ে এখন গর্ব বোধ করবে মিলি। আপন করে পাওয়ার জন্যে অস্থির হবে।

বিলির অন্তত তা-ই মনে হলো।

দশ

হিলটাউন কমিউনিটি হাসপাতালের নার্স স্টেশনে দাঁড়িয়ে আছে কিশোর। জোসেফ হাওয়ার্ডের সঙ্গে দেখা করার ইচ্ছে। কিন্তু ইমার্জেন্সি বিভাগের এক কেবিনে সেই যে তাঁকে নিয়ে গিয়ে দরজা আটকে দিয়েছেন ডাক্তাররা, আর খোলার নাম নেই। দেখা করার ব্যাপারে ক্রমেই নিরাশ হয়ে পড়ছে সে।

কিন্তু সময়টা অহেতুক নষ্ট হতে দিচ্ছে না। বিলি ফক্সের মেডিক্যাল ফাইলের পাতা ওল্টাচ্ছে। প্রথমবার এসেছিল বজ্রপাতের শিকার হয়ে। রাতের বেলা। দ্বিতীয়বার হার্ট অ্যাটাক হয়ে, মাস পাঁচেক আগে। ঘাড়, মাথা আর পিঠে প্রচণ্ড ব্যথা হচ্ছিল। কয়েকদিন রাখার পর ডাক্তাররা লক্ষ করলেন প্রি-এগজিস্টিং কনডিশনে রয়েছে সে। ডাক্তারি পরিভাষায় এসে বলে অ্যাকিউট হাইপোকেলামিয়া।

একটা ধারণা রূপ নিতে শুরু করল কিশোরের মনে। মুসার দিকে তাকাল। জানালায় দাঁড়িয়ে বাইরে তাকিয়ে আছে সে। রবিনকে পাঠিয়েছে ডক্টর এলিজাকে ফোন করতে। এলিজাকে পেলে তাকে দিয়ে কমিউনিটি হাসপাতালের ডাক্তারদের ফোন করিয়ে জেনে নেবে হাওয়ার্ডের অবস্থা।

পেছনে একটা শব্দ হলো।

ফিরে তাকাল কিশোর।

হলওয়ের ওয়াটার কুলারটার কাছে দাঁড়িয়ে আছে মিলি হাওয়ার্ড। হাত থেকে পড়ে যাওয়া পেপার কাপটার দিকে চোখ। মেঝেতে পানি।

মোছার জন্যে নিচু হতে গেল সে।

'দাঁড়াও,' পা বাড়াল কিশোর, 'আমি মুছে দিচ্ছি।'

তাড়াতাড়ি পড়ে যাওয়া কাপটা তুলে ওয়েস্টবাস্কেটে ফেলল। একটা পেপার টাওয়েল দিয়ে মেঝের পানি মুছে আরেকটা কাপে পানি ভরে বাড়িয়ে দিল মেয়েটার দিকে।

'থ্যাংক ইউ,' কাঁপা কাঁপা গলায় বলল মিলি।

তাকিয়ে আছে কিশোর। হাওয়ার্ডের মেয়ে। একে ধরেই তাঁর কাছে যেতে হবে এখন।

মেয়েটা ভীত এবং ক্লান্ত।

কেন?

বাবার জন্যে দুশ্চিন্তায়?

'মিলি,' সহানুভূতির সুরে বলল কিশোর, 'তোমার বাবার জন্যে আমি দুঃখিত।'

'থ্যাংক ইউ,' আবার বলল মিলি। ভাল করে তাকাল কিশোরের দিকে। চোখে জিজ্ঞাসা।

ওকে অনিশ্চয়তার মধ্যে রাখল না কিশোর। জানাল, 'আমার নাম কিশোর পাশা। সখের গোয়েন্দা।' হাত নেড়ে মুসাকে ডাকল। পরিচয় করিয়ে দিল, 'ও আমার বন্ধু ও সহকারী, মুসা আমান। এখানকার লোক নই আমরা। রকি বীচ থেকে এসেছি।'

মাথা ঝাঁকিয়ে বলল মিলি, 'চিনতে পেরেছি। কাল আমাদের গ্যারেজে গিয়েছিলে তোমরা।'

কিশোরও মাথা ঝাঁকাল। 'জানি, তোমার মন এখন খুব খারাপ। তবু কয়েকটা প্রশ্ন করতে চাই।'

মাথা নাড়ল মিলি। হাসি ফোটাল মুখে। 'না না, মন ঠিক হয়ে গেছে। কি জানতে চাও?'

'বিলি ফক্সের ব্যাপারে।'

মুহূর্তে মুখের ভাব বদলে গেল মিলির। বোঝা গেল, সে অনেকই কিছুই জানে।

'অ্যাক্সিডেন্টের জায়গায় ও গিয়েছিল, তাই না?' জিজ্ঞেস করল কিশোর।

ঝিক করে উঠল মিলির চোখ। এ দৃষ্টি কিশোরের চেনা। কোণঠাসা শিকারি জানোয়ারের চোখে দেখেছে। তারমানে মিলি জানে বিলি ফক্সই কিছু করেছে। কি করে জানল?

'হ্যাঁ, গিয়েছিল। আর কিছু জানার আছে?' অধৈর্য কণ্ঠে মিলি বলল, 'তাড়াতাড়ি করো, প্লীজ। আব্বাকে দেখতে যাব।'

কিশোরকে চুপ করে ভাবতে দেখে দরজার দিকে এগিয়ে গেল মিলি। কেবিনের দরজার কাছে গিয়ে ফিরে তাকাল একবার। তারপর ঢুকে দরজাটা লাগিয়ে দিল।

জানালা দিয়ে ওকে দেখতে পাচ্ছে কিশোর। বাবার বিছানার পাশে একটা চেয়ারে বসল। বেহুঁশ হয়ে আছেন হাওয়ার্ড। প্রায় ডজনখানেক

মেশিনের সঙ্গে তার আর নল দিয়ে যুক্ত করে দেয়া হয়েছে তাঁর শরীর।

'ওই যে, রবিন এসেছে,' পেছন থেকে বলে উঠল মুসা।

ফিরে তাকাল কিশোর।

কাছে এসে দাঁড়াল রবিন। 'ডাক্তারদের সঙ্গে কথা বলেছে এলিজা। তাজ্জব হয়ে গেছে ডাক্তাররা।'

'কেন?'

'এটা দেখলেই বুঝবে,' লম্বা, সরু একটা কাগজ কিশোরের হাতে তুলে দিল রবিন। 'জোসেফ হাওয়ার্ডের ইলেকট্রোকার্ডিওগ্রাম।'

কাগজটার দিকে তাকাল কিশোর। লম্বা, সোজা একটা রেখা। তারপর হঠাৎ করে বেঁকে গিয়ে ছোট-বড় ত্রিকোণ তৈরি করেছে। স্বাভাবিক হার্টবীটের সঙ্কেত। মাঝে মাঝে বর্শার মত চিহ্ন রয়েছে।

তাকিয়ে থাকতে থাকতে কিশোর জিজ্ঞেস করল, 'এটা দেখে কি বুঝব? ডাক্তারি বুঝি না আমি।'

রবিন বলল, 'একজন নার্স আমাকে বুঝিয়ে দিয়েছে। এই যে বর্শার মত জিনিস, এগুলো হার্ট চালু হওয়ার সময়কার। তখন কোন ধরনের বৈদ্যুতিক অনুপ্রবেশ ঘটেছিল হাওয়ার্ডের হৃৎপিণ্ডে।'

'তো?'

'ডাক্তার বলছেন ডিফাইব্রিলেটরে চার্জ ছিল না। প্যাডেলগুলো অচল ছিল।'

'খাইছে!' বলে উঠল মুসা, 'গ্রীক ভাষা বলছ নাকি?'

'না, ডাক্তারি শব্দ। আমিও বুঝি না। আমাকে যা বলা হলো. তাই উগরে দিলাম।'

'মোদ্দা কথাটা কি তাই বলো?' হাতের কাগজটা নাচিয়ে জিজ্ঞেস করল কিশোর।

'হার্ট এভাবে চালু হওয়ার কোন ব্যাখ্যা দিতে পারছেন না ডাক্তাররা। মরা হার্ট হঠাৎ চালু হয়ে গেল।'

মুসার দিকে তাকাল কিশোর।

অজ্ঞতার ভঙ্গি করে হাত ওল্টাল মুসা।

আবার রবিনের দিকে ফিরল কিশোর। 'এবার এসো, আমি তোমাকে একটা জিনিস দেখাই।' নার্স স্টেশনের ফাইল র‍্যাকের দিকে এগোল সে। বিলি ফক্সের ফাইলটা তুলে নিয়ে বাড়িয়ে দিল। 'নাও। দেখো। বিলি ফক্স ভর্তি হয়েছিল এ হাসপাতালে। ওর মেডিক্যাল চার্টটা দেখো···'

ফাইলটা হাতে নিয়ে দ্রুত পাতা উল্টে চলল রবিন। একটা পাতার পাশে লেখা নোটে আঙুল বোলাতে বোলাতে পড়ল। থেমে গেল একটা লাইনে এসে। মাথা নাড়তে নাড়তে বলল, 'এ তো অদ্ভুত কথা! ব্লাড টেস্ট অ্যাকিউট হাইপোকেলামিয়া শো করছে!'

মুচকি হাসল কিশোর। রবিনের চোখেও পড়ল তাহলে। পড়ে কিনা, এটাই দেখতে চেয়েছিল সে।

কিশোরের দিকে তাকাল রবিন। 'ইলেকট্রোলাইট ইমব্যালান্স, তাই না?'

'হ্যাঁ।'

'এবং ইলেকট্রোলাইট আমাদের শরীরে বৈদ্যুতিক স্পন্দন সৃষ্টি করে।'

'হ্যাঁ। হার্টের প্রতিটি বীটের সময়...' চুপ হয়ে গেল রবিন। দীর্ঘ একটা মুহূর্ত কিশোরের চোখের দিকে তাকিয়ে রইল। 'কি বলতে চাইছ তুমি?'

'এটা আমার ধারণা মাত্র, রবিন। নিশ্চিত হয়ে বলতে পারছি না...তবু, যদি ধরে নিই, বিলির শরীরের ইলেকট্রোলাইট ইমব্যালান্স ওকে প্রচণ্ড ক্ষমতার অধিকারী করে তুলেছে? অন্যান্য বিদ্যুৎ-উৎপাদনকারী প্রাণীর মত সে-ও তার নিজের দেহে বিদ্যুৎ উৎপাদন করতে পারে? অস্বাভাবিক হাই-ভোল্টেজ?'

হাঁ করে তাকিয়ে আছে মুসা। এতটাই অবাক হয়েছে, যেন ভূত দেখতে পাচ্ছে সামনে।

'কতটা হাই?' অবাক রবিনও হয়েছে।

ইলেকট্রোকার্ডিওগ্রামের কাগজটা নাচাল আবার কিশোর, 'যতটা হলে একজন মানুষের হৃৎপিণ্ড নিয়ে খেলা করতে পারে কেউ। কাবাব করতে পারে, আবার মরাটাকে জ্যান্ত করে তুলতে পারে।'

'ফ্যান্টাসি, কিশোর! রূপকথা মনে হচ্ছে!' মাথা নাড়তে নাড়তে রবিন বলল, 'মানুষের শরীর কখনও বিদ্যুৎ উৎপাদন করতে পারে না।'

'মানুষের শরীর এবং মন সম্পর্কে কখনোই শিওর হয়ে বলা যায় না কিছু। অনন্ত শক্তির অধিকারী মানুষের মন। মনের শক্তি দিয়ে কি না করতে পারে মানুষ? শরীরটাকেও মনের জোরে ইচ্ছেমত চালাতে পারে। ভারতীয় যোগীদের কথাই ধরো। কিংবা ব্যালে ড্যান্সাররা। ওরা যে সব কাণ্ড করে, আমরা জানি বলে এখন আর অবাক লাগে না। হঠাৎ করে দেখলে কি বিশ্বাস করতে পারতাম? সবচেয়ে বড় কথা, অন্য প্রাণী যে কাজটা করতে পারে, মানুষ কেন সেটা করতে পারবে না? কেন নিজের দেহে বিদ্যুৎ উৎপাদন করতে পারবে না?'

'পারবে, যদি তার শরীরে ওই প্রাণীদের মত বিশেষ যন্ত্রগুলো থাকে।'

'হ্যাঁ, যদি থাকে।' উত্তেজিত ভঙ্গিতে রবিনের দিকে এক পা এগোল কিশোর। 'কিংবা তৈরি করে দেয়া যায়!'

'মানে?' বুঝতে পারল না রবিন।

'এমন হতে পারে,' রবিনের কথা যেন শুনতেই পায়নি কিশোর, 'বিলি ফক্সের শরীর সাধারণ মানুষের চেয়ে অনেক অনেক বেশি বিদ্যুৎ সহ্য করতে পারে। ফুলগারাইটে পাওয়া ওর জুতোর ছাপ আমার মাথায় এধারণাটা ঢুকিয়েছে। বজ্রপাতে লক্ষ লক্ষ ভোল্টেজ বিদ্যুৎ শরীরে প্রবেশ করেছে ওর, পা বেয়ে মাটিতে নেমে গেছে। কোন ক্ষতি হয়নি ওর। লাভ হয়েছে। শরীরের বিশেষ কোষে কোষে জমা করে নিয়েছে সেই শক্তি, ব্যাটারির মত।'

'কি বলছ তুমি! ওকে কোন ধরনের লাইট্নিং রড মনে করছ?'

'শুধু রড নয়, ও নিজে একটা জেনারেটরও বটে,' শান্তকণ্ঠে বলল

কিশোর, 'এই শক্তি দানবে পরিণত করেছে তাকে। ফ্র্যাঙ্কেনস্টাইন। আবার আঘাত হানার আগেই ঠেকাতে হবে এই দানবকে।'

'তোমার কথার মাথামুণ্ড আমি কিছু বুঝতে পারছি না, কিশোর!' এমন ভঙ্গিতে তাকিয়ে আছে মুসা, যেন পাগল হয়ে গেছে কিশোর। 'সারা জীবন আমাকে নিয়ে হাসাহাসি করেছ ভূত বিশ্বাস করি বলে, এখন নিজেই···'

হাসল কিশোর, 'ভূত আমি এখনও বিশ্বাস করি না, মুসা। এখানে যেটা ঘটছে, যা দেখতে পাচ্ছি, সেটা পিওর সায়ান্স, খাঁটি বিজ্ঞান। দেখেও অস্বীকার করি কিভাবে?'

এগারো

পাঁচ মাস আগে হঠাৎ করেই জানতে পারে বিলি, এক সাংঘাতিক ক্ষমতা তৈরি হয়েছে ওর মধ্যে।

প্রথম যেদিন বজ্রপাতের শিকার হলো, সেদিনকার কথা মনে পড়ল তার। রাত করে ভিডিও আর্কেড থেকে বাড়ি ফিরছে। মাঠের মধ্যে দিয়ে চলেছে। হঠাৎ কালো হয়ে গেল আকাশ। ঘন ঘন বিদ্যুৎ চমকানো শুরু হলো। হিলটাউনে এটা কোন নতুন ঘটনা নয়। ঝড়বৃষ্টি আর বজ্রপাতের সঙ্গে অভ্যস্ত হয়ে গেছে এখানকার অধিবাসীরা। তাই বিশেষ গুরুত্ব দিল না বিলি। তাড়াহুড়ো না করে স্বাভাবিক গতিতেই হেঁটে চলল বাড়ির দিকে।

বাতাস বইতে শুরু করল। বৃষ্টির ফোঁটা পড়তে লাগল। ওপর দিকে তাকাল সে। পাহাড়ের ঢালে বনের আড়ালের অবজারভেটরিটা দেখার চেষ্টা করল। লোকে বলে ওটার লাইটনিং রডগুলোই যখন-তখন বিদ্যুৎ-ঝড়ের সৃষ্টি করে এখানে। ওটা তৈরি করার আগে ঝড়বৃষ্টি হলেও এত বজ্রপাত হত না কিন্তু কর্তৃপক্ষ শহরবাসীকে বুঝিয়েছে, ওটা হওয়াতে বরং ভাল হয়েছে ওদের। লাইটনিং রডগুলো বজ্রপাতকে আকর্ষণ করে, টেনে সরিয়ে নিয়ে যায়। লোকের মাথায় পড়ে না আর।

বৃষ্টির বেগ এতটাই বেড়ে গেল, না দৌড়ে আর পারল না বিলি। আরও আগেই সতর্ক হওয়া উচিত ছিল। ভিজে চুপচুপে হয়ে গেছে। বিদ্যুতের আলোয় দূরে চোখে পড়ছে ওদের বাড়িটা। লম্বা লম্বা ঘাস। এমনিতেই হাঁটতে বাধা দেয়। ভিজে গিয়ে অক্টোপাসের শুঁড় হয়ে গেল যেন। পা জড়িয়ে ধরে রাখতে চাইছে কেবলই। বুটের চাপে হুস হুস শব্দ হচ্ছে। দৌড়ানো কঠিন করে তুলল বিলির জন্যে।

চতুর্দিক আলোকিত করে দিয়ে বিদ্যুৎ চমকাল হঠাৎ। এতক্ষণ যেগুলো চমকেছে, তার চেয়ে আলো অনেক বেশি। পরক্ষণে বিকট শব্দ। বিলির মনে হলো আকাশটা ফেটে চৌচির হয়ে গেছে। সেই সঙ্গে তার নিজের মাথাটাও। শরীরে এমন তীব্র ব্যথা আর কখনও অনুভব করেনি। চিৎকার

করতে চেয়েছে। মুখ দিয়ে শব্দ বেরোয়নি। শরীরের সমস্ত পেশী যেন জট পাকিয়ে গিয়েছিল। চুলে আগুন ধরে গিয়েছিল।

সাতদিন পর জ্ঞান ফিরেছিল ওর। সারা গায়ে ব্যান্ডেজ। মমি বানিয়ে ফেলা হয়েছিল দেহটাকে। হাসপাতালের বেডে শুয়ে ছিল সে। কেউ ছিল না পাশে।

প্রথমে দেখা করতে এলেন মা। এসেই শুরু করলেন বকাবকি, চিৎকার, চেঁচামেচি। বোকার মত ঝড়বৃষ্টি দেখেও মাঠের মধ্যে দিয়ে আসতে গিয়েছিল কেন সে, তার জন্যে একশো একটা কথা শোনালেন। গালাগালে তেতো হয়ে গিয়েছিল তার মন।

পটেটোও দেখা করতে আসেনি। আসার উপায় ছিল না ওর। অসুখ হয়ে সে-ও তখন হাসপাতালে।

ছাড়া পাওয়ার একদিন আগে এসে একমুঠো রজনীগন্ধার সুবাস ছড়িয়ে যেন তার সঙ্গে দেখা করল মিলি হাওয়ার্ড। একটিন কুকিজ নিয়ে এসেছিল তার জন্যে। সেই সঙ্গে একটা সুখবর। তার বাবা একজন লোক খুঁজছেন ওদের গ্যারেজের কাজের জন্যে। বিলির কথা বলেছে মিলি। বাবা রাজী হয়ে গেছেন। আপাতত একটা বেতন ধার্য করা হয়েছে। কাজ দেখাতে পারলে ভবিষ্যতে চাকরির পদোন্নতি হবে এবং বেতনও বাড়বে।

মিলিকে ওই মুহূর্তে দেবী মনে হয়েছিল বিলির। তার অন্ধকার বিরক্তিকর জীবনে আলোর মত। তখনই ঠিক করে ফেলেছিল, ওকে সুখী করবে সে। জগতের সবচেয়ে সুখী মেয়ে। সেটা করার জন্যে যা যা দরকার, সব করবে।

এর দুদিন পর একটা টর্চ লাইটের বাতিল ব্যাটারি বদলাতে গিয়ে নিজের ক্ষমতাটা প্রথম টের পেল বিলি। এতটাই চার্জ হয়ে গেল ব্যাটারি, টর্চের বাল্‌ব্ সেটা সহ্য করতে না পেরে কেটে গেল। ব্যাটারিগুলো ফেটে গিয়ে অ্যাসিড গলে বেরিয়ে হাতে লাগল তার। শুরু হলো একটার পর একটা পরীক্ষা। দুই ঠোঁটে বাল্‌ব্ চেপে ধরে আলো জ্বেলে পটেটোকে অবাক করে দিল।

প্রথমে ব্যাপারটা খুব মজার মনে হয়েছে ওর কাছে।

কিন্তু এখন আর মজার মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই। জরুরী কাজে ব্যবহার করতে গিয়ে অতিমাত্রায় বিপজ্জনক করে ফেলেছে সে নিজেই।

ঘরে বসে কথাগুলো ভাবছিল বিলি, এই সময় গাড়ির আওয়াজ শুনল। জানালা দিয়ে উঁকি মেরে দেখল, তিন গোয়েন্দা নামছে গাড়ি থেকে।

★

দরজায় দাঁড়ানো গোয়েন্দাদের ফাঁকি দেয়ার জন্যে বেডরুমের জানালা দিয়ে বেরিয়ে গেল বিলি। বিদ্যুৎ যেন প্রচণ্ড রাগে ফেটে পড়তে চাইছে তার ভেতরে। মাঠের ওপর দিয়ে ছুটল সে।

কিন্তু দেখে ফেলল গোয়েন্দারা।

'বিলি! বিলি!' ডাকতে ডাকতে দৌড়ে আসতে লাগল কিশোর। পেছনে রবিন আর মুসা।

একবার ভাবল বিলি, দৌড়ে পালায়। কিন্তু পালিয়ে কোন সুবিধে করতে

পারবে না, বুঝে গেছে। বরং ওরা কি বলে শোনা যাক। ইস্, মস্ত ভুল হয়ে গেছে! ঝোঁকের মাথায় হাওয়ার্ডের ব্যাপারটা ঘটিয়ে ফেলার পর থেকেই ভাবছে সে। আরও সময় নিলে পারত। চৌরাস্তায় দুর্ঘটনা ঘটানোর পর পরই ওরকম একটা কাণ্ড না ঘটিয়ে অন্য কোথাও অন্য কোন সময় কাজটা করা উচিত ছিল। তাতে ওর ওপর সন্দেহ জাগত না কারও। আরও একটা বড় ভুল হয়ে গেছে—পটেটোর সামনে এটা করা।

পটেটো ওর বন্ধু, ঠিক আছে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত ওর গলার কাঁটা না হয়ে ওঠে।

মাঠের মাঝখানে এসে তাকে ধরে ফেলল তিন গোয়েন্দা। কিশোর তার হাত ধরল। ঝাড়া দিয়ে ছাড়িয়ে নিল বিলি। দাঁত কিড়মিড় করল। রাগে বড় বড় হয়ে গেছে চোখ।

'ধোরো না! আমাকে ধোরো না!' চিৎকার করে উঠল বিলি। ওখানেই তিনজনকে পুড়িয়ে ছারখার করে দিতে ইচ্ছে করল। তাহলে রেহাই পাবে সে। ওরা আর বিরক্ত করতে পারবে না।

কিন্তু জানে একাজ করা উচিত হবে না। এরা মরলে পুলিশ আর গোয়েন্দা বিভাগের কড়া নজর পড়ে যাবে ওর ওপর। পিলপিল করে পিঁপড়ের সারির মত আসতে আরম্ভ করবে ওরা। ওকে ধ্বংস না করে ছাড়বে না।

বিলির রাগ দেখে পিছিয়ে গেল কিশোর। 'ঠিক আছে, ধরব না।'

'আর কখনও আমাকে ছোঁবে না বলে দিলাম!'

'তোমার সঙ্গে আমাদের কথা আছে, বিলি,' ওকে শান্ত করার জন্যে বলল রবিন।

'কি কথা? আমি কিছু করিনি,' নিজের কাছেই বিশ্বাসযোগ্য মনে হলো না কথাটা বিলির।

ওর মুখোমুখি দাঁড়াল কিশোর। 'কেউ বলছে না তুমি কিছু করেছ। আমরা ভাবলাম আমাদের কয়েকটা প্রশ্নের জবাব দিতে পারবে তুমি। সেজন্যেই এসেছি। যদি দিতে পারো, ভাল। না পারলে...'

লম্বা দম নিল বিলি। বেরোনোর জন্যে ছটফট করছে বিদ্যুৎ। জোর করে ঠেকিয়ে রেখেছে। জমে ওঠা শক্তিটাকে ধীরে ধীরে কমানো শুরু করল। কমাতে কমাতে ধিকিধিকি আগুনের পর্যায়ে নিয়ে এল।

'বেশ,' অবশেষে বলল সে, 'কি জানতে চাও?'

★

কাউন্টি জেলের ইন্টারোগেশন রুমে বসে আছে রবিন। বিলিকে চোখ ডলতে দেখছে। খুব ক্লান্ত লাগছে ওকে। নিরীহ ভাবভঙ্গি। কেমন ভঙ্গুর। ভাবাই যায় না গোবেচারা চেহারার ওই অতি সাধারণ ছেলেটা তার রোগাটে শরীরের ভেতর থেকে ওই ভয়ঙ্কর ধ্বংসাত্মক শক্তি বের করতে পারে। বিলি একাজ করতে পারে, এটা এখনও কেবল অনুমানের পর্যায়েই রয়েছে। কোন প্রমাণ জোগাড় করা যায়নি। সত্যি কি এতটা ক্ষমতা আছে বিলির?

মুখ তুলে তাকাল বিলি। শীতল, হিসেবি দৃষ্টি। দেখে অবিশ্বাস দূর হয়ে

গেল রবিনের। হ্যাঁ, পারে! এই ছেলে ধ্বংস করতে পারে!

'আর কতবার বলব,' বিলি বলল, 'ওই লোকগুলো কিভাবে মারা গেছে আমি জানি না!'

'তাহলে আমাদের দেখে পালাচ্ছিলে কেন?'

প্রচণ্ড জোরে টেবিলে চাপড় মারল বিলি। 'বার বার বলছি, ঘুরতে বেরিয়েছিলাম!'

'সব সময় ওরকম জানালা দিয়েই বেরোও নাকি?'

ভয়ঙ্কর ভঙ্গিতে জ্বলে উঠল বিলির চোখ। প্রশ্নটা এড়িয়ে গিয়ে বলল, 'তোমাদের তো একটা মেডেল দেয়া উচিত আমাকে। আমার বসের জীবন বাঁচিয়ে দিয়েছি বলে।'

নিরাশ ভঙ্গিতে মাথা নাড়তে লাগল রবিন। নাহ্, বড় কঠিন ঠাঁই। এর পেট থেকে কথা আদায় করতে পারবে না। বার বার একই প্রশ্ন করে যাচ্ছে। বিলির জবাবেরও কোন পরিবর্তন নেই। জোরাল প্রমাণ না পাওয়া গেলে ওকে আর বেশিক্ষণ আটকে রাখা যাবে না।

'সত্যি বাঁচিয়েছ কিনা এখনও শিওর না আমরা,' বলে চেয়ার ঠেলে উঠে দাঁড়াল রবিন।

চেয়ারে হেলান দিল বিলি। রবিনকে দরজার দিকে এগিয়ে যেতে দেখে প্রশ্নটা ছুঁড়ে দিল সে। 'কেন? কেউ কি তোমাদের বলেছে কিছু? পটেটো বলেছে?'

বাইরে বসে আছে একজন ডেপুটি। রবিনকে দরজা খুলে দিল।

শেষবারের মত বিলির দিকে ফিরে তাকাল রবিন। সামনে ঝুঁকে বাঁকা হয়ে বসেছে এখন বিলি। দুই হাতে খামচে ধরেছে টেবিলের কিনার। অসহায় লাগছে ওকে। রবিনের চোখে চোখ পড়তেই বদলে যেতে শুরু করল ভঙ্গিটা। জানোয়ারের মত জ্বলে উঠতে শুরু করল দুই চোখ···না, জানোয়ার নয়! রবিনের মনে হলো—বৈদ্যুতিক বাতির মত!

বেরিয়ে এল রবিন।

হলওয়েতে ওর সঙ্গে দেখা করল কিশোর আর মুসা। কিশোর আশা করেছিল, রবিনকে যেহেতু নিরীহ চেহারার মনে হয়, তার কাছে মুখ খুলবে বিলি। সেজন্যেই কথা বলতে পাঠিয়েছিল। বুঝল, সুবিধে করতে পারেনি রবিন। তবু জিজ্ঞেস করল কিশোর, 'কি খবর?'

'কিছুই বলে না। বার বার একই কথা, সে একজন হিরো।'

'ধরে থাবড়া লাগানো দরকার!' ফুঁসে উঠল মুসা।

'লাগাতে গেলে তোমাকেও খতম করে দেবে,' হাত নেড়ে ওকে শান্ত হতে ইশারা করল কিশোর। রবিনকে জিজ্ঞেস করল, 'জোসেফ হাওয়ার্ডকে কিভাবে বাঁচিয়েছে? কিছু বলল?'

'কিছুই না। গোপন বিদ্যা নাকি জানে সে। কোন্ এক গুরুর কাছে শিখেছে।'

'কোন্ গুরু?'

'বলবে না বলে দিয়েছে।'

মাথা দোলাতে দোলাতে কিশোর বলল, 'হুঁ। রবিন, আমার ধারণা পুরো ঘটনাটাই ওর সাজানো নাটক।'

'মানে? তুমি বলতে চাইছ হার্ট অ্যাটাকটাও ওই ঘটিয়েছে?'

মাথা ঝাঁকাল কিশোর।

'এসব ঝামেলা কেন করতে গেল?'

'জানি না,' আনমনে বলল কিশোর। নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটল। 'তবে এমন একজনকে চিনি যে জানে।'

বারো

হিলটাউনের সবচেয়ে দামী এলাকায় সুন্দর একটা দোতলা বাড়ির সামনে মুসাকে গাড়ি রাখতে বলল কিশোর। রবিনের দিকে ফিরে জিজ্ঞেস করল, 'ঠিকানা ঠিক আছে তো?'

নোটবুক দেখে নিশ্চিত হয়ে নিয়ে রবিন জানাল, 'হ্যাঁ, এটাই।'

আসার পথে মিলির কথা রবিনকে জানিয়েছে কিশোর। হাসপাতালে ওর সঙ্গে কিভাবে দেখা হয়েছে বলেছে।

বেল বাজানোর কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই দরজা খুলে দিল মিলি। বিশ্রাম নেয়ার জন্যে হাসপাতাল থেকে যদি বাড়ি এসে থাকে সে, সফল হয়নি সে-চেষ্টা। বরং আগের চেয়ে অনেক বেশি বিধ্বস্ত লাগছে তাকে।

তিন গোয়েন্দাকে দেখে জমে গেল যেন।

'মিলি...' শুরু করতে গেল কিশোর।

কিন্তু তাকে চুপ করিয়ে দিল মিলি। 'সরি। এখন কথা বলতে পারব না। হাসপাতালে রওনা হচ্ছিলাম।' ভঙ্গি দেখে মনে হলো কেঁদে ফেলবে।

'বিলি ফক্সকে হাজতে নিয়ে যাওয়া হয়েছে, মিলি,' মোলায়েম করে বলল কিশোর। 'কিছুক্ষণ আগে শেরিফকে বলে তাকে আটকানোর ব্যবস্থা করেছি।'

তাকিয়ে রইল মিলি। কিছু বলল না।

তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ওকে লক্ষ করছে কিশোর। ঠিকই অনুমান করেছিল। মিলি কিছু জানে। বলতেও চায়। কিন্তু ভয় পাচ্ছে।

'ভেতরে আসব?' স্বর আরও নরম করে জিজ্ঞেস করল কিশোর।

দ্বিধা করল মিলি। তারপর সরে গিয়ে পুরো মেলে ধরল দরজা।

লিভিং রুমে ঢুকল তিন গোয়েন্দা। সুন্দর করে সাজানো। দামী আসবাব, ঘর সাজানোর সরঞ্জাম, কার্পেট, টবে লাগানো গাছ আর অ্যানটিক প্রচুর আছে। তবে বাড়াবাড়ি নেই।

'আমি হাই স্কুলে পড়ি,' বলার মত অন্য কোন কথা যেন খুঁজে পেল না

মিলি। 'বিলিও একই ক্লাসে পড়ে।'
'ওর সঙ্গে সম্পর্ক কেমন তোমার?' জানতে চাইল রবিন।
'আমার তরফ থেকে সাদামাঠা। কিন্তু ও বোধহয় আমাকে পছন্দ করে...একটু বেশিই করে। ওর জন্যে দুঃখ হয় আমার।' অস্বস্তি বোধ করছে মিলি। যেন কোন সাংঘাতিক অন্যায় কিংবা বেআইনী কাজ করে ফেলেছে বিলির পছন্দের দাম দিতে না পেরে। 'সহপাঠী। অসুস্থ হয়ে পড়ে ছিল হাসপাতালে। মায়া দেখাতে গিয়েছিলাম। ভেবেছিলাম গরীব মানুষ, লেখাপড়ার ফাঁকে ফাঁকে কাজ করে দু'চারটে পয়সা পাক...কিন্তু...'
'গ্যারেজের চাকরিটা কি তুমিই তোমার বাবাকে বলে নিয়ে দিয়েছিলে নাকি?' জানতে চাইল কিশোর।
মাথা ঝাঁকাল মিলি। 'হ্যাঁ। তার কয়েক দিন পর থেকেই ফোন আসতে থাকল। রিং হয়। আমি ধরলে কিছু না বলেই ছেড়ে দেয়।'
'কি করে বুঝলে বিলিই করত?'
ভ্রূকুটি করল মিলি। 'আমাকে দেখলে যেভাবে গদগদ হয়ে তাকিয়ে থাকে...যা-ই হোক, বুঝতে পারতাম ঠিকই।' কিশোরের দিক থেকে রবিনের দিকে ফিরল সে। মুসাকে দেখল। আবার ফিরল কিশোরের দিকে। 'বিলিই যে করত কোন সন্দেহ নেই আমার।'
ওর কথা বিশ্বাস করল কিশোর। কিন্তু মিলির এসব কথা বিলির বিরুদ্ধে প্রমাণ নয়। এখনও এমন কিছু বলেনি সে, যেটা দিয়ে ফাঁসানো যায় বিলিকে।
'কখন থেকে সন্দেহ করলে অঘটন ঘটাতে শুরু করেছে বিলি?'
সরাসরি কিশোরের চোখের দিকে তাকাল এতক্ষণে মিলি। 'ও নিজেই আমাকে বলেছে।'
বিস্ময়ে সামনে ঝুঁকে গেল রবিন। 'মানুষ খুন করেছে এ কথা বলেছে ও?'
'না, তা অবশ্য বলেনি। তবে ওর নাকি ক্ষমতা আছে। ভয়ঙ্কর ক্ষমতা।'
মাথা ঝাঁকাল রবিন।
কিশোর জিজ্ঞেস করল, 'কবে বলেছে?'
'শেষ লোকটাকে খুন করার পর।'
'লেসলি কার্টারিসকে?'
মাথা ঝাঁকিয়ে মুখ নিচু করে ফেলল মিলি। 'আমি ওর কথা বিশ্বাস করিনি। ভেবেছিলাম আমাকে ভজানোর জন্যে গল্প করছে। কিন্তু আজ যা ঘটল...' মুখ তুলল সে। 'বুঝতে পারছি এক বর্ণও মিথ্যে বলেনি। যা বলেছে, সবই করতে পারে।'
'আর কাউকে বলেছ একথা?'
হাসল মিলি। ছোট্ট, বিষণ্ণ হাসি। মাথা নাড়ল। 'কে বিশ্বাস করবে এসব আজগুবী কথা?'
একমত হয়ে মাথা ঝাঁকাল কিশোর।
'আমি এখন রীতিমত ভয় পেয়ে গেছি,' মিলি বলল। 'আমি ওকে এড়িয়ে চলতে গেলে না জানি কি করে বসে...বাবাকে করল...আমাকে করতে

কতক্ষণ? বাবাকে একবার বাঁচিয়ে রেখেছে, দ্বিতীয়বার…'

মুখে হাত চাপা দিল মিলি।

এগিয়ে গিয়ে সান্ত্বনা দেয়ার ভঙ্গিতে একটা হাত রাখল ওর কাঁধে রবিন। 'এখন আর ভয় পাওয়ার কিছু নেই তোমার। তুমি এবং তোমার বাবা দুজনেই নিরাপদ। আমরা আছি।'

চোখের পানি আর ধরে রাখতে পারল না মিলি। কাউকে জমিয়ে রাখা কথাগুলো বলে মনের ভার লাঘব হয়েছে। ভাবসাব দেখে মনে হলো রবিনের কথা বিশ্বাস করেছে। ভরসা জন্মেছে তিন গোয়েন্দার ওপর।

★

ফেরার পথে আলোচনা করতে করতে চলল তিন গোয়েন্দা। উপায় খুঁজতে লাগল কি করে বিলির মত একটা ভয়াবহ বিপজ্জনক এবং মারাত্মক অপরাধীকে গ্রেপ্তার করানো যায়।

'বিষাক্ত কেউটের চেয়েও ভয়ঙ্কর ও,' কিশোর বলল। 'হাইভোল্ট বিদ্যুৎ! ছোঁয়া লাগলেই মৃত্যু। আমি ভাবছি, না ছুঁয়েও…'

'যা সব কথা শুরু করেছ না তুমি! আমার জিনের আসরও এর চেয়ে কম উদ্ভট!' গাড়ি চালাতে চালাতে বলল মুসা। রাস্তার দিকে নজর।

কয়েক মিনিট পর জেলখানায় পৌঁছল ওরা। যে কোন রকম অঘটন দেখার জন্যে তৈরি।

গাড়ি থেকে নেমে সবার আগে ভেতরে ঢুকল কিশোর। অজানা আশঙ্কায় অস্থির। কি দেখতে পাবে কে জানে! ডেপুটিকে দেখল টেবিলে বসে একটা ম্যাগাজিনের পাতা ওল্টাচ্ছে। সে ছাড়া আর কেউ নেই ঘরে। তারমানে কোন ক্ষতি হয়নি। স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে জিজ্ঞেস করল কিশোর, 'বিলি কোথায়?'

ডেপুটি জবাব দেয়ার আগেই জানতে চাইল রবিন, 'অন্য কোন জেলে ট্রান্সফার করেছেন?'

কিশোরের পেছন পেছন ঢুকেছে সে। মুসা রয়ে গেছে গাড়িতে।

'বাড়ি পাঠিয়ে দিয়েছি,' পেছন থেকে বলে উঠল একটা কণ্ঠ।

ফিরে তাকাল দুজনে। শেরিফ রবার্টসন।

'ছেড়ে দিয়েছেন?' বিশ্বাস করতে পারছে না কিশোর।

'আর কি করব?' হাতের ফাইলটা নেড়ে বললেন, 'এটা পড়ার পর ছেড়েছি। তোমরাই তো লিখে রেখে গেছ।'

'ছেড়ে দেয়ার কথা লিখিনি…' রবিন বলল।

দৌড় দিল কিশোর। যেতে যেতে বলল, 'মিলিকে ফোন করতে যাচ্ছি।'

একটা মুহূর্ত ভুরু কুঁচকে সেদিকে তাকিয়ে রইলেন শেরিফ। চোখ ফেরালেন রবিনের দিকে। ফাইলটা খুলে পড়লেন, 'নিজের শরীরে বিদ্যুৎ তৈরি করে সেটার সাহায্যে খুন করে সে!' রবিনের দিকে তাকিয়ে চোখের পাতা সরু করে বললেন, 'অনুমান? না সত্যি বিশ্বাস করো একথা?'

বুকের ওপর দুই হাত আড়াআড়ি রাখল রবিন। শেরিফের মতই চোখের

পাতা সরু করে জবাব দিল, 'করি। আমাদের বিশ্বাস...ওই পাঁচটা রহস্যময় খুনের জন্যে বিলিই দায়ী। আপনি ওকে ছেড়ে দিয়ে ভুল করেছেন, স্যার। কি যে অঘটন ঘটাবে এখন সে-ই জানে!'

শুকনো হাসি হাসলেন শেরিফ। 'তোমরা বলতে চাইছ বজ্র ছুঁড়ে মারতে পারে বিলি?'

'এটাই তো আপনার রিমোট কন্ট্রোলড ইলেকট্রিক শকের জবাব, তাই না?'

গম্ভীর ভঙ্গিতে মাথা ঝাঁকালেন শেরিফ, 'মনে হচ্ছে। তবে বিশ্বাস করতে পারছি না।' ফাইলটা টেবিলে ছুঁড়ে ফেললেন তিনি। 'বুঝতে পারছি না কি করব! তোমাদের কথা বিশ্বাস করে শেষ বয়েসে শেষে লোক হাসাব নাকি কে জানে!...অবশ্য ইয়ান ফ্লেচারের ওপর ভক্তি আছে আমার। ও যখন তোমাদের সার্টিফাই করেছে...'

'আপনার দ্বিধা করার কিছু নেই, স্যার। আপনিই বলেছেন বজ্রের ব্যাপারে অনেক কথাই অজ্ঞাত রয়ে গেছে। বড় বড় বিজ্ঞানীরাও সব জানেন না। আর বজ্র মানেই বিদ্যুৎ। এখানে একটা কথা, অন্য জীব যদি নিজের দেহে বিদ্যুৎ তৈরি করতে পারে, মানুষই বা পারবে না কেন?'

মুখ খুলেও আবার বন্ধ করে ফেললেন শেরিফ। প্রশ্নটা করে ওকে কোণঠাসা করে দিয়েছে রবিন। জবাব খুঁজে পাচ্ছেন না।

দৌড়ে ফিরে এল কিশোর। দরজায় দাঁড়িয়ে হাঁপাতে হাঁপাতে রবিনকে জানাল, 'মিলি বাড়িতে নেই!'

'নিশ্চয় হাসপাতালে রওনা হয়ে গেছে,' বলেই দরজার দিকে ছুটল রবিন।

বেরিয়ে গেল দুজনে।

পেছনে ভুরু কুঁচকে তাকিয়ে রইলেন শেরিফ। ভীষণ একটা সমস্যায় ফেলে দিয়েছে তাঁকে ছেলেগুলো।

তেরো

রাত বারোটা বাজতে দশ মিনিট বাকি। ভাল লাগছে না পটেটোর। বিলি ফক্স আর তার ভয়ঙ্কর বিপজ্জনক খেলার ভাবনা কিছুতেই দূর করতে পারছে না মন থেকে। মাঝেমধ্যে একআধটু উত্তেজক বিকৃত খেলা যে ভাল লাগে না তার, তা নয়। তবে ইদানীং বড় বেশি বিকৃত খেলা শুরু করে দিয়েছে বিলি, যেটা তার সহ্যের বাইরে। এসব খেলার কথা ভাবতেও ভাল লাগছে না আর ওর।

খালি ঘর। খানিক আগে একটা ছেলে আর তার বান্ধবী এককোণে দুটো মেশিনে খেলছিল। ওরাই আজকের শেষ খেলোয়াড়। চলে গেছে। একা একা বসে এখন কমিক পড়ার চেষ্টা করছে পটেটো। মন বসাতে পারছে না।

ঠিক বারোটায় উঠে গিয়ে মেইন ব্রেকার অফ করে আলো নিভিয়ে দিল সে।

অন্ধকার হয়ে গেল আর্কেড। তবে পুরোপুরি নয়। একধারে একটা আলো জ্বলেই রইল। ভিডিও গেম মেশিনের স্ক্রীনের আলো। সতর্ক ভঙ্গিতে পা টিপে টিপে সেটার দিকে এগোল সে। Virtual Massacre-II মেশিনটা চলছে বিদ্যুৎ ছাড়াই। পর্দায় ফাইটারদের ওপরে ফুটে উঠেছে নামের একটা স্তম্ভ। বিশটা নাম। সবগুলো একজনের—বি. পি. এফ.।

'এই, যাহ্!' লেখাগুলোকে বলল সে। যেন ধমক দিলেই কথা শুনবে মেশিন। অপেক্ষা করতে লাগল মেশিন বন্ধ হওয়ার। হলো না। বিড়বিড় করে বলল, 'বিলি, আমি জানি, তুমি একাজ করছ।'

জবাব নেই।

হঠাৎ ঝমঝম করে বেজে উঠল জুকবক্সটা! দি নাইটওয়াকারস।

ঘটনাটা নতুন নয় পটেটোর কাছে। কিন্তু এ মুহূর্তে অস্বস্তি বোধ করতে লাগল সে। জোর করে হাসল।

'কি হয়েছে বিলি? কিছু বলতে চাও?' দরজার দিকে পা বাড়াল পটেটো। আতঙ্ক চেপে রাখার চেষ্টা করছে। ওর চারপাশের বাতাস ঘন, ভারী হয়ে উঠেছে। অদ্ভুত এক ধরনের গন্ধ। বিদ্যুৎ-ঝড়ের পর যেমন হয়।

প্রতিটি পা বাড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে মনে হচ্ছে আরও বেশি দুর্বল হয়ে যাচ্ছে সে। এ এক ভয়ানক পরিস্থিতি। আতঙ্ক কিছুতেই বাগ মানাতে পারছে না। একটা মানুষখেকো হাঙরের সঙ্গে সাঁতার কাটছে যেন। জানে নিচের গভীর পানিতে কোনখানে রয়েছে ওটা, কিন্তু ও দেখতে পাচ্ছে না। সময়মত ঠিকই ভুস করে উঠে আসবে ওকে ছিঁড়ে খাওয়ার জন্যে।

দরজা খোলার জন্যে ঠেলা দিল পটেটো। পকেট থেকে চাবির গোছা বের করল। আবছা আলোয় অনেকটা আঙুলের আন্দাজে খুঁজে বের করল সঠিক চাবিটা। হাত ভীষণ কাঁপছে।

চিৎকার করে উঠল সে, 'কি করছ? বলেছিই তো ওদের কিছু বলিনি আমি!'

জুকবক্সে মিউজিকের কানফাটা ঝমঝম ছাড়া কেউ জবাব দিল না তার কথার।

বাইরে এসে দরজাটা লাগিয়ে দিয়ে কাঁপা হাতে কোনমতে চাবিটা তালায় ঢোকাল সে। তালা লাগানোর পর একটা মুহূর্ত আর দেরি করল না। ছুটে নামল চত্বরে। ঝোড়ো বাতাস বইছে।

পার্কিং লটে এসেও শব্দের অত্যাচার থেকে নিস্তার পেল না। এখন বাজনা বাজাচ্ছে বাতাসের শব্দ। গাছগুলোও যেন স্পীকারে পরিণত হয়েছে। আকাশে মেঘ গুমগুম করে বাজিয়ে চলেছে হেভি মেটাল মিউজিক।

ওকে ঘিরে বইছে প্রবল বাতাসের ঘূর্ণি। এখনও দেখতে পাচ্ছে না বিলিকে। চিৎকার করে বলল, 'বিলি, বিশ্বাস করো! আমি কিছু বলিনি ওদের! শিশুর মত অসহায় ভঙ্গিতে কেঁদে উঠল। 'আমি তোমার বন্ধু, বিলি! আমার

সঙ্গে এমন করছ কেন?'

এতক্ষণে জবাব মিলল। মিউজিকের চেয়ে জোরাল শব্দে, রোদের চেয়ে উজ্জ্বল বিদ্যুতের একটা হলকা এসে লাগল ওর পিঠে। হৃৎপিণ্ডটাকে পুড়িয়ে দিয়ে বুক ভেদ করে গিয়ে ঢুকে গেল মাটিতে।

মাটিতে হুমড়ি খেয়ে পড়ল পটেটো। পকেট থেকে সিকিগুলো ছড়িয়ে পড়ল মাটিতে। পার্কিং লটে কংক্রীটের মেঝেতে ঝনঝন শব্দ তুলল। কিছুই কানে ঢুকল না তার। ঢুকবেও না আর কোনদিন।

★

আর্কেডের ছাতে দাঁড়িয়ে পার্কিং লটে পড়ে থাকা ওর বন্ধুর দেহটার দিকে তাকিয়ে আছে বিলি। মনের মধ্যে খুঁজে দেখল, যে কাজটা করেছে তার জন্যে কোন রকম দুঃখবোধ, অনুশোচনা আছে কিনা। নেই। একটুও খারাপ লাগছে না। ভয়বাহ বিদ্যুৎ যেন তার ভেতরটাকেও পুড়িয়ে, মুছে অনুভূতি আর আবেগশূন্য করে দিয়েছে। যা ঘটানোর ঘটিয়ে ফেলেছে। ফেরার উপায় নেই আর। এখন শুধু এগিয়ে যাওয়া। যা শুরু করেছে সেটার শেষ করতেই হবে।

ভয় পায় না সে। মিলি যদি সঙ্গে থাকে দুনিয়া জয় করার চেষ্টাতেও আপত্তি নেই।

সব পারবে।

প্রবল বেগে বাতাস বইছে। উত্তরের আকাশে মেঘ জমছে। ঝড় আসবে।

দেখেও দেখল না বিলি। কেয়ারও করল না। ঝড়বৃষ্টি দেখার চেয়ে অনেক বেশি জরুরী কাজ এখন পড়ে আছে তার সামনে। ছাত থেকে নেমে আসতে লাগল পটেটোর লাশটা তুলে নেয়ার জন্যে।

চোদ্দ

হাসপাতালে যাওয়ার সময় সারাটা পথ আরও জোরে গাড়ি চালানোর জন্যে মুসাকে তাগাদা দিতে থাকল কিশোর। পঞ্চাশ-ষাট মাইল বেগে চলছে, তা-ও মনে হচ্ছে ওর, অনড় হয়ে আছে গাড়িটা।

মিলিকে কথা দিয়েছে, সে আর তার বাবা নিরাপদে থাকবেন। রাখার দায়িত্ব ওদের। বাঁচাতে না পারলে মিলির কাছে ছোট হয়ে যাবে তিন গোয়েন্দা। মান থাকবে না শেরিফ রবার্টসনের কাছে।

হাসপাতালের সামনে গাড়িটা পুরোপুরি থামার আগেই দরজা খুলে লাফ দিয়ে নেমে গেল কিশোর। দৌড় দিল লিফটের দিকে। ঘন ঘন চাপ দিচ্ছে বোতামে। এলিভেটর, মুসা এবং রবিন তার কাছে একসঙ্গে পৌঁছল।

পাঁচ তলায় উঠে এলিভেটরের দরজা ফাঁক হওয়া শুরু করতেই বেরিয়ে পড়ল কিশোর।

হলে ডিউটিরত বিস্মিত নার্সকে বলল, 'জলদি সিকিউরিটিকে ফোন

করুন। বলে দিন, হাসপাতালের পরিচিত লোক ছাড়া আর কাউকে যেন ঢুকতে না দেয়।

নার্স কি বলে না বলে তার জন্যে দাঁড়িয়ে রইল না সে। দৌড় দিল হাওয়ার্ডের কেবিনের দিকে। জানালা দিয়েই মিলিকে দেখতে পেল। অস্থিরতা নেই। বসে আছে বাবার বিছানার পাশে চেয়ারে।

ফোঁস করে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল কিশোর। ঠেলা দিয়ে খুলে ফেলল দরজা। আস্তে করে ডাকল, 'মিলি!'

ফিরে তাকাল মিলি। সতর্ক হয়ে গেছে মুহূর্তে। উঠে এগিয়ে এল। 'কি?'

'আমাদের সঙ্গে এখুনি যেতে হবে তোমাকে।'

'কোথায়? কেন?'

'হাজত থেকে বিলিকে ছেড়ে দিয়েছেন শেরিফ।'

'তাই নাকি!' যেন প্রচণ্ড এক ধাক্কা খেয়ে পিছিয়ে গেল মিলি। কিশোরের কাঁধের ওপর দিয়ে তাকাল মুসা আর রবিনের দিকে। 'কিন্তু তোমরা আমাকে নিশ্চিন্ত থাকতে বলেছিলে। বলেছ আমরা নিরাপদ।'

'বলেছি। হাতে সময় কম। জলদি এসো। যেতে যেতে বলব...'

মাথা নাড়ল মিলি। 'কিন্তু ডাক্তার বলেছেন বাবাকে নাড়াচাড়া করা একদম উচিত হবে না। ওঁকে একা ফেলে যেতে পারব না আমি।'

কিশোরের পাশ কাটিয়ে ঘরে ঢুকল মুসা। 'আমি তোমার বাবাকে পাহারা দিচ্ছি। তুমি ওদের সঙ্গে চলে যাও।'

'না! আমি যাব না!'

'জেদ কোরো না, মিলি!'

'বললাম তো আমি যাব না!' টেবিলে রাখা হাতব্যাগটা নিয়ে এল মিলি। খুলে একটা পিস্তল বের করে দেখাল। 'বাবার। নিশানা খুব একটা খারাপ না আমার। বাবাই গুলি চালানো শিখিয়েছে...'

'ওরকম হাজারটা পিস্তল দিয়েও বিলির বিরুদ্ধে কিছু করতে পারবে না। ভয়ঙ্কর ক্ষমতা ওর। যত তাড়াতাড়িই করো, পিস্তল তুলে গুলি করতে যেটুকু সময় লাগবে তোমার, ওর ততটা লাগবে না। মনে মনে শুধু বলবে...'

দপ করে নিভে গেল বাতি। কয়েক সেকেন্ড পরেই জ্বলে উঠল আবার। চালু হয়ে গেছে হাসপাতালের স্বয়ংক্রিয় জেনারেটর। ইমারজেন্সি পাওয়ার।

থাবা দিয়ে মিলির হাতের পিস্তলটা প্রায় কেড়ে নিল কিশোর। 'ও এসে গেছে!'

★

হলের অনেক নিচে টুং করে মৃদু একটা শব্দ হলো। মিলি, কিশোর, রবিন, মুসা, সবাই শুনতে পেল সেটা। গলা লম্বা করে কিশোরের কাঁধের ওপর দিয়ে এদিক ওদিক তাকাতে লাগল মুসা। শব্দটা কিসের বুঝতে চায়।

হল আর বেশির ভাগ জায়গাতেই ডিম লাইট জ্বলছে। সবচেয়ে বেশি আলো আছে করিডরে, এলিভেটরের কাছে।

উঠে আসছে এলিভেটর।

সেদিকে দৌড় দিল তিনজনে।

টুং!

চারতলায় থেমেছে এলিভেটর। ঠিক ওদের নিচে। এলিভেটরের দরজার সামনে দাঁড়িয়ে দুহাতে পিস্তলটা চেপে ধরে সামনে বাড়াল কিশোর। বিলির দিক থেকে কোন রকম ক্ষতির সম্ভাবনা দেখলে নির্দ্বিধায় গুলি চালাবে। তারপর যা হয় হোক।

টুং!

পাঁচতলায় থামল এলিভেটর। দরজার দিকে পিস্তল তাক করে রেখেছে কিশোর। উত্তেজনায় টান টান হয়ে আছে স্নায়ুগুলো। ট্রিগার ছুঁয়ে থাকা আঙুলটা চেপে বসতে প্রস্তুত।

খুলে যাচ্ছে দরজা। এলিভেটরের মেঝেতে দলামোচড়া হয়ে পড়ে আছে একজন মানুষ।

পিস্তল নামাল কিশোর। পড়ে থাকা মানুষটাকে চিনতে পারল। ভিডিও আর্কেডের সেই ছেলেটা। পটেটো।

রবিনের দিকে তাকিয়ে ঘাড় কাত করে ইশারা করল সে। বুঝতে পারল রবিন। এলিভেটরে ঢুকে পটেটোর গলার কাছে হাত দিয়ে নাড়ী দেখল। মনে পড়ল, হাজতে বসে ওর কথা জিজ্ঞেস করেছিল বিলি। ইস্, তখন গুরুত্ব দেয়নি! দেয়া উচিত ছিল। এখন দেরি হয়ে গেছে অনেক।

কিশোরের দিকে তাকিয়ে মাথা নাড়ল রবিন, 'নেই!'

এলিভেটরে ঢুকে 'স্টপ' সুইচটা টিপে দিল কিশোর যাতে ওই তলাতেই আটকে থাকে ওটা। বেরিয়ে এল আবার।

পেছনে এসে দাঁড়াল ডিউটি-নার্স। এলিভেটরের দেহটা দেখে অস্ফুট গলায় বলে উঠল, 'ও, লর্ড!'

ওর দিকে ফিরে তাকাল কিশোর। 'এই তলায় ওঠার আর কোন উপায় আছে?'

হাত তুলে হলের শেষ মাথা দেখাল নার্স। 'সিঁড়ি।' নিজেকে সামালানোর চেষ্টা করছে এখনও।

দুই সহকারীর দিকে ফিরল কিশোর। 'মিলির কাছে থাকো। ওদের পাহারা দাও।'

'তুমি কোথায় যাচ্ছ?' জানতে চাইল মুসা।

'বিলিকে ধরতে। পটেটোর লাশটা এদিকে পাঠিয়ে আমাদের নজর সরিয়ে রাখতে চাইছে সে। সেই সুযোগে···' কথা শেষ না করেই সিঁড়ির দিকে রওনা হয়ে গেল কিশোর।

★

সিঁড়িঘরের দরজা খুলে দাঁড়িয়ে রইল কিশোর। চোখে আলো সয়ে আসার অপেক্ষা করল। মেইন লাইন থেকে বিদ্যুৎ না পাওয়ায় এখানে বেশি পাওয়ারের আলোগুলোর কানেকশন বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়ে নিভে আছে। জ্বলছে

অতি সামান্য পাওয়ারের লাল বাল্ব। বিচিত্র এক অপার্থিব লালচে আলো সৃষ্টি করেছে। সরাসরি যেসব জায়গায় আলো পড়ছে না সেই কোণগুলোতে ছায়া।

আস্তে করে গলা বাড়িয়ে কোণের দিকে তাকাল সে। সিঁড়ির ধাপ দেখল।

কেউ নেই।

যতটা সম্ভব নিঃশব্দে নামতে শুরু করল সে। ধাতব সিঁড়ি বেয়ে দ্রুত এবং শব্দ না করে নামা খুব কঠিন কাজ।

হাত লম্বা করে পিস্তলটা সামনে বাড়িয়ে রেখেছে।

মোড় ঘুরল একটা। কাউকে দেখা গেল না।

বাকি ধাপ ক'টা দৌড়ে পেরোতে শুরু করল। নিচে প্রায় পৌঁছে গেছে এই সময় একটা গুঞ্জন কানে এল। কোন ইলেক্ট্রিক্যাল কয়েল খারাপ থাকলে যেমন মৃদু একটা শব্দ ওঠে, তেমনি। মাঝে মাঝে চড়চড় ফড়ফড় করে উঠছে। বাকি কয়েকটা ধাপ নিঃশব্দে নেমে কান পাতল সে।

কোন সন্দেহ নেই। কানের ভুল নয় তার। লম্বা করে দম নিল। সিঁড়িতে এক ধরনের গন্ধ। ব্যাখ্যা করে বোঝানো যাবে না গন্ধের রকমটা। তবে সচল বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতিতে বোঝাই ঘরে যে রকম গন্ধ পাওয়া যায়, অনেকটা সেরকম।

উত্তেজনায় টানটান স্নায়ুগুলোকে ঢিল করার চেষ্টা চালাল সে। সেটা করা সম্ভব নয় আর এখন কোনমতেই। বরং পিস্তলটায় আরও শক্ত হয়ে চেপে বসল হাতের আঙুলগুলো। সিঁড়ির গোড়ায় দাঁড়িয়ে চরকির মত পাক খেয়ে ঘুরে দাঁড়াল সে। আক্রমণ করতে আসা বিলিকে দেখামাত্র গুলি করবে।

কিন্তু কোন নড়াচড়া চোখে পড়ল না। বরং নষ্ট করে দেয়া সার্কিট ব্রেকারটা চোখে পড়ল। তারের সঙ্গে পেন্ডুলামের মত দুলছে এপাশ ওপাশ। বাক্সটা যেন প্রচণ্ড আক্রোশে টেনে খুলে আনা হয়েছে। ছেঁড়া তারের মাথা একটার সঙ্গে আরেকটা লাগলেই বিদ্যুতের স্ফুলিঙ্গ ছুটছে। চড়চড় ফড়ফড় আওয়াজটা হচ্ছে তখনই।

পিস্তল নামাল কিশোর। হতাশ হয়েছে। বিলি এখানে এসেছিল সন্দেহ নেই। স্পষ্ট প্রমাণ রেখে গেছে। এখন কোথায়?

★

হিলটাউন কমিউনিটি হাসপাতালের অন্ধকার করিডর ধরে শিকারী বিড়ালের মত এগিয়ে চলেছে বিলি। ভাল বলতে আর কোন কিছুই অবশিষ্ট নেই ওর মাঝে। ওর নিজেরই মনে হচ্ছে বহুদূরে কোথাও ফেলে এসেছে সেসব। কিন্তু তাই নিয়ে কোন আফসোস নেই ওর। একটা চিন্তাই রয়েছে তার মন জুড়ে। একটা চেহারা। মিলি হাওয়ার্ড!

শিরায় বইছে প্রচুর পরিমাণে অ্যাড্রেনালিন। অতি সতর্ক করে তুলেছে তাকে। অতিরিক্ত সচেতন। অনুভব করছে বৈদ্যুতিক-জ্যোতি: ঘিরে ফেলছে তাকে, অনেকটা ষষ্ঠ ইন্দ্রিয়ের মত। দেয়ালের ভেতরের বৈদ্যুতিক

তারগুলোর অস্তিত্ব টের পাচ্ছে সে। শুঁয়াপোকা যেমন নিজের শরীরকে খোলসে আবদ্ধ করে ফেলে, ভয়ের উৎপত্তি হয় যেখান থেকে মগজের সেই অংশটাকে তেমনি ভাবে বন্ধ করে দিয়ে জোসেফ হাওয়ার্ডের কেবিনের দিকে এগিয়ে চলল সে।

দরজা খুলল। পর্দা সরাল।

বিছানা আছে। তাতে ওষুধ দিয়ে ঘুম পাড়িয়ে রাখা হয়েছে মিস্টার হাওয়ার্ডকে। কিন্তু মিলি কই?

'মিলি!' ডাক দিল সে। 'কোথায় তুমি?'

পেছন থেকে কঠোর স্বরে বলে উঠল একটা কণ্ঠ, 'নোড়ো না, বিলি! আমি রবিন বলছি! আমার হাতে পিস্তল আছে!'

ঘুরে তাকাল বিলি। অন্ধকারে একটা পর্দার আড়ালে মানুষ আছে, অস্পষ্ট ভাবে বোঝা যাচ্ছে। পর্দার একটা জায়গা উঁচু হয়ে আছে। পিস্তলের নল দিয়ে ঠেলে রাখলে যেমন হয়।

সেদিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে তার অবচেতন মনের গভীরে কোথায় যেন কে বলে উঠল, ভয় পাওয়া উচিত। কিন্তু পেল না সে। ভয়ের অনুভূতিটাকে ঘিরে ফেলেছে আশ্চর্য এক খোলস। কিংবা কোন ধরনের শক্তি। হতে পারে সেটা চৌম্বক ক্ষেত্র।

অন্ধকার ছায়া থেকে ধীর পায়ে বেরিয়ে এল মিলি।

গোয়েন্দা কিংবা পিস্তলের কথা মন থেকে বেমালুম উধাও করে দিল বিলি। সেসব আর কোন গুরুত্ব বহন করে না তার কাছে। এখন তার একমাত্র আকর্ষণ মিলি।

'এসো, মিলি,' হাত বাড়িয়ে ডাকল সে। 'অনেক কথা আছে তোমার সঙ্গে।'

'খবরদার, বিলি,' পর্দার আড়াল থেকে ধমকে উঠল রবিন, 'ওকে ধরবে না!'

'মিলির সঙ্গে আমার কথা আছে। তাই না মিলি?' ভাবছে বিলি, যদি ওর ক্ষমতা প্রয়োগ করে মিলিকে কাছে টেনে নিয়ে আসা যেত, তাই করত!

'যা বলার এখানেই বলো। কোথাও নিয়ে যেতে পারবে না,' আদেশ দিল রবিন।

মিলির চোখের দিকে তাকাল বিলি। মুখটা রয়েছে ছায়ার মধ্যে। দেখা যায় না কিছু। সে চোখে কিসের খেলা চলছে বুঝতেও পারল না সেজন্যে। 'তুমি কি আসবে?'

'বললাম তো, ও তোমার সঙ্গে কোথাও যাবে না,' রবিন বলল।

বাধ্য হয়ে আবার পর্দার দিকে ঘুরল বিলি। এত কাছে থেকে মাত্র ছোট্ট একটা ভাবনা দিয়েই শেষ করে দিতে পারে ওকে। চিৎকার করে শাসাল, 'দেখো, ইচ্ছে করলে এক্ষুণি তোমাকে খতম করে দিতে পারি আমি!'

'আমিও তোমার মাথায় গুলি করতে পারি। কাপড়ের ভেতর দিয়ে দেখতে পাচ্ছি তোমাকে।' বরফের মত শীতল কণ্ঠে আদেশ দিল রবিন,

'তোমাকে তিন সেকেন্ড সময় দিচ্ছি বেরিয়ে যাওয়ার জন্যে।...এক...'

'অনেক হয়েছে!' চিৎকার করে উঠল বিলি। 'অনেক সহ্য করেছি তোমাদের জ্বালাতন! গোয়েন্দা বলে এতদিন বজ্র ছুঁড়ে মারিনি। কিন্তু ইচ্ছে করলেই পারি সেটা, বিশ্বাস করো।'

'দুই!' গুণল রবিন।

ঠিক এই সময় বিলির সামনে চলে এল মিলি। বাধা হয়ে দাঁড়াল দুজনের সামনে।

অবাক হলো না বিলি। যেন জানত, মিলি আসবে।

'থামো, রবিন!' পর্দার দিকে তাকিয়ে চিৎকার করে উঠল মিলি। 'আর একটা কথাও বোলো না!'

বলেই বিলির দিকে ঘুরল সে। এখন ওর চোখ দেখতে পাচ্ছে বিলি। পানি টলমল করছে সেচোখে। দেখে তার নিজের চোখেও পানি চলে এল : এই তো চেয়েছিল সে। একজনের দুঃখে আরেকজন কাঁদবে। কষ্ট পাবে। অবশেষে তাকে বুঝতে পারল মিলি। বুঝল, সে ওকে কতটা চায়।

তারপর শুনতে পেল সেই কথাটা, যেটা শোনার জন্যে গত কয়েকটা মাস অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করেছে সে।

মিলি বলল, 'ঠিক আছে, আমি তোমার সঙ্গে যাব। যেখানে যেতে বলো, সেখানেই যাব। কিন্তু কারও কোন ক্ষতি কোরো না, প্লীজ!'

'করব না,' কথা দিল বিলি। 'তুমি যা বলবে তাই করব আমি, মিলি।'

মনে হতে লাগল ওর জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ মুহূর্ত এটা।

কিন্তু বাদ সাধল রবিন। বলল, 'যা বলার এখানেই বলো, আমাদের সামনে। এখান থেকে মিলিকে বেরোতে দেব না আমরা। আমি একা নই। মুসা আর কিশোরও আছে আমার সঙ্গে। যত শক্তিশালীই হও, তিনজনের সঙ্গে কোনমতেই পারবে না তুমি, বিলি।'

জ্বলে উঠল বিলির চোখ। ভাবল, গাধাগুলো জানে না আমার শক্তির খবর। তিনজনকে মুহূর্তে ধোঁয়া বানিয়ে উড়িয়ে দিতে পারি কল্পনাও করতে পারছে না।

তাড়াতাড়ি বিলির আরও কাছে চলে এল মিলি। মাথা নেড়ে চিৎকার করে উঠল, 'না না, বিলি! চলো, আমি তোমার সঙ্গে যাব। ওদের কথা শুনব না।'

ওর একটা হাত শক্ত করে চেপে ধরল বিলি। বিদ্যুৎ প্রবাহিত হয়ে গেল মনে হলো মিলির শরীরে। হাসল বিলি। লজ্জা পাওয়া শিশুর হাসি। 'চলো। এসো।'

মিলির কোমর জড়িয়ে ধরে আস্তে আস্তে দরজার দিকে পিছাতে শুরু করল বিলি। চোখ রবিনের দিকে। গুলি করে কিনা দেখছে। নিরাপদেই বেরিয়ে এল কেবিন থেকে। লাগিয়ে দিল দরজাটা। তারপর নবের দিকে তাকিয়ে একটা মনো-বাণ ছাড়ল। মুহূর্তে গলে গেল ধাতু। বিকৃত, অকেজো হয়ে গেল তালাটা।

কেবিনের মধ্যে আটকা পড়ল রবিন। বিলি দরজা লাগিয়ে দিতেই পর্দার

আড়াল থেকে বেরিয়ে এল। ডান হাতের তর্জনীর দিকে তাকাল একবার। যেটা পর্দায় ঠেসে ধরে পিস্তলের নল বুঝিয়ে ধোঁকা দেয়ার চেষ্টা করেছিল বিলিকে।

দরজার নবের অবস্থা দেখে হতবাক হয়ে গেল সে। মোচড় দিয়ে খোলার ব্যর্থ চেষ্টা করল একবার। বুঝল, হবে না। এগিয়ে গিয়ে টিপে ধরল একটা বোতাম। ইমার্জেন্সি বাটন। টিপলেই তাড়াহুড়ো করে ছুটে আসবে নার্স।

পনেরো

বাইরে পার্কিং লটের বাতাস কনকনে ঠাণ্ডা। তাজা। পরিষ্কার। যেন মুক্তির গন্ধ মিশে রয়েছে তাতে। হঠাৎ করেই এই অন্ধকার রাতটা এক ধরনের অদৃশ্য আলোয় ভরে উঠল যেন, অনুভব করল বিলি। আলোটা আলো নয়, এক ধরনের আনন্দ। বিচ্ছুরিত হচ্ছে মিলির কাছ থেকে। ওর হৃৎপিণ্ডের ধুকপুকানি বুকে কান না লাগিয়েও ডাক্তারের স্টেথো দিয়ে শোনার মত শুনতে পাচ্ছে সে। ওর মগজের পাগল হয়ে ওঠা বিদ্যুৎ-তরঙ্গও স্পষ্ট অনুভব করতে পারছে।

ও আমাকে ভালবাসে, ভাবল বিলি।

'জীবনে তুমিই একমাত্র ভাল ব্যবহার করলে আমার সাথে,' মিলিকে বলল সে। নিজের কণ্ঠ শুনে নিজেই অবাক হয়ে গেল। এতটা উষ্ণ আর কোমল কণ্ঠস্বর যে ওর গলা দিয়েও বেরোতে পারে, ভাবেনি কোনদিন। রাগ চলে গেছে। মানুষ খুনের ঘটনাগুলো যেন এখন দূর অতীতের ধোঁয়াটে দুঃস্বপ্ন। ওসব ভুলে যেতে চায় সে। ওগুলোর কথা আর মুহূর্তের জন্যেও মনে করতে চায় না।

'সেই প্রথম যেদিন তোমার সঙ্গে ক্লাসে দেখা হলো আমার, মনে আছে?' জিজ্ঞেস করল বিলি। 'সবুজ একটা ফ্রক পরেছিলে তুমি। বড় বড় হলুদ ফুল। কি সুন্দরই না লাগছিল তোমাকে।' ছেলেমানুষের মত হেসে উঠল সে। 'তখনই বুঝে গিয়েছিলাম, তোমাকে ছাড়া আমার চলবে না। নামেও কি মিল, দেখছ? মিলি! বিলি!'

মিলির হাতটা কাঁপছে, টের পেল বিলি। নিশ্চয় শীতে, ভাবল সে।

'কোথায় যাচ্ছি আমরা?' দুর্বল কণ্ঠে জানতে চাইল মিলি। 'কোথায় নিয়ে যাচ্ছ আমাকে?'

তাই তো! এই প্রথম মনে পড়ল বিলির, কোথায় নিয়ে যাচ্ছে ওকে? কখনও তো ভেবে দেখেনি। একটাই চিন্তা ছিল, কোনমতে মিলিকে হাসিল করা। সেটা করেছে। এখন কোথায় নিয়ে গিয়ে তুলবে?

'তা তো জানি না,' জবাব দিল সে। 'তুমি যেখানে যেতে চাও, সেখানেই নিয়ে যাব। যে কোন দোকানের ক্যাশ মেশিন থেকে সহজেই টাকা

বের করে নিতে পারব আমি। যে কোন গাড়ি জোগাড় করতে পারব। তুমি শুধু মুখ ফুটে বলো একবার।'

সামনে একসারি গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। ওগুলোর দিকে হাত তুলে বলল, 'দেখো। কোনটা পছন্দ? ওই অ্যাকর্ডটা? ম্যাক্সিমা?' ঘুরে তাকাল মিলির দিকে। 'কোনটা পছন্দ?'

কিন্তু মোটেও খুশি মনে হলো না মিলিকে।

ওর হাত ছেড়ে দিল বিলি। পাশে হাঁটতে হাঁটতে বলল, 'জাপানী গাড়ি পছন্দ না হলে অন্য দেশ দেখি? টরাসটা কেমন মনে হচ্ছে? কিংবা ওই ফোর্ডটা?'

ফোর্ড গাড়িটার দিকে শুধু তাকিয়ে থেকেই ওটার এঞ্জিন চালু করে ফেলল সে। গাড়ির উজ্জ্বল হেডলাইটের আলোয় চকচক করতে লাগল ভেজা চত্বরটা।

আনমনে মাথা নাড়তে লাগল সে। নাহ্, এসব গাড়ি তার নিজেরই পছন্দ হচ্ছে না। মিলির জন্যে আরও ভাল কিছু চাই। একটা মার্সিডিজ দরকার। কিংবা ফেরারি।

'দুর্গন্ধ ছড়াচ্ছে এগুলো,' নাক কুঁচকে বলল বিলি। 'চলো অন্য কোনখানে চলে যাই। ভাল গাড়ি খুঁজে বের করতে হবে। আপাতত এখান থেকেই কোন একটা নিয়ে কাজ চালানো যাক।'

হঠাৎ নতুন একজোড়া হেডলাইটের আলো ঘুরে এসে পড়ল ওদের গায়ে। কয়েক গজ এগিয়ে থেমে গেল গাড়িটা। পুলিশের গাড়ি। লাফ দিয়ে সেটা থেকে নেমে এলেন শেরিফ রবার্টসন। হাসপাতাল থেকেই তাঁকে ফোন করে দিয়েছে কিশোর।

এটা কোন সমস্যাই নয় বিলির কাছে। ফুঁ দিয়ে উড়িয়ে দিতে পারে শেরিফকে। 'ভয় পেয়ো না, মিলি। চুপ করে খালি দেখো, লোকটার কি করি আমি।'

জবাব না পেয়ে মিলি কোথায় আছে দেখার জন্যে ঘুরে তাকাল সে।

কিন্তু মিলি নেই ওর পাশে। প্রাণপণে ছুটছে। দেখতে দেখতে পার্কিং লট থেকে বেরিয়ে চলে গেল অন্যপাশের ঘাসে ঢাকা মাঠে।

'না! মিলি! যেয়ো না!' চিৎকার করে উঠল বিলি।

ওর স্বপ্ন হাতছাড়া হয়ে যাচ্ছে। চলে যাচ্ছে দূরে। সইতে পারছে না সে। নিজেকে বড় একা মনে হতে লাগল আবার।

★

'অ্যাই বিলি, দাঁড়াও! নড়বে না বলে দিলাম!' যেন মানুষ নয়, একটা পাগলা কুত্তার উদ্দেশে ধমকে উঠলেন শেরিফ।

কিন্তু দাঁড়াল না বিলি। বুনো জানোয়ারের মত ঘুরে দৌড় মারল। নজর অনেক সামনে। পলকের জন্যে দেখল একটা ঝোপ পার হয়ে গিয়ে ঘন জঙ্গলে লুকিয়ে পড়ছে মিলি।

কোথায় যাচ্ছে, নিজেও জানে না মিলি। একটাই চিন্তা, ওই দানবটার

কাছ থেকে সরে যেতে হবে যত দূরে পারা যায়। বাঁচতে হলে ওর দৃষ্টির আড়ালে থাকতে হবে। অন্ধকার রাত। কুয়াশা পড়ছে। বনের মধ্যে আরও বেশি অন্ধকার। এখানে হয়তো ওকে দেখতে পাবে না বিলি। কিন্তু বলা যায় না কিছু। দেখার অলৌকিক চোখও থাকতে পারে ওর, কে জানে!

ঠিক এই সময় ঝোপের ভেতর থেকে লাফ দিয়ে এসে পড়ল একটা ছায়ামূর্তি। ওকে জাপটে ধরল। চিৎকার করতে যাচ্ছিল মিলি। মুখ চেপে ধরল সাঁড়াশির মত কঠিন আঙুল। হিড়হিড় করে টেনে নিয়ে গেল ওকে ঘন ঝোপের মধ্যে।

কোনমতে মুখ ঘুরিয়ে তাকাল মিলি। ভেবেছিল বিলির জ্বলন্ত চোখে চোখ পড়বে। কিন্তু তার বদলে অস্পষ্ট একটা অবয়ব ফুটতে দেখল আকাশের পটভূমিতে। চুলগুলো যেন কেমন। চেহারার কিছুই বোঝা গেল না। দানবের হাত থেকে ভূতের খপ্পরে এসে পড়ল নাকি!

ফিসফিস করে বলল ভূতটা, 'ভয় পেয়ো না, মিলি! আমি মুসা। একদম চুপ করে থাকবে। টুঁ শব্দ কোরো না। কাছাকাছিই আছে ও।'

ঝোপের মধ্যে মিলিকে নিয়ে ঘাপটি মেরে বসে রইল মুসা। মাঠ পেরিয়ে আসতে দেখল বিলিকে।

ওকে আর রবিনকে কেবিনে পাহারায় রেখে কিশোর চলে যাওয়ার পর মুসা গিয়ে দাঁড়িয়েছিল কেবিনের বাইরে। অন্ধকার ছায়ায় গা মিশিয়ে বিলির আসার অপেক্ষা করছিল। রবিন ভেতরে, সে বাইরে, দুজন দুই জায়গায় থেকে পাহারা দিচ্ছিল।

বিলি যখন মিলিকে নিয়ে বেরিয়ে গেল, নিঃশব্দে পিছু নিয়েছিল ওর। ওকে পরাস্ত করার জন্যে সুযোগ খুঁজছিল। কোন উপায় দেখেনি। যে লোক শুধুমাত্র ইচ্ছা-শক্তির সাহায্যে একজন মানুষকে মুহূর্তে শেষ করে দিতে পারে, তার সঙ্গে সামনাসামনি লাগতে যাওয়া চরম বোকামি। সেই বোকামি করেনি মুসা। সুযোগের অপেক্ষায় ছিল।

মিলি যখন বিলির কাছ থেকে সরে যেতে শুরু করল, ওকে সাহায্য করার জন্যে পিছে পিছে ছুটল মুসা। অবশ্যই গাছপালা আর ঝোপের আড়ালে থেকেছে। সাবধান ছিল, বিলির চোখে যাতে না পড়ে···

'মিলি! মিলি!' ডাকছে আর শিশুর মত ফোঁপাচ্ছে বিলি। 'কোথায় তুমি? সাড়া দাও। প্লীজ। আমি তোমার কোন ক্ষতি করব না। মাথায় তুলে রাখব। মিলি! মিলি!'

আরও কাছে চলে এল সে। কাঁদতে লাগল।

কিন্তু তাকে শান্ত করার জন্যে ঝোপে থেকে বেরোল না মিলি। ওই দানবের সামনে যেতে চায় না আর। ওর কাছে গেলে ওর কথা মানতে হবে। সেটা মানা সম্ভব নয় মিলির পক্ষে। না মানলে ধৈর্য হারিয়ে এক সময় না এক সময় রেগে উঠবে বিলি। মায়াদয়ার বালাই না রেখে তখন ধ্বংস করে দেবে ওকেও।

'কি চাই তোমার, মিলি?' কাঁদতে কাঁদতে বলছে বিলি। 'যা চাও তাই

দেব! সব দেয়ার ক্ষমতা আছে আমার।'

কুয়াশার চাদর ভেদ করে জ্বলে উঠল একটা আলোক রশ্মি। টর্চ। কঠিন কণ্ঠে আদেশ দিলেন শেরিফ, 'অ্যাই, ঘোরো এদিকে! তোমার কি হয়েছে জানি না আমি। তবে কয়েকটা প্রশ্নের জবাব চাই।'

'আমি কোন প্রশ্নের জবাব দেব না!' চিৎকার করে বলল বিলি। 'বরং আমার কথার জবাব চাই। ও কোথায়? মিলি কোথায়?'

গাছের মাথা কাঁপিয়ে দিয়ে যেন ঝাঁপিয়ে এসে পড়ল একঝলক ঝোড়ো বাতাস।

আকাশের দিকে তাকিয়ে আবার চিৎকার করে উঠল বিলি, 'জবাব দিচ্ছ না কেন আমার কথার? কোথায় আছে ও? খুঁজে বের করো! জলদি!'

মেঘ ছড়িয়ে পড়েছে আকাশে। ঘন ঘন বিদ্যুৎ চমকানো শুরু হলো।

কিশোর এসে দাঁড়াল শেরিফের পাশে। হাতে উদ্যত পিস্তল। ফিসফিস করে বলল, 'কোন কিছু করতে যাবেন না এখন, শেরিফ। চোখের পলকে মেরে ফেলবে আপনাকে ও।'

কিন্তু রোখ চেপে গেছে শেরিফের। 'ওর শয়তানির নিকুচি করি আমি! তুমি সরো!'

ওদের কারও দিকেই আর নজর নেই এখন বিলির। আকাশের দিকে তাকিয়ে চিৎকার করেই চলেছে। মেঘের কাছে, বাতাসের কাছে, বিদ্যুতের কাছে ওর প্রশ্নের জবাব চাইছে। বার বার একই কথা জিজ্ঞেস করছে--মিলি কোথায়? মিলি কোথায়? মিলি কোথায়?

রাগে হাত মুঠো করে ওপর দিকে তুলে ঝাঁকাতে লাগল সে। কিন্তু মেঘ ওর প্রশ্নের জবাব দিতে পারল না। ক্রমেই রেগে যাচ্ছে বিলি। আক্রোশ গিয়ে পড়ল বনের ওপর। ওই গাছই মিলিকে আড়াল করে রেখেছে।

মনকে আদেশ দিল সে। ভয়াবহ বজ্র-বাণ ছুটে গিয়ে আঘাত হানল একটা গাছের মাথাকে। গ্রেনেড ফাটার মত বিস্ফোরণ ঘটল যেন। আগুন লেগে গেল গাছের মাথায়। কয়েকটা ডাল ফেটে চৌচির হয়ে গোড়া ভেঙে ঝুপঝুপ করে পড়ল মাটিতে।

আরেকটা গাছের মাথায় আগুন ধরিয়ে দিল বিলি। তারপর আরেকটা। আকাশের দিকে তাকিয়ে আবার চিৎকার করতে লাগল। বদ্ধ উন্মাদ হয়ে গেছে যেন।

ওর সঙ্গে পাল্লা দিয়ে আকাশও যেন খেপে উঠতে লাগল। ফুলে উঠল মেঘ। বাতাসের বেগ বেড়ে গেল। বিদ্যুৎ চমকাতে লাগল ঘনঘন। বিকট শব্দে বাজ পড়ল।

মহা খেপা খেপেছে যেন আজ দুই দানব। একজন মাটিতে। আরেকজন আকাশে। দুটোতে মিলে প্রলয় কাণ্ড ঘটিয়ে ছাড়বে। তছনছ করে দেবে বেচারা হিলটাউন শহরটাকে।

তাজ্জব হয়ে এই কাণ্ড দেখছেন শেরিফ। কিন্তু বেশিক্ষণ চলতে দেয়া যায় না এসব। মহাক্ষতি করে দেবে তাহলে বিলি। পিস্তল তুলে আচমকা গর্জে

উঠলেন, 'বিলি, থামো! থামো বলছি! নইলে গুলি করব বলে দিলাম!'

ফিরে তাকাল বিলি। বিদ্যুতের আলোয় বাঘের চোখের মত জ্বলছে ওর দুই চোখ।

পিস্তল হাতে এগিয়ে গেলেন শেরিফ। বিলিকে হাতকড়া পরানোর ইচ্ছে।

কিন্তু তাঁর সে ইচ্ছে আর পূরণ হলো না। হঠাৎ গুঙিয়ে উঠে বুক চেপে ধরলেন। পিস্তলটা পড়ে গেল হাত থেকে। টলে পড়ে যাচ্ছেন। ধরার জন্যে ছুটে গেল কিশোর।

ঠিক এই সময় বাজ পড়ল। প্রচণ্ড শব্দে থরথর করে কেঁপে উঠল বন, পাহাড়, মাটি। চোখের কোণ দিয়ে পলকের জন্যে দেখতে পেল কিশোর, আকাশ থেকে তীব্র নীল একটা আগুনের শিখা ছুটে এসে লাগল বিলির মাথায়।

ষোলো

লস অ্যাঞ্জেলেস স্টেট সাইকিয়াট্রিক হাসপাতালের চওড়া করিডরে দাঁড়িয়ে আছে কিশোর। দরজায় লাগানো অভঙ্গুর কাঁচের মধ্যে দিয়ে বিলি ফক্সের সেলের ভেতরে তাকাল। ছোট্ট ঘর। টেলিভিশনের দিকে চেয়ে আছে বিলি। ভাবলেশহীন চেহারা। শূন্য দৃষ্টি। বোঝা যাচ্ছে অনুষ্ঠান দেখছে না। দেখার মত অবস্থাও নাকি নেই ওর। সেদিনকার সেই বিদ্যুৎ-ঝড় ওর মনকে ধুয়ে মুছে সাফ করে দিয়েছে। এটা অবশ্য ডাক্তারদের কথা।

কিশোর এই রায় বিশ্বাস করতে রাজি নয়। বিলির মাথায় বাজ পড়তে দেখেছে নিজের চোখে। সঙ্গে সঙ্গে মরে যাওয়ার কথা ওর। মাটিতে পড়ে গিয়েছিল ঠিকই, কিন্তু মরেনি। কয়েক মিনিটের জন্যে অবশ হয়ে গিয়েছিল হাত-পা। নড়াচড়া করেনি। সেই সুযোগে মাথায় পিস্তলের বাড়ি মেরে ওকে বেহুঁশ করেছিল মুসা। শেরিফের গাড়ি থেকে দড়ি এনে হাত-পা বেঁধে ফেলেছিল।

হিলটাউন কমিউনিটি হাসপাতালের ইমারজেন্সি ওয়ার্ডে রেখে কয়েক ঘণ্টা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার পর ডাক্তাররা তাকে এখানকার হাসপাতালে পাঠিয়ে দিলেন। সেটা দুদিন আগের কথা।

আজকে তার সঙ্গে কথা বলতে এসেছে তিন গোয়েন্দা। কিন্তু কিশোরের ধারণা, ও ওদের সঙ্গে কথা বলতে চাইবে না। তবুও এসেছে। যদি বলে।

দেখা করার অনুমতির জন্যে একজন নার্সকে ডাক্তারের কাছে পাঠিয়ে অপেক্ষা করছে কিশোর, এই সময় পায়ের শব্দে ফিরে তাকিয়ে দেখে ডক্টর এলিজা আসছে।

'কখন এলেন?'

'এই তো, পনেরো মিনিট।'

'বিলিকে দেখতে নিশ্চয়?'

মাথা ঝাঁকাল এলিজা। এখানে বিলিকে আনার পর থেকেই দিনে কয়েকবার করে এসে তাকে দেখে যাচ্ছে সে। 'তোমরা?'

'আমরাও দেখা করতে। অনুমতি পাওয়ার অপেক্ষা করছি।'

দরজার কাঁচের ভেতর দিয়ে বিলিকে দেখল এলিজা। আবার কিশোরের দিকে ফিরল। 'করোনারের সঙ্গে কথা হয়েছে আমার। শেরিফ রবার্টসনের মৃত্যুটাকে দুর্ঘটনা বলে রায় দিয়েছেন তিনি।'

'বজ্রপাতে মৃত্যু?'

মাথা ঝাঁকাল এলিজা। 'ডিস্ট্রিক্ট অ্যাটর্নির সঙ্গেও কথা বলেছি। কেসটা কিভাবে সাজাবেন বুঝতে পারছেন না তিনিও।'

'যে টেস্টগুলো করাতে বলেছিলাম, করিয়েছেন?'

'করিয়েছি?'

'কি বুঝলেন?'

'সব ঠিক আছে। ইলেকট্রোলাইট, ব্লাড গ্যাস লেভেল, ব্রেন ওয়েভ···সব আর দশজন সাধারণ মানুষের মত।'

'অস্বাভাবিক কোন কিছু নেই শরীরে? কিছুই না?'

দীর্ঘ একটা মুহূর্ত কিশোরের দিকে তাকিয়ে রইল এলিজা। 'কি করে এটা আন্দাজ করেছিলে, বলো তো?'

'করাটাই স্বাভাবিক···এরকম অদ্ভুত ক্ষমতার অধিকারী সচরাচর হয় না কোন মানুষ। বিদ্যুৎ হজম করতে পারে কেউ কেউ, কিন্তু পাচার করতে পারে বলে শুনিনি কখনও।'

দ্বিধা করতে লাগল এলিজা। অকারণে কেশে গলা পরিষ্কার করল। তারপর বলল, 'ডাক্তারি শাস্ত্রে এটা বিস্ময়কর এক ঘটনা। মানুষের দেহযন্ত্রে বিদ্যুৎ উৎপাদনের ক্ষমতা! যে যন্ত্র দিয়ে কাজটা করেছে বিলি, সেটা দেখতে অনেকটা বৈদ্যুতিক বান মাছের বিদ্যুৎ উৎপাদক যন্ত্রের মত। জন্ম থেকেই হয়তো ছিল ওটা ওর শরীরে। জন্মের সময় খুব ছোট ছিল, অক্ষম, ধীরে ধীরে বড় হয়েছে। বজ্রপাতের পর কোনভাবে চার্জ হয়ে গেছে ওটা।···প্রকৃতির আশ্চর্য খেয়াল! ওকে নিয়ে ভালমত গবেষণা করা দরকার।'

হাসি ফুটল কিশোরের মুখে। বিলির দিকে তাকাল। 'ডাক্তাররা যতই বলুক সব ধুয়ে মুছে গেছে, বিলির ক্ষমতা কিন্তু নষ্ট হয়ে যায়নি।'

ভুরু কোঁচকাল এলিজা। 'কি করে বুঝলে?'

'টেলিভিশনের দিকে তাকালেই বুঝতে পারবেন।'

ঘুরে গেল তিন জোড়া চোখ।

একের পর এক চ্যানেল পরিবর্তন হচ্ছে টেলিভিশনের।

এলিজা বলল, 'কিছু তো বুঝতে পারছি না।'

'চ্যানেল পরিবর্তন হচ্ছে, সেটা দেখছেন?'

'হ্যাঁ, কিন্তু এতে···'

'কি দিয়ে বদলাচ্ছে ও? রিমোট তো হাতে নেই।'

এতক্ষণে মুসা আর রবিনও লক্ষ করল, রিমোটটা টেলিভিশনের ওপরেই ফেলে রাখা হয়েছে। বেশ খানিকটা দূরে বসে পর্দার দিকে তাকিয়ে আছে বিলি।

চোখ বড় বড় হয়ে গেল এলিজার। 'ঠিক থাকাটা তো ভয়ঙ্কর ব্যাপার! ওর এই ক্ষমতা নষ্ট না করে না দিলে তো আবার শুরু করবে শয়তানি।'

'দেখুন চেষ্টা করে, পারেন কিনা? তাহলে আবার স্বাভাবিক মানুষ হয়ে যাবে বিলি।'

'যা-ই বলো, ওর সঙ্গে তোমাদের দেখা করতে যাওয়া উচিত হবে না মোটেও! তোমরা ওর এক নম্বর শত্রু। প্রতিশোধ নেয়ার জন্যে কখন কি করে বসে...'

ফিরে এল নার্স। যাকে অনুমতির জন্যে পাঠিয়েছিল কিশোর।

অনুমতি পাওয়া যায়নি। ওদের দেখলে খেপে উঠতে পারে বিলি, ডাক্তারেরও এটাই ধারণা।

এলিজা বলল, 'আমি ইচ্ছে করলে অনুমতি এনে দিতে পারি। কিন্তু আবারও বলছি, উচিত হবে না।'

দরজার বাইরে থেকেই বিলির সঙ্গে কথা বলার শেষ চেষ্টা করল কিশোর। চিৎকার করে ওর নাম ধরে ডাকল।

সাড়া দিল না বিলি। মুখও তুলল না। একভাবে তাকিয়ে আছে টেলিভিশনের দিকে। কিশোর ডাকাডাকি শুরু করলে একটা পরিবর্তনই শুধু ঘটল, টেলিভিশনের চ্যানেল বদলানো বন্ধ হয়ে গেল।

দুই সহকারীর দিকে ফিরল কিশোর। নিরাশ ভঙ্গিতে মাথা নেড়ে বলল, 'হবে না। কথা বলবে না ও। চলো, যাই। আর কিছু করার নেই আমাদের এখানে।'

★

'একটা কথা বুঝতে পারছি না,' মুসা বলল। বাসে করে রকি বীচে ফিরছে ওরা। 'ছোঁয়া না লাগিয়েই বিদ্যুৎ পাচার করে কিভাবে বিলি?'

'প্রচণ্ড ইচ্ছাশক্তি। কিংবা টেলিপ্যাথি জাতীয় কিছু। টেলিপ্যাথিকে একধরনের রিমোট কন্ট্রোল সিসটেম বলতে পারো।...দেখা যাক, বেঁচে যখন আছে ও, গবেষণাতেই বেরিয়ে পড়বে।'

'ওর ব্যাপারটাকে টেলিপ্যাথি নাম দিলে ভুল হবে,' রবিন বলল, 'টেলিভোলটেজ হলে কেমন হয়?'

'মন্দ না।'

***

মায়াজাল

প্রথম প্রকাশ: সেপ্টেম্বর, ১৯৯৮

রবিনের টোকার সাড়া দিল না সোফি।

পাশে দাঁড়ানো মারলার দিকে তাকাল রবিন। আবার টোকা দিল দরজায়। জবাব নেই এবারেও। উঁকি দিয়ে দেখল রান্নাঘরের টেবিলে ঘাড় গুঁজে বসে আছে সোফি। অবাক হলো। দরজা ঠেলে ভেতরে ঢুকল।

সোফির সামনে টেবিলে বিছানো একটা পত্রিকা। লস অ্যাঞ্জেলেস টাইমস্।

'কি হয়েছে, সোফি?' জিজ্ঞেস করল মারলা। 'খবর সব ভাল তো?'

জবাব দিল না সোফি। দু'হাতে গাল চেপে ধরে তেমনি ভঙ্গিতে বসে আছে। অতিমাত্রায় আবেগপ্রবণ ও, জানা আছে মারলার। তবু অবাক লাগল। আচরণটা স্বাভাবিক নয়।

সোফির পেছনে এসে পিঠে হাত রাখল রবিন, 'খুব খারাপ কিছু?'

গাল থেকে হাত সরিয়ে মুখ তুলে তাকাল সোফি। চোখ লাল। কোন কথা না বলে কাগজের নিচ থেকে গোলাপী রঙের একটা খাম বের করল। বাড়িয়ে ধরল সেটা। হাত কাঁপছে।

'কি এটা?' বলতে বলতে খামটা নিল রবিন। মুখ খোলা। ভেতর থেকে বের করল একটা চিঠি। অদ্ভুত চিঠি। লিখেছে:

শোনো,

তোমার ধারণা তুমি আমাকে চেনো। আসলে চেনো না। হয়তো ভাবছ আমি তোমার বন্ধু। না, তা-ও নই। আমি তোমার তত্ত্বাবধায়ক। তোমার ভালমন্দ দেখাশোনার দায়িত্ব এখন থেকে আমার। মন দিয়ে শোনো।

এই চিঠির নিচে একসারি নাম দেখতে পাচ্ছ। সবার ওপরে রয়েছে তোমার নামটা। তুমি যে আমার বাধ্য আছ তার ছোট্ট একটা প্রমাণ দিতে হবে। তারপর তোমার নামটা সারির ওপর থেকে কেটে পাশের তারকাচিহ্নের যে কোনও এককোণার ভেতরে লিখে দেবে। একবার তারকায় ঢুকে যেতে পারলে আর চিন্তা নেই, ওখানেই থাকবে তুমি, বেরোনোর প্রয়োজন হবে না।

সাবধান: আবার বলছি—তারকার কোণায় লিখবে, ভুলেও মাঝখানে নয়। তাহলে সেটাকে তোমার অবাধ্যতা ধরে নেব আমি। মারাত্মক বিপদে পড়বে। আমার কথামত কাজ সেরে তোমার পরের নামটা যার চিঠিটা তার কাছে পাঠিয়ে দেবে। তোমাকে কি করতে হবে সেই নির্দেশ পাবে টাইমস

পত্রিকার বিজ্ঞাপনের পাতায় একটা বক্সের মধ্যে। তারকাচিহ্ন আঁকা থাকবে বিজ্ঞপ্তির ওপর। সুতরাং চিনতে অসুবিধে হবে না কোনটা তোমার জন্যে। অক্ষরগুলো সব উল্টোভাবে লেখা থাকবে—যেমন dog-কে লেখা হবে god। ঠিকমত সাজিয়ে নিলেই পেয়ে যাবে আসল বাক্যটা। চিঠি পাওয়ার তিনদিনের মধ্যে অবশ্যই তোমাকে তোমার বাধ্যতা প্রমাণ করতে হবে।

তালিকায় বাকি যাদের নাম আছে ইচ্ছে করলে তাদের সঙ্গে আলোচনা করে নিতে পারো। বাধা নেই। আমার ধারণা, আমার মতই ওরাও তোমার বন্ধু নয়, মুখে যতই 'বন্ধু বন্ধু' করুক। তালিকার বাইরে কারও সঙ্গে এ ব্যাপারে আলাপ করবে না। যদি করো, রেগে যাব আমি।

একটা কথা পরিষ্কারভাবে জেনে রাখো, তোমাদের গোপন কথাটা জানি আমি। কিন্তু সেটা নিয়ে মাথাব্যথা নেই আমার। পুলিশকে জানাতে যাব না।

আমার কথার অবাধ্য হলে মারাত্মক পরিণতি অপেক্ষা করবে তোমার জন্যে। ভয়ঙ্করভাবে মৃত্যু ঘটবে তোমার।

—তোমাদের তত্ত্বাবধায়ক।

সোফি
ড্যানিয়েল
মারলা
ক্লডিয়া
মুসা

চিঠিটা পড়ে মারলার হাতে দিল রবিন।

মারলা পড়ে বলে উঠল, 'দূর, যত্তোসব ছাগলামি। কেউ রসিকতা করেছে।' দলামোচড়া করে ফেলে দিতে যাচ্ছিল, বাধা দিল রবিন, 'দাঁড়াও। দেখি, দাও তো। আরেকবার পড়ে দেখি।'

'পড়ে দেখার কিচ্ছু নেই,' রাগ করে বলল মারলা। 'যে পাঁচজনের নাম আছে এটাতে, তাদের কেউই পাঠিয়েছে ভয় দেখানোর জন্যে। ক্লডিয়া হতে পারে।'

'কেন, ড্যানিয়েল নয় কেন?' ভুরু নাচাল রবিন।

'হ্যাঁ, ড্যানিয়েলও হতে পারে।' রবিনের দিকে তাকাল মারলা। 'বাজে রসিকতার অভ্যাস আছে ওদের দুজনেরই। ফেলো ওটা। অ্যাই সোফি, গুম হয়ে বসে না থেকে ওঠো তো। চলো, বার্গার খেয়ে আসি মলে গিয়ে। কিছু কেনাকাটাও আছে আমার।'

'যাও তোমরা। আমি বাড়ি যাব। সোফি, বইটা দাও তো, কাল যেটা এনেছিলে। পড়া শেষ হয়নি আমার।'

ওদের কথা যেন কানেই ঢুকল না সোফির। ফিসফিস করে বলল, 'উড়িয়ে দিয়ো না ব্যাপারটাকে। পত্রিকায় বিজ্ঞাপনও কিন্তু দিয়েছে। এই দেখো।'

পড়ে ভুরু কুঁচকে গেল রবিনের। তত্ত্বাবধায়ক লিখেছে:

বৃহস্পতিবারের মধ্যে তোমার কুকুরছানাটাকে
পানিতে চুবিয়ে মারো, সোফি।

বিরক্ত হয়ে মুখ বাঁকাল রবিন, 'হুঁ, বললেই হলো। ফাজলেমি পেয়েছে। পাত্তাই দিয়ো না এসবে।'

বিজ্ঞাপনটার দিকে তাকিয়ে ধীরে ধীরে মাথা দুলিয়ে বলল মারলা, 'এ কাজ ক্রুডিয়া ছাড়া আর কারও নয়। কারণ ও মানসিক রোগী।'

'কিন্তু রোগী হলেও ক্রুডিয়া জন্তু-জানোয়ার অপছন্দ করে না,' রবিন বলল। 'ও নিজে যখন কুত্তা পালে সোফির কুকুরটাকে মারতে বলবে, এ কথা বিশ্বাস হচ্ছে না আমার। আর বললেই বাচ্চাটাকে মেরে ফেলবে না একথাও জানে ক্রুডিয়া। ভয়টা আসলে দেখাতে চেয়েছে অন্য কেউ।'

আরেকবার চিঠিটার দিকে তাকাল রবিন। টাইপরাইটারে টাইপ করা। বিড়বিড় করে বলল, 'তত্ত্বাবধায়ক আসলে কি চাইছে বুঝতে পারছি না...'

রেগে উঠল মারলা, 'এর মধ্যে বোঝাবুঝির কি আছে? স্রেফ ভয় দেখানোর জন্যে করেছে এই কাজ। সোফি ভয় পাচ্ছে ভেবে এখন নিশ্চয় একা একাই হেসে গড়াগড়ি খাচ্ছে। ফেলো ওটা, ফেলে দাও। সোফি, ওঠো তো। চলো।'

চেয়ারে বসল রবিন। চিঠির নামগুলোর দিকে তাকিয়ে থেকে বলল, 'মুসার নামও আছে। কিন্তু আমারটা নেই কেন?'

'কিশোরেরও তো নেই। তাতে কি হয়েছে?'

'কিশোরের না থাকার একটা যুক্তি আছে। ও এখন রকি বীচে নেই। তা ছাড়া সেদিন রাতে আমাদের সঙ্গে গাড়িতেও ছিল না। কিন্তু আমি তো গাড়িতেও ছিলাম, বাড়ি থেকেও চলে যাইনি। আমারটা নেই কেন?'

'তোমার কথা ভুলে গেছে আরকি। সেজন্যেই তো বলছি, রসিকতা।'

গম্ভীর হয়ে ভাবছে রবিন। তার বিশ্বাস, রসিকতা করেনি তত্ত্বাবধায়ক। যা করতে বলেছে, সত্যিই চায় সেটা করা হোক। নইলে বিপদ ঘটাবে। ওদের 'গোপন কথা' জানে বলে কি বোঝাতে চেয়েছে? মরুভূমিতে ওরা যে অ্যাক্সিডেন্টটা করে এসেছে সেটার কথা? এ ছাড়া আর তো কোন গোপনীয়তা নেই ওদের।

কনসার্ট শুনতে গিয়েছিল সেদিন ওরা। চিঠিতে যাদের নাম রয়েছে, সবাই গিয়েছিল। দিন পনেরো আগে পাঁচটা টিকেট এসেছিল ডাকে। কে পাঠিয়েছে জানা যায়নি। সকাল বেলা যার যার বাড়ির ডাকবাক্সে খামের মধ্যে একটা করে টিকেট পেয়েছে সবাই। সেই সঙ্গে একটা করে নোট। তাতে কার কার কাছে টিকেট পাঠানো হয়েছে, নাম লেখা ছিল। অবিকল একই ধরনের নোট পেয়েছে সকলেই।

ভেবেছে ওদেরই কোন বন্ধু মজা করার জন্যে একাজ করেছে। পরে বলে চমকে দেবে। কোনকিছু সন্দেহ না করে কনসার্ট দেখতে গিয়েছিল ওরা মরুভূমির কাছে একটা শহরে।

রাতের বেলা মরুভূমির মাঝের রাস্তা দিয়ে আসার সময় বাজি ধরে হেডলাইট নিভিয়ে গাড়ি চালাতে গিয়েছিল ড্যানি। অন্ধকারে দেখতে পায়নি লোকটাকে। একটা তীক্ষ্ণ বাঁক পেরোতেই করল অ্যাক্সিডেন্ট। কিভাবে যে চাকার নিচে এসে পড়ল লোকটা বলতেও পারবে না সে। গায়ের ওপর দিয়ে গাড়ি চালিয়ে দিয়েছিল। মারা গিয়েছিল লোকটা। পরিচয় জানার জন্যে অনেক চেষ্টা করেছে ওরা। পকেটে মানিব্যাগ ছিল না, আইডেন্টিটি ছিল না, ভিজিটিং কার্ড ছিল না লোকটার। সে যে কে, জানার কোন উপায় ছিল না। ওকে নিয়ে কি করা যায়, একেকজন একেক কথা বলা শুরু করল। কেউ বলল পুলিশকে জানাতে, কেউ করল বিরোধিতা। পুলিশকে জানাতে গেলে বিপদে পড়ার ভয়ে শেষে মরুভূমির মাঝেই লোকটাকে কবর দিয়ে এসেছে ওরা। এ কাজে মুসা আর রবিনের একেবারেই মত ছিল না। ড্যানির আতঙ্কিত অবস্থা দেখে আর অনুরোধ ঠেকাতে না পেরে শেষে চুপ হয়ে গেছে।

রবিনের দিকে তাকাল মারলা। 'তুমিও মনে হয় চিঠিটাকে সোফির মত সিরিয়াসলি নিয়েছ?'

'হ্যাঁ, না নিয়ে উপায় নেই। আমাদের গোপন কথা জানে বলেছে। আর গোপন কথাটা যে কি, সেটা তুমিও জানো,' উঠে দাঁড়াল রবিন। 'মুসা আর ড্যানির সঙ্গে কথা বলতে হবে।'

'কুডিয়াই বা বাকি থাকে কেন তাহলে?' মারলা বলল। 'আমি নিজে তাকে ফোন করে জানিয়ে দেব যে তার চিঠিটা পেয়ে পেটে মোচড় দেয়া শুরু হয়ে গেছে আমাদের। হেসে আরও গড়াগড়ি খাক।'

মারলার ব্যঙ্গতে কান দিল না রবিন। চিঠিটা নিয়ে গিয়ে রাখল ফোনের পাশে। রিসিভার তুলে ডায়াল করল।

বাড়িতে নেই মুসা। ওর বাবা-মাও নেই। বেড়াতে গেছেন। আরও অন্তত এক হপ্তার আগে ফিরবেন না। বাড়িতে একা থাকে মুসা। অ্যানসারিং মেশিনে মেসেজটা রেখে ড্যানির নম্বরে ডায়াল করল রবিন। তাকেও পাওয়া গেল না। আবার অ্যানসারিং মেশিনে মেসেজ রাখতে হলো। তারপর খানিকটা দ্বিধা করেই কুডিয়াদের বাড়ির নম্বরে ফোন করল। সে-ও বাড়িতে নেই। এই ছুটির সময়টায় কাউকে পাওয়া যায় না। সবাই যেন বাড়ি ছাড়ার জন্যে অস্থির হয়ে ওঠে। অগত্যা ওখানেও অ্যানসারিং মেশিনে মেসেজ রাখতে হলো।

রিসিভার নামিয়ে রেখে এসে বলল রবিন, 'কারও ফোন না আসা পর্যন্ত ভাবছি এখানেই বসে থাকব।'

'কি যে বলো না,' মুখ বাঁকাল মারলা। 'ফালতু একটা চিঠির জন্যে ঘরে বসে থাকব? সারাটা দিন নষ্ট! ঠিক আছে, তোমাদের ইচ্ছে হলে থাকো। আমি যাচ্ছি।' হাত বাড়াল রবিনের দিকে, 'গাড়ির চাবিটা দাও। মলে আমাকে যেতেই হবে।'

'চুপ করে বসে থাকো তো!' কিছুটা কড়া স্বরেই বলল রবিন। 'তোমাদের চাপে পড়ে একটা বোকামি তো করেই এসেছি সেদিন

মরুভূমিতে। আর কোন কথা শুনছি না। গোপন কথা জানে যদি না বলত, পাত্তা দিতাম না। আমাদের দলের বাইরের কেউ যদি হয়ে থাকে, জেল খাটিয়ে ছেড়ে দিতে পারবে। ব্লেকমেইল করে ঘুম-খাওয়া হারাম করে দিতে পারবে। এখন আমাদের সবার একসঙ্গে থাকা দরকার। কিছু ঘটলে একসঙ্গে সেটাকে ঠেকানোর ব্যবস্থা করতে হবে।'

হাল ছেড়ে দিয়ে নিরাশ ভঙ্গিতে একটা চেয়ারে বসে পড়ল মারলা। 'অহেতুক দুশ্চিন্তা করছ তোমরা, আমি বলে দিলাম।'

'তোমার কথা সত্যি হলে তো বাঁচি।'

এই সময় রান্নাঘরে ঢুকল সোফির কুকুরছানাটা। কাছে এসে আদর করে মনিবের হাত চাটতে শুরু করল। ওর মাথায় হাত বুলিয়ে দিল সোফি। মুখে উদ্বেগের হাসি।

'যে যতই বলুক আর ভয় দেখাক,' দৃঢ়কণ্ঠে বলল সে, 'টমিকে আমি চুবিয়ে মারতে পারব না।'

'প্রশ্নই ওঠে না,' তার সঙ্গে সুর মেলাল রবিন। আরেকবার তাকাল অদ্ভুত চিঠিটার দিকে। 'দেখাই যাক না, কি করতে পারে সে!'

দুই

বাড়ি থেকে বেরিয়ে মলে চলে এল মুসা। সেরাতে মরুভূমির ঘটনাটার পর মন প্রায় সময়ই খারাপ থাকে। খারাপ হয়ে আছে মনটা। খিদেও পেয়েছে। কিশোর নেই, নাহলে স্যালভিজ ইয়ার্ডে গিয়ে আড্ডা দিতে পারত। রবিনও থাকছে ব্ল্যাক ফরেস্টে ওদের গোস্ট লেনের বাড়িতে।

রোদের মধ্যে গাড়িটা পার্ক করে রেখে একটা খাবারের দোকানে ঢুকল সে। আগে খেয়ে নেয়া যাক। তারপর ভাববে কোথায় যাবে। ম্যাকডোনাল্ডের তৈরি চিকেন বার্গার, পটেটো ফ্রাই আর কোকের অর্ডার দিল সে। এই দোকানে পার্ট টাইম চাকরি করে সোফি। ওকে না দেখে ক্যাশিয়ারকে জিজ্ঞেস করল সোফির কথা। ক্যাশিয়ার বলল, ডিউটি শেষ করে চলে গেছে সোফি। সেদিন আর আসবে না।

খাবারগুলো নিয়ে গুড-লাক ফাউনটেইনের পাশের টেবিলটায় এসে বসল মুসা। বিরাট হাঁ করে বার্গারে কামড় বসাল। চমৎকার বানায়। ওর খুব পছন্দ। মজা করে চিবাতে চিবাতে তাকাল ঝর্নাটার দিকে। ওটার পানিতে পয়সা ছুঁড়ে দিয়ে কোন কিছু চাইলে নাকি ইচ্ছে পূরণ হয়। পকেট থেকে একটা পয়সা বের করে ছুঁড়ে মারল সে। আস্তে করে গিয়ে অস্থির পানির নিচের ছোট গোল বেদিটাতে পড়ল পয়সাটা। ওখানে ফেলা খুব কঠিন কাজ। চাইবার মত কোন কিছু এ মুহূর্তে মনে পড়ল না মুসার। শেষে বলল, 'আমার মনটা ভাল হয়ে যাক।'

'বাহ্, দারুণ হাত তো তোমার। সাংঘাতিক নিশানা,' মেয়েলী কণ্ঠের হালকা হাসি মেশানো কথা শুনে ফিরে তাকাল মুসা।

পাশের টেবিলে বসে আছে এক অপূর্ব সুন্দরী তরুণী। একেবারে সিনেমার নায়িকাদের মত সুন্দরী। ঝলমলে সোনালি চুল। বড় বড় চোখের মণি সবুজ। ঠোঁটে টুকটুকে লাল লিপস্টিক। খাড়া তীক্ষ্ণ নাক। পরনে নার্সের সাদা পোশাক। কফি খেতে খেতে ম্যাগাজিন পড়ছিল। মুসার চোখে চোখ পড়তে মিষ্টি করে হাসল। মাথা নেড়ে ঠোঁট উল্টে বলল, 'কাজ হবে না। রোজই পয়সা ফেলি আমি। কোন চাওয়াই পূরণ হয় না আমার। হয় চাওয়াটা ঠিকমত হয় না, নয়তো মাত্র একটা পয়সা ফেলি বলে মন ওঠে না ঝর্নার।'

মুসাও হাসল। 'এক পয়সায় ঝর্নার মন না উঠলে সিকি ফেলে দেখতে পারেন। বেশি ঘুষ পেলে আপনার ইচ্ছে পূরণ করেও দিতে পারে।'

অনিশ্চিত ভঙ্গিতে মাথা নাড়ল মেয়েটা। ঠোঁট ওল্টাল। 'যার পয়সায় হয় না, তার সিকিতে কেন, লক্ষ ডলারেও হবে না। ইচ্ছা পূরণ হওয়ার কথা সব ফালতু। আমি আসলে পয়সা ফেলি হাতের নিশানা পরখ করার জন্যে। বেদিটাতে ফেলতে চাই। একদিনও পারিনি।'

'রোজ আসেন কেন?'

'লাঞ্চ করতে। কাছেই চাকরি করি আমি। হাসপাতালে।'

'নার্স?'

'বলে বটে নার্স, কিন্তু কাজ কবায় অন্য,' মুখ বাঁকাল মেয়েটা। 'আজ সকাল থেকে খালি টেস্ট টিউবে রক্ত নিয়েছি মানুষের।'

'চাকরিটা মনে হয় পছন্দ না আপনার?'

'নাহ! এগুলো কোন কাজ নাকি?'

'করেন কেন?'

'সময় কাটানোর জন্যে।...তুমি কি করো? হাই স্কুলে পড়ো নিশ্চয়?'

মাথা ঝাঁকাল মুসা।

'ভবিষ্যতে কি করার ইচ্ছে?'

'ইচ্ছে তো হয় অনেক কিছুই। একেকবার একেকটা। কখনও মনে হয় টীচার হব, কখনও মনে হয় দূর, ছেলে পড়িয়ে কি লাভ? তারচেয়ে মেকানিক হওয়া অনেক ভাল...'

হাসল মেয়েটা, 'ডিসাইড করা মুশকিল, তাই না? তোমার বার্গার ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে। অতিরিক্ত বকবক করি আমি। আমি এখান থেকে না গেলে আর খেতে পারবে না।'

আধখাওয়া বার্গারটা কখন প্লেটে নামিয়ে রেখেছিল মুসা, ভুলে গিয়েছিল। তুলে নিল আবার। হঠাৎ খেয়াল করল, মনটা আর আগের মত খারাপ নেই। কথা বলতে বলতে ভাল হয়ে গেছে।

'না না, আপনি বসুন। খেতে খেতেও কথা বলতে পারি আমি। আমার কোন অসুবিধে হয় না।...আপনার নামটাই কিন্তু জানা হলো না এখনও।'

'ক্রিসি,' পাশে কাত হয়ে হাত বাড়িয়ে দিল মেয়েটা। 'তোমার?'

'মুসা আমান,' বার্গারের শেষ টুকরোটা প্লেটে রেখে ক্রিসির হাত ধরে ঝাঁকিয়ে দিল মুসা। 'পরিচিত হয়ে খুশি হলাম।'

'এসব গতবাঁধা কথা ন্যাকা ন্যাকা লাগে আমার।'

হাসল ক্রিসি। দাঁতগুলো সাদা হলেও ঠিক স্বাভাবিক নয়, সামান্য বাঁকা। তবে দেখতে খারাপ লাগে না। মুসাকে জিজ্ঞেস করল, 'তোমাকে কোথাও দেখেছি। কোথায়, বলো তো?'

পত্রিকায় হতে পারে, ভাবল মুসা। ওদের স্কুলের বাস্কেটবল টীমকে জিতিয়ে দিয়ে হিরো হয়ে গিয়েছিল সে। বলল, 'কি জানি। দেখেছেন হয়তো কোনখানে। এখানেও হতে পারে। রোজ আসেন যেহেতু। এখানকার বার্গার আমার খুব পছন্দ।'

'হ্যাঁ, তাই হবে,' অনিশ্চিত ভঙ্গিতে ভ্রূকুটি করল ক্রিসি। 'তোমার ঘাড়ে কি হয়েছে? নাকি সমস্যাটা মেরুদণ্ডে?'

অবাক হলো মুসা। 'কি করে বুঝলেন?'

'ঘাড় যেভাবে শক্ত করে রাখছ।'

'খেলতে গিয়ে ব্যথা পেয়েছি। বেশি নড়াতে গেলেই খচ করে লাগে।'

'ডিপ-টিস্যু ম্যাসাজ নিয়ে পড়াশোনা করছি আমি। হাসপাতালে কাজ করায় প্র্যাকটিসের সুযোগও পেয়ে গেছি। এই ম্যাসাজে রোগীর সাংঘাতিক আরাম হয়। ব্যথা চলে যায়।'

'শুধু ম্যাসাজেই?' বিশ্বাস করতে পারছে না মুসা।

'হ্যাঁ,' হাতব্যাগ থেকে একটা কাগজ বের করে খসখস করে ফোন নম্বর আর ঠিকানা লিখে মুসার দিকে বাড়িয়ে দিল ক্রিসি। 'এটা রাখো। ব্যথা বাড়লে যদি প্রয়োজন মনে করো আমাকে ফোন কোরো। বাসায় চলে এলেও বিরক্ত হব না।'

কাগজটা সাবধানে পকেটে রাখতে রাখতে হাসল মুসা, 'গিনিপিগ বানাতে চান?'

'সত্যি কথা বলব?' ঘাড় কাত করল ক্রিসি, 'চাই। সব ধরনের রোগীর ওপরই পরীক্ষা চালাতে চাই আমি। এরকম মালিশে কোন্ কোন্ ব্যথা আরাম হয়, জানাটা জরুরী। ভবিষ্যতে নার্সের চাকরি ছেড়ে ম্যাসাজ পার্লার খুলে বসব।'

'বলা যায় না, চলেও আসতে পারি একদিন। মাঝে মাঝে ব্যথাটা যা বাড়ে…কি ম্যাসাজ বললেন?'

'ডিপ-টিস্যু।' ঘড়ি দেখল ক্রিসি। 'বাপরে, অনেক দেরি করে ফেললাম।' উঠে দাঁড়াল সে। 'তোমার সঙ্গে কথা বলে ভাল লাগল, মুসা…'

'গতবাঁধা কথা। ন্যাকা ন্যাকা।'

হেসে ফেলল ক্রিসি। 'শোধটা নিয়েই নিলে। চমৎকার কাটল সময়টা। সত্যি ভাল লাগল।…বিকেলের পর আর বেরোই না আমি। তোমার ম্যাসাজ দরকার হলে ওই সময়টায় এসো।'

ঘাড় কাত করল মুসা।

মিষ্টি একটা হাসি দিয়ে বেরিয়ে গেল ক্রিসি। চোখ ফিরিয়ে প্লেটের দিকে তাকাতেই দেখতে পেল খানিকটা খাবার পড়ে রয়েছে। অবাক লাগল। হলো কি আজ ওর? খাওয়ার কথা ভুলে যাচ্ছে বার বার?

তিন

ড্যানিদের বাড়ির ড্রাইভওয়েতে সবে থেমেছে মুসা, তার পেছন পেছনই ঢুকল ড্যানির গাড়িটাও।

এগিয়ে গেল মুসা। ড্যানি গাড়ি থেকে নামতেই বলল, 'তার মানে বাড়ি ছিলে না। ভালই হলো, দেরি করে এসেছি। বসে থাকতে হলো না।'

ড্যানি জানতে চাইল, 'ছিলে কোথায়? ফোন করে পাওয়া যায় না···'

ড্যানিয়েল হার্বার, মুসার ক্লাসফ্রেন্ড। সব সময় হাসিখুশি থাকে। মাথায় ঘন চুলের বোঝা। নাকের ডগাটা মোটা। বড় বড় কানের দিকে ভালমত লক্ষ করলে চেহারাটা যেন কেমন মনে হয়। কালো দুই চোখে তীক্ষ্ণবুদ্ধির ছাপ। পড়াশোনায় ভাল; অ্যারোনটিক্যাল এঞ্জিনিয়ারিং পড়ার ইচ্ছে।

'মলে গিয়েছিলাম,' মুসা জানাল। 'বাড়িতে রান্না করে খেতে ইচ্ছে করছিল না।'

গাড়ির সীটে ফেলে রাখা একটা বাদামী কাগজে মোড়া বাক্স বের করল ড্যানি। খাবারের প্যাকেট। আরেকটা ঠোঙাও তুলে নিয়ে বলল, 'এসো।'

সামনের দরজা খুলে ভেতরে ঢুকল সে। মুসা ঢুকল পেছনে। লিভিংরুমে ঢুকে এদিক ওদিক তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'জয় কোথায়?'

ড্যানির ছোট বোন জয়। সাত বছর বয়েস। ভীষণ ভালবাসে ওকে ড্যানি।

'আছে।'

'একা ফেলে গিয়েছিলে!'

ড্যানির বাবা-মা বাড়ি নেই, জানে মুসা। ছেলে-মেয়েকে রেখে তাঁরাও বেড়াতে গেছেন।

'কি করব?' কৈফিয়ত দেয়ার ভঙ্গিতে বলল ড্যানি। 'পেছনের উঠানে একটা পাখি কুড়িয়ে পেয়েছে। বেড়ালে বোধহয় ডানা ভেঙে ফেলেছে ওটার। তুলে এনে সেবাযত্ন শুরু করল। আমাকে হুকুম করল, জলদি দোকানে গিয়ে পাখির দানা নিয়ে এসো। ওকে সঙ্গে নিতে চাইলাম। বলে, ও না থাকলে নাকি পাখিটা মরে যাবে।'

লিভিংরুমে ঢুকল জয়। ভাইয়ের বড় বড় কান পায়নি, তবে নাকটা পেয়েছে। চুলের রঙও এক রকম। দুজনের একই স্বভাব—কথা বলার সময় অনবরত হাত নেড়ে নেড়ে নানা রকম ভঙ্গি করতে থাকে।

ভীষণ উত্তেজিত হয়ে আছে জয়। এগিয়ে এসে ভাইয়ের হাত থেকে ঠোঙাটা প্রায় কেড়ে নিল। মুসার দিকে তাকিয়ে বলল, 'মুসাভাই, ভাইয়া

তোমাকে পাখিটার কথা বলেছে? জানালার নিচে পড়ে ছিল।'

'বলেছে,' হেসে জবাব দিল মুসা। 'সেবাযত্ন করে নাকি অর্ধেক ভাল করে ফেলেছ।'

'বাচ্চা তো। কষ্ট বেশি সেজন্যে।' ঠোঙার মুখ খুলে ভেতরে তাকাল জয়। ভাইকে জিজ্ঞেস করল, 'বাচ্চা পাখির দানা এনেছিস তো?'

'দানা তো এক রকমই রাখে দোকানে,' ড্যানি বলল। 'বড় পাখি যা খায় ছোটগুলোও তাই খায়। আমার মনে হয় না খাবারের তফাত বুঝতে পারে ওরা।'

'পারে না মানে? নিশ্চয় পারে! দাঁড়া, দেখে আসি খায় নাকি। নাহলে আবার যেতে হবে তোকে দোকানে। দোকানদারকে কড়া করে বলবি যাতে বাচ্চার দানা দেয়।' দৌড়ে চলে গেল জয়।

'খাইছে! যদি সত্যি না খায়?'

'কি আর করব?' শঙ্কিত ভঙ্গিতে চুলে হাত চালাল ড্যানি। জোরে একটা নিঃশ্বাস ফেলল। 'যেতেই হবে আবার। কিন্তু সত্যি কি বাচ্চা পাখি আর বুড়ো পাখিদের খাবার আলাদা?'

'মনে হয় না। কখনও খেয়াল করিনি।'

মুসাকে নিজের বেডরুমে নিয়ে এল ড্যানি। ঢুকেই দেখল অ্যানসারিং মেশিনের লাল আলোটা টিপটিপ করছে।

এগিয়ে গেল ড্যানি। রিসিভার তোলার জন্যে হাত বাড়িয়ে বলল, 'বাড়ি ফিরেই যখন দেখি কেউ আমার খোঁজ করছিল, ভাল লাগে খুব। নিশ্চয় কোন বন্ধু।'

'যদি ইনশুয়ারেন্সের দালাল হয়?'

'ওরা কখনও মেসেজ রাখে না। হুট করে বাড়িতে ঢুকে একেবারে সামনে এসে দাঁড়ায়। ভাল করেই জানে, বলেকয়ে এলে কাউকে পাবে না। কেউ ওদের সামনে যাবে না। বাড়িতে থাকলেও নেই বলে দেবে। তবু মনে যখন করিয়ে দিয়েছ, সাবধান হওয়াই ভাল। বলা যায় না...'

প্লে করল ড্যানি। একটামাত্র মেসেজ। রবিন করেছে। বেশ উদ্বিগ্ন মনে হচ্ছে ওর কণ্ঠ। বলেছে, ড্যানি যখনই ফিরুক, সঙ্গে সঙ্গে যেন সোফিদের বাড়িতে ফোন করে।

অবাক হয়ে মুসার দিকে তাকাল ড্যানি। মুসাও অবাক। জবাব দিতে পারল না। কোনমতে বলল, 'ওই ব্যাপারটা নিয়ে কিছু নয় তো?'

'কোন...' ঢোক গিলল ড্যানি। বুঝে ফেলেছে। ভয়ে ভয়ে তাকাল মুসার দিকে। 'আমার ফোন করতে ভয় লাগছে। কি জানি কি শুনব! প্লীজ, তুমি করো!'

মুসাও দ্বিধা করতে লাগল। 'ঠিক আছে, করছি।' কাঁপা হাতে রিসিভার তুলে নিয়ে কানে ঠেকাল।

একবার রিঙ হতেই রিসিভার তুলে নেয়ার শব্দ পেল মুসা। জবাব দিল সোফি, 'হালো?'

'মুসা। রবিন আছে?'
'আছে।'
'কি হয়েছে, সোফি?'
'রবিনকে দিচ্ছি,' কথা বলতেও যেন কষ্ট হচ্ছে সোফির, 'ওর কাছেই শোনো।'
রিসিভার হাত বদল হওয়ার অপেক্ষা করতে লাগল মুসা।
'কোত্থেকে বলছ, মুসা?' জানতে চাইল রবিন।
'ড্যানিদের বাড়ি থেকে।'
'ড্যানি আছে?'
'আছে। আমার পাশেই দাঁড়িয়ে আছে। কি হয়েছে?'
দ্বিধা করতে লাগল রবিন। 'কিভাবে শুরু করব বুঝতে পারছি না।'
বুকের মধ্যে কাঁপুনি শুরু হয়ে গেছে মুসার। নিশ্চয় মরুভূমির ব্যাপারটাই। 'বলে ফেলো।'
'মুসা?'
'বলো না। শুনছি তো।'
লম্বা একটা মুহূর্ত চুপ করে রইল রবিন। 'মুসা, কে জানি একটা অদ্ভুত চিঠি পাঠিয়েছে।'
'কি বললে?' রবিনের কথাটা যেন বুঝতে পারেনি মুসা।
'অদ্ভুত একটা চিঠি। না দেখলে বুঝবে না।'
'মরুভূমির কথা কিছু লিখেছে?'
'পরিষ্কার করে বলেনি। তবে মনে হয় ওই কথাটাই বলতে চেয়েছে। ড্যানিকে জিজ্ঞেস করো তো, ও আমাদের ভয় দেখানোর জন্যে লিখেছে কিনা?'
'ও কেন দেখাবে? করল তো ও-ই।'
'তবু...'
'আচ্ছা, করছি!' জিজ্ঞেস করল মুসা, 'ড্যানি, সোফিকে ভয় দেখানোর জন্যে কোন চিঠি লিখেছ?'
ভুরু ওপরে উঠে গেল ড্যানির. 'না তো!'
'সত্যি?'
'মিথ্যে বলব কেন?'
'না, কোন চিঠিটিঠি লেখেনি,' রবিনকে জানাল মুসা।
'ঠিক বলছে তো?'
ড্যানির দিকে তাকিয়ে আছে মুসা। উদ্বিগ্ন লাগছে ড্যানিকে। 'না, বলছে না। চিঠিটা পড়ো তো শুনি।'
পড়ে শোনাল রবিন। কোন পোস্ট অফিসের সিল আছে জানাল। মুসা চুপ করে থাকায় জিজ্ঞেস করল, 'মুসা, শুনছ?'
'হ্যাঁ।' ঢোক গিলল মুসা। বুকের দুরুদুরু আরও বেড়েছে।
'চিঠির কথামতই পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দিয়েছে,' রবিন জানাল। 'সাঙ্কেতিক

ভাষায়। লিখেছে: সোফির কুকুরের বাচ্চাটাকে ওর নিজের হাতে চুবিয়ে মারতে হবে। বৃহস্পতিবারের মধ্যে।'

দম বন্ধ করে ফেলল মুসা। 'বলো কি!'

'মুসা, কেউ জোক করেনি তো? ক্লডিয়া? কিংবা অন্য কেউ?'

'কি জানি। জিজ্ঞেস না করে বলি কিভাবে। ওকে ফোন করেছিলে?'

'নাহ্। ভাবলাম তুমি করলেই ভাল হয়। তোমার সঙ্গে খাতির বেশি।'

'বেশি আর কই...'

'তবু...'

'ঠিক আছে। করব।'

'মুসা, নামের সারিতে আমার নামটা নেই।'

'তাই নাকি?'

'ইন্টারেস্টিং, তাই না?'

'না, ডেঞ্জারাস! সোফি আবার ভাবছে না তো তুমি লিখেছ?'

'না, ভাবছে না।'

ভাবনা চলেছে মুসার মাথায়। চিঠিতে যে কজনের নাম লেখা আছে, সবার এই বিপদের জন্যে ড্যানি দায়ী। গাড়িটা সে চালাচ্ছিল। আহাম্মকি করতে গিয়ে অ্যাক্সিডেন্টটা করেছে।

'মুসা?'

'বলো।'

'খুব মুষড়ে পড়েছে সোফি।'

'পড়বেই। প্রথম পরীক্ষাটা ওকেই দিতে হবে। জোক, না সত্যি, এটা আগে ওকেই প্রমাণ করতে হবে। কুকুরের বাচ্চাটাকে না মারলে হয়তো সত্যি সত্যি বিপদে পড়তে হবে তাকে। এখনও কিছুই বলা যাচ্ছে না কি ঘটবে!'

'ডিসাইড করতে পারছে না ও কি করবে।'

'পারা সম্ভবও নয়। ঠিক আছে, আমি এখনই ক্লডিয়াকে ফোন করছি। দেখি কি বলে?'

'যা বলে জানিয়ো। তাড়াতাড়ি। ওকে না পেলেও জানিয়ো। রাখব?'

'রাখো।'

লাইন কেটে দিয়ে ড্যানিকে সব জানাল মুসা।

গম্ভীর হয়ে গেল ড্যানি। পায়চারি শুরু করল। ফিরে তাকিয়ে বলল, 'ক্লডিয়া যদি না লিখে থাকে তো ভয়ের কথা। বাইরের কেউ লিখেছে। অ্যাক্সিডেন্টের কথাটা জানে। জানল কি করে?'

'সেটা পরেও ভাবা যাবে। ক্লডিয়াকে ফোন করে দেখো আগে কি বলে।'

আবার রিসিভার কানে ঠেকাল মুসা।

ফোন ধরলেন মিসেস নিউরোন, ক্লডিয়ার আম্মা। জানালেন, কয়েকজন বন্ধুর সঙ্গে পর্বতের ওদিকে বেড়াতে চলে গেছে সে। তাঁকে ধন্যবাদ দিয়ে

ফোন রেখে দিল মুসা।

'কি বলল?' মুসার একেবারে গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে আছে ড্যানি।

'বেড়াতে চলে গেছে। ইয়োজিমাইটে। বৃহস্পতিবারের আগে ফিরবে না।'

'হুঁ,' চিন্তিত ভঙ্গিতে আবার পায়চারি শুরু করল ড্যানি। ধপ করে বসে পড়ল বিছানায়। 'মুসা, কি মনে হয় তোমার? ক্লডিয়াই একাজ করেছে?'

'কি জানি। তবে না করার সম্ভাবনাই বেশি। কেন করবে? সে নিজেও এতে জড়িত। পুলিশকে না জানানোর জন্যে চাপাচাপিটা সে-ই বেশি করেছিল। সে নিজে যে ব্যাপারে ভয়ে অস্থির, সেটা বলে সোফিকে ভয় দেখানোর কথা ভাবাটাই অর্থহীন। তা ছাড়া রবিন বলল, খামের ওপর লোকাল পোস্ট অফিসের সিল মারা। ক্লডিয়া গেছে সাতদিন আগে। চিঠিটা এসেছে আজকে। যদি সত্যিই ও লিখে থাকত, ইয়োজিমাইট পোস্ট অফিসের সিল থাকত।'

'তা ঠিক। আচ্ছা, সোফি, মারলা আর রবিন মিলে আমাদের সঙ্গে রসিকতা করছে না তো? ভয় দেখানোর জন্যে?'

রবিনের উদ্বিগ্ন কণ্ঠ কানে বাজতে লাগল মুসার। 'উঁহু! রবিন তো এ ধরনের রসিকতা করবেই না। সোফি আর মারলাও করবে না। তা ছাড়া ক্লডিয়ার মতই ওদেরও করার কোন যুক্তি নেই।'

'সেটাই তো কথা। তাহলে?'

উঠে জানালার কাছে গিয়ে দাঁড়াল ড্যানি। বাইরে তাকাল। 'ভাল এক ঝামেলায় পড়তে যাচ্ছি আমরা। তত্ত্বাবধায়ক—কি অদ্ভুত নাম! নির্ঘাত লোকটা উন্মাদ। বিকৃত মস্তিষ্ক। ভয়ানক নিষ্ঠুর। নইলে একটা কুকুরের বাচ্চাকে চুবিয়ে মারার কথা কল্পনাও করতে পারত না।'

'তোমার কি ধারণা সোফি সত্যি বিপদের মধ্যে আছে? আমার ফোনের অপেক্ষা করছে ওরা। একটা কিছু বলতে হবে।'

মলিন হাসি হাসল ড্যানি। 'বাচ্চাটাকে মেরে ফেললে অবশ্য সোফির আর কোন রকম বিপদের আশঙ্কা থাকে না।'

'তা থাকে না। কিন্তু ওকাজ কি আর করা যায় নাকি!'

'যায় না। আমি হলে অন্তত পারতাম না। বলো, ক্লডিয়া বেড়াতে গেছে। ওর সঙ্গে কথা বলা যায়নি। কিংবা বলতে পারো, আমাদেরও অনুমান চিঠিটা ক্লডিয়াই লিখেছে। সবার মুখ থেকে এক কথা শুনলে সোফি খানিকটা নিশ্চিন্ত হতে পারবে।'

'তা পারবে না। ও নিশ্চিত হতে চাইবে।'

জানালার কাছ থেকে ফিরে এসে মুসার মুখোমুখি দাঁড়াল ড্যানি। 'একটা কথা বলি?'

'বলো।'

'এভাবে সর্বক্ষণ একটা দুশ্চিন্তা আর মানসিক চাপের মধ্যে না থেকে পুলিশের কাছে চলে যাই। সব খুলে বলি। আমার একার জন্যে তোমাদের

সবাইকে এভাবে ভোগানোর...'
'অনেক দেরি করে ফেলেছি। সোজা নিয়ে গিয়ে জেলে ভরবে পুলিশ এখন। তা ভরুক...তবে ভাবছি, পুলিশের কাছে যাওয়ার আগে সবার সঙ্গে একবার কথা বলা দরকার। সবাই যখন এতে জড়িত, সবার একসঙ্গে বসে আলোচনারও দরকার আছে।'
'তাহলে তো ক্রুডিয়াকেও থাকতে হবে মীটিঙে। কবে আসছে ও?'
'বললাম না বৃহস্পতিবার।'
'সোফিকে কবে পর্যন্ত সময় দিয়েছে তত্ত্বাবধায়ক?'
'বৃহস্পতিবার।'
'তারমানে কুকুরের বাচ্চাটাকে না মারলেও বৃহস্পতিবার পর্যন্ত বেঁচে থাকছে সোফি। তাহলে আর অত চিন্তার কিছু নেই। তত্ত্বাবধায়ক কিছু ঘটানোর আগেই মীটিঙে বসার সময় পাচ্ছি আমরা।'

চার

ওদের জন্যে বৃহস্পতিবারটা এল আর গেল কোন রকম নতুনত্ব না নিয়ে ক্রুডিয়া ফিরল না। অতএব আলোচনায় বসাও আর হলো না।
সারাদিন সোফির সঙ্গে কাটাল মারলা। মলে কেনাকাটা করল। সিনেমা দেখতে গেল। সারাটা দিন মোটামুটি শান্তই রইল সোফি। রাত বারোটা পর্যন্ত তার সঙ্গে সঙ্গে রইল মারলা। রাতেও থাকতে চেয়েছিল, কিন্তু সোফি বলল লাগবে না। তার আম্মা ফিরেছেন।
সকালে ফোন করে খবর নেবে বলে বাড়ি ফিরে গেল মারলা।
কথামত পরদিন সকালে ফোন করল সে। ভালই আছে সোফি।
খবরটা সবাইকে জানিয়ে দিল মারলা। স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল ওরা। যাক, চিঠিটা আসলেই একটা ফালতু রসিকতা ছিল।
ক্রুডিয়ার ফেরার অপেক্ষায় রইল সবাই। কিন্তু ফিরল না সে। মাকে ফোন করে জানিয়ে দিল আরও একদিন দেরি হবে।
শুক্রবার রাত।
সকাল সকাল শুয়ে পড়ল রবিন। মাথা ধরেছে। গত ক'দিন ধরে যা উত্তেজনা যাচ্ছে। শোয়ার সঙ্গে সঙ্গে ঘুমিয়ে পড়ল। নানা রকম অদ্ভুত স্বপ্ন দেখতে লাগল। কানের কাছে দমকলের ঘণ্টা শুনে যেন ঘুম ভেঙে গেল ওর। তড়াক করে লাফিয়ে উঠে বসল বিছানায়।
ফোন বাজছে। চমকে গেল। এতরাতে কে? বুকের মধ্যে হাতুড়ির বাড়ি পড়তে শুরু করল যেন ওর। কাঁপা হাতে রিসিভার তুলে কানে ঠেকাল। 'হ্যালো?'
'রবিন?'
'হ্যাঁ। কে?'

'মিসেস হল।'

ধড়াস করে এক লাফ মারল রবিনের হৃৎপিণ্ড। দম আটকে এল। 'সোফির কি হয়েছে? ভাল আছে ও?'

ফুঁপিয়ে উঠলেন সোফির আম্মা। 'জানি না। হাসপাতাল থেকে ফোন করেছিল। অ্যাক্সিডেন্ট করেছে সোফি। আমাকে এখুনি যেতে বলেছে। সোফির বাবা বাড়ি নেই। আমিও চশমাটা খুঁজে পাচ্ছি না। রবিন, আমাকে হাসপাতালে নিয়ে যেতে পারবে? এই অবস্থায় আমি গাড়ি চালাতে পারব না।'

এতটাই অস্থির হয়ে পড়েছেন মহিলা, ভুলে গেছেন বহুদূরে থাকে রবিন। গাড়িতে করে যেতেও অন্তত একটি ঘণ্টা লাগবে ওর।

'নিশ্চয় পারব,' বলল রবিন, 'তবে আমার আসতে তো অনেক সময় লেগে যাবে। তারচেয়ে মুসাকে ফোন করে দিচ্ছি, সে আপনার অনেক কাছাকাছি থাকে। আমিও আসছি। হাসপাতালে দেখা হবে।'

'আচ্ছা,' ফোঁপাতে ফোঁপাতে বললেন মিসেস হল। 'মেয়ে কেমন আছে জিজ্ঞেস করেছিলাম। কোন জবাব দিল না হাসপাতাল থেকে। ও মরে যায়নি তো?'

'না, মিসেস হল। সোফির অবস্থা সম্পর্কে এখনও শিওর না হয়তো ওরা। সেজন্যেই কিছু জানাতে পারেনি। ভাববেন না। কিচ্ছু হয়নি সোফির। কোন্ হাসপাতালে নিয়েছে?'

জেনে নিয়ে মুসাকে ফোন করল রবিন।

অবাক কাণ্ড। একবার রিঙ হতেই রিসিভার তুলে নিল মুসা। যেন তৈরি হয়ে বসেছিল ফোনের কাছে। ঘুমায়নি, ওর কণ্ঠ শুনেই বুঝতে পারল রবিন। ঘড়ির দিকে তাকাল। রাত বাজে একটা। কি করছে মুসা?

'মুসা?...রবিন। খারাপ খবর আছে।'

'সোফির?'

'তুমি কি করে জানলে?'

'অনুমান। কি হয়েছে ওর?'

'মিসেস হল ফোন করেছিলেন,' কি হয়েছে মুসাকে জানাল রবিন।

'দশ মিনিটের মধ্যেই চলে যাচ্ছি আমি।'

'তুমি খারাপ খবর শোনার জন্যে বসে ছিলে, তাই না? ঘুমাওনি কেন?'

'ঘুম আসছিল না।'

'কি মনে হয়, মুসা? সোফি কি মারা গেছে?'

ফোঁস করে নিঃশ্বাস ফেলল মুসা। 'জানি না! আজকাল আর কোন কথা ভাবতে ইচ্ছে করে না...অ্যাক্সিডেন্টটার পর থেকে...কোন কিছু বেশি ভাবলেই মাথা ধরে...'

'আমারও!'

✡

সোফি মারা গেছে!

খবরটা একই সঙ্গে শুনল ওরা তিনজন। রবিনদের গোস্ট লেনের বাড়ি থেকে হাসপাতাল অনেক দূর। তবু মুসার গাড়িটা যখন হাসপাতালের পার্কিং লটে ঢুকল, তার মিনিটখানেক পর রবিনও ঢুকল। মুসা ঠিকমতই সোফিদের বাড়িতে পৌঁছেছিল। কিন্তু প্রচণ্ড অস্থিরতার কারণে নানা রকম অঘটন ঘটিয়ে বেরোতে দেরি করে ফেলেছেন মিসেস হল।

হাসপাতালে মেয়ের খবর শুনে বেহুঁশ হয়ে গেলেন তিনি। তাড়াতাড়ি নার্সরা ইমার্জেন্সিতে নিয়ে গেল তাঁকে। রবিনের মাথা ঘুরছে। যে ডাক্তার ওদের খবরটা দিলেন, বলার ভঙ্গিতে মনে হলো মৃত্যু নয়, সাধারণ সর্দি লাগার খবর দিচ্ছেন যেন। মাঝবয়েসী ভদ্রলোক, সবুজ সার্জিক্যাল গাউনে রক্ত লেগে আছে। ইমার্জেন্সি রূমে ডিউটি করেন। সারাক্ষণ জখমী রোগী আসতেই আছে। গাড়ি দুর্ঘটনা, ছুরি মারামারি, গুলিতে আহত রোগী আসে বিরামহীনভাবে। এত দেখতে দেখতে ব্যাপারটা গা সওয়া হয়ে গেছে ডাক্তারের। মৃত্যু আর কোন প্রতিক্রিয়া করে না তাঁর মনে। কাউকে তাদের প্রিয়জনের মৃত্যুর খবর শোনাতে বিন্দুমাত্র মুখে আটকায় না আর।

'অ্যাক্সিডেন্টটা হলো কিভাবে?' হাঁটু কাঁপছে রবিনের। দাঁড়িয়ে থাকতে কষ্ট হচ্ছে।

মাথা নেড়ে বললেন ডাক্তার, 'শুনিনি। পুলিশকে জিজ্ঞেস করে দেখো।'

বোকার মত প্রশ্ন করে বসল রবিন, 'সত্যি মারা গেছে, নাকি ভুল হয়েছে আপনাদের? মানে, আমি বলতে চাইছি এখনও কোন সম্ভাবনা...ভালমত চেষ্টা করলে এখনও হয়তো বাঁচানো যায়...'

শূন্য দৃষ্টি ফুটল ডাক্তারের চোখে। 'হাসপাতালে আনার অনেক আগেই মরে গেছে। হাত ছোঁয়ানোরও সুযোগ পাইনি আমরা।'

পুলিশ চলে যাওয়ার আগেই ওদের সঙ্গে কথা বলতে হবে। মুসার দিকে তাকাল রবিন। মুখের যা ভঙ্গি করে রেখেছে মুসা, তাতে বোঝা যায় ওর মানসিক অবস্থাও সুবিধের না। তাকে নিয়ে পার্কিং লটে বেরিয়ে এল রবিন। যে অ্যাম্বুলেন্সে করে সোফিকে আনা হয়েছে, তার ড্রাইভারের সঙ্গে কথা বলছে একজন পুলিশ অফিসার।

এগিয়ে গেল রবিন। 'এক্সকিউজ মি, অফিসার,' বলল সে। 'কার অ্যাক্সিডেন্ট করা যে মেয়েটাকে এক্ষুণি নিয়ে এলেন আপনারা, আমি তার বন্ধু। ডাক্তারের কাছে শুনলাম মারা গেছে। আপনি ঘটনাস্থলে গিয়েছিলেন?'

তরুণ অফিসার। সুন্দর করে ছাঁটা বাদামী গোঁফ। নীল ইউনিফর্ম চমৎকার ফিট করেছে। গাড়ি ঘেঁষে দাঁড়িয়ে রবিনের দিকে তাকাল। ডাক্তারের মত ভাবলেশহীন মুখ নয়। অন্তত খানিকটা অনুভূতি এর আছে।

'হ্যাঁ, গিয়েছিলাম,' রবিনের বাহু স্পর্শ করল অফিসার। 'তোমার বন্ধুর জন্যে সত্যি আমি দুঃখিত। এত অল্প বয়েসেই শেষ হয়ে গেল বেচারি।'

'কিভাবে অ্যাক্সিডেন্ট করল?'

'গাছের সঙ্গে ধাক্কা লাগিয়েছিল। রাস্তার ধারের একটা অলিভ গাছ। এমন গুঁতোই মেরেছে, গাছটাও শেষ, গাড়িটাও ভর্তা।'

'ব্রেক ফেল করেছিল নাকি? না চাকা পিছলে গিয়েছিল?'

'কোনটাই না। চাকা পিছলালে ব্রেক করত। তাতে স্কিড মার্ক থাকত। ওরকম কোন চিহ্ন পাওয়া যায়নি। নেশার ঘোরে থাকলে কিংবা ঘুম পেলে অনেক সময় স্টিয়ারিঙে হাত ঠিক থাকে না। তীব্র গতির সময় স্টিয়ারিং সামান্য ঘুরলেও গাড়ি অনেক সরে যায়। রাস্তায় সামান্য পরে পরেই গাছ। গুঁতো লাগিয়েছে বোধহয় ওসব কোন কারণেই। গাড়ির অবস্থা দেখে মনে হয় ষাট মাইল বেগে ছুটছিল।'

'ধাক্কা লাগার সঙ্গে সঙ্গেই মারা গেছে?'

পায়ের ভার বদল করল অফিসার। অস্বস্তি বোধ করছে। 'কোন সন্দেহ নেই তাতে।'

'এত শিওর হচ্ছেন কি করে?'

'শুনলে ভাল লাগবে না তোমাদের।'

গোলাপী কাগজে লেখা চিঠিটা মনের পর্দায় ভেসে উঠল রবিনের। 'তবু, বলুন।'

মুখ নিচু করল অফিসার। 'দেখো, সত্যি ভাল লাগবে না।'

'আমি জানতে চাই।'

'জানালা ভেঙে বেরিয়ে গিয়েছিল ওর মাথা। গাছের ডালে গলা টান লেগে ঘাড় ভেঙেছে। প্রচণ্ড ঝাড়া লেগে...'

'বলুন? কি হয়েছিল প্রচণ্ড ঝাড়া লেগে?'

গাল চুলকাল অফিসার। 'দেখো, অ্যাক্সিডেন্টে মানুষ মারা গেলে লাশের চেহারা আর চেহারা থাকে না। তার ওপর যদি ধড় থেকে গলা ছিঁড়ে গিয়ে মাথাটা...'

আর সহ্য করতে পারল না মুসা। কপাল টিপে ধরল।

রবিনও কাঁপতে শুরু করেছে।

'আগেই বলেছিলাম তোমাদের, সহ্য করতে পারবে না,' অফিসার বলল। 'বেশ কিছুটা দূরে রাস্তার পাশের একটা ঝোপে পাওয়া গেছে ওর মাথাটা।'

পাঁচ

ব্ল্যাক ফরেস্ট পার্কে বসে আছে ওরা। পার্কটা শহরের একধারে, হাই স্কুলের পেছনে। পাশ দিয়ে বইছে গ্রে উইলো রিভার। নির্জন পার্ক। বিমর্ষ, গম্ভীর পরিবেশ।

ক্লডিয়াও এখন আছে ওদের সঙ্গে। পর্বত থেকে ফিরেছে। সেদিন সকালের ডাকে একটা চিঠি পেয়েছে ড্যানিয়েল। সোফির চিঠিটার হুবহু নকল। তফাত কেবল নামের সারিতে ওপরের নাম অর্থাৎ সোফির নামটা নেই। সাঙ্কেতিক একটা বিজ্ঞপ্তিও ছাপা হয়েছে পত্রিকায়। লিখেছে:

ছোট বোনের ডান হাত পুড়িয়ে দাও

'কে ডেকেছে এই মীটিং?' জানতে চাইল রবিন। ঘাসের ওপর পা ছড়িয়ে বসেছে। তার পাশে বসে একটা ঘাসের ডগা দাঁতে কাটছে মারলা। চেহারা ফ্যাকাসে হয়ে আছে। খবরটা শোনার পর থেকে কারোরই মন-মেজাজ ভাল নেই।

'মীটিং ডাকিনি,' ক্লডিয়া বলল। 'সবাইকে একজায়গায় হতে বলেছি যার যা ইচ্ছে বলার জন্যে।'

'লাভটা কি তাতে?'

'যদি কোন সমাধান বেরিয়ে আসে।'

'ভাল কথা,' রবিন বলল। 'তাহলে বসে আছ কেন সবাই চুপচাপ?'

'বুঝতে পারছি না কিভাবে শুরু করব।' আজকে আর উগ্র পোশাক পরেনি ক্লডিয়া, সাধারণত যেমন পরে থাকে সে। খাটো করে ছাঁটা তুষারশুভ্র চুল। চুলের রঙ আর শার্টের রঙ এক। পরনে নীল জিনস। ঠোঁটে লিপস্টিক আছে, তবে খুবই পাতলা করে লাগানো। মেকআপ নেয়নি বললেই চলে। ওর এই মেকআপ নিয়ে মারলা তো প্রায়ই ইয়ার্কি মেরে বলে এক কেজি পাউডার আর আধা কেজি লিপস্টিক না হলে ক্লডিয়ার মেকআপই হয় না। আজ সেসব প্রায় কিছুই নেই।

নড়েচড়ে বসল ড্যানি, 'এরপর আমার পালা। চিঠি এবং গোটা পরিস্থিতি সম্পর্কে যা যা জানি সেটা নিয়ে প্রথমে আলোচনা করতে পারি আমরা। তারপর করতে পারি যা জানি না সেটা নিয়ে। কেমন হয়?'

'ভাল,' নিচুস্বরে বলল মুসা। সবার কাছ থেকে সামান্য দূরে একটা গাছের গায়ে হেলান দিয়ে বসেছে। সারারাত ঘুমায়নি। এখন সকাল এগারোটা বাজে। ভঙ্গি দেখে মনে হচ্ছে কথাবার্তা শেষ হলে এখানে এই ঘাসের মধ্যে শুয়েই ঘুমিয়ে পড়বে।

'এই চিঠি এমন কেউ লিখেছে,' শুরু করল ড্যানি, 'যে আমাদের সবাইকে চেনে। আমাদের গোপন ব্যাপারটা সম্পর্কে জানে। প্রথমে ভেবেছিলাম রসিকতা করছে, কিংবা ফাঁকা বুলি ঝাড়ছে সে। কিন্তু সোফির খুন হওয়ার পর এখন বুঝতে পারছি সে সিরিয়াস। সোফিকে তত্ত্বাবধায়কই খুন করেছে।'

'কি সব ছেলেমানুষের মত কথা বলছ,' ড্যানির কথায় একমত হতে পারল না ক্লডিয়া। 'সোফি গাড়ি চালাতে গিয়ে অ্যাক্সিডেন্ট করেছে। পুলিশের মতে এটা নিছকই দুর্ঘটনা। রাতের বেলা এত জোরে গাড়ি চালালে দুর্ঘটনা ঘটতেই পারে।'

'এ ব্যাপারে আমি তোমার সঙ্গে একমত,' রবিন বলল। 'ওর মনের যা অবস্থা হয়েছিল, তাতে অন্যমনস্ক থাকাটা অস্বাভাবিক ছিল না। এর জন্যে অবশ্যই দায়ী করতে হবে তত্ত্বাবধায়ককে। তার মানে সরাসরি না হলেও পরোক্ষভাবে এই খুনের জন্যে সে-ই দায়ী।'

'কিন্তু বড় বেশি কাকতালীয়,' মেনে নিতে পারছে না ড্যানি।

'তোমার কি ধারণা অলৌকিক কোন ক্ষমতা প্রয়োগ করে সোফিকে অ্যাক্সিডেন্ট করতে বাধ্য করেছে তত্ত্বাবধায়ক?' হাত নাড়ল রবিন, 'আমি একথা বিশ্বাস করতে রাজি না।'

'কিন্তু একটা কথা তো ঠিক,' মারলা বলল, 'চিঠিতে লিখেছিল ওর কথার অবাধ্য হলে মারাত্মক পরিণতি ঘটবে। সোফি অবাধ্য হয়েছে, ওর কথামত কুকুরের বাচ্চাটাকে চুবিয়ে মারেনি, অতএব তাকে মরতে হলো। আর কি ভয়ঙ্কর মৃত্যু! ধড় থেকে মাথাই আলাদা...' কেঁপে উঠল মারলা। চোখের কোণে পানি টলমল করে উঠল। সোফির জন্যে থেকে থেকেই কাঁদছে। খুব ঘনিষ্ঠ বান্ধবী ছিল।

'বেশি নাটকীয় করে ফেলছ সবকিছু,' অত আবেগের ধার দিয়ে গেল না ক্লডিয়া। 'অ্যাক্সিডেন্ট হলে আরও কত বিকৃত হয়ে যায় মানুষের দেহ। টুকরো টুকরো হয়ে যায়, থেঁতলে ভর্তা হয়ে যায়। সেই তুলনায় এটা তো কিছুই না।'

'তা ঠিক,' একমত হয়ে মাথা দোলাল ড্যানি। 'ব্যাপারটাকে স্বাভাবিক অ্যাক্সিডেন্ট বলে ধরে নেয়াই ভাল। কারণ ওই সময় তত্ত্বাবধায়ক গাড়িতে ছিল না। থাকলে সে-ও বাঁচত না। চিঠি যখন লিখতে পারে, তখন নিশ্চিতভাবেই বলা যায় ভূত নয় সে। তোমার-আমার মতই মানুষ। আমার ধারণা, সরাসরি ও খুন করেনি সোফিকে। তবে পরোক্ষভাবে যে এই খুনের জন্যে সে দায়ী, তাতেও কোন সন্দেহ নেই।'

'আচ্ছা,' মুসা বলল, 'গাড়ির যন্ত্রপাতির মধ্যে কোন কারসাজি করে রাখেনি তো তত্ত্বাবধায়ক? যাতে ব্রেক ফেল করে...'

'ব্রেক ফেল করে মারা যায়নি সোফি।' মনে করিয়ে দিল রবিন, 'পুলিশ অফিসার কি বলল? গাছের সঙ্গে গুঁতো লাগিয়েছে। তারমানে বেপরোয়া গাড়ি চালাতে গিয়ে রাস্তা থেকে সরে ধাক্কাটা লাগিয়েছিল সোফি। এর মধ্যে জেমস বন্ড ভিলেনদের শয়তানি খুঁজে লাভ নেই।'

'কিন্তু শয়তানি তো কেউ একজন করছে। এই চিঠিই তার প্রমাণ।'

'তবে সে সোফিকে খুন করেনি, এটাও ঠিক,' জোর দিয়ে বলল ক্লডিয়া।

ড্যানি বলল, 'আমার প্রশ্ন, এই তত্ত্বাবধায়ক লোকটা কে?'

কেউ জবাব দিতে পারল না। একে অন্যের মুখের দিকে তাকাতে লাগল জবাবের আশায়। কিছুক্ষণ চুপ থাকার পর রবিন বলল, 'আমার কি মনে হচ্ছে জানো? মরুভূমিতে যে লোকটাকে কবর দিয়ে এসেছি আমরা, তার কোন পরিচিত লোক কিংবা বন্ধু হতে পারে।'

'সে কেন করবে একাজ?'

'প্রতিশোধ। আমরা ওর বন্ধুকে খুন করেছি। সে এখন আমাদের শাস্তি দেবে।'

'ব্ল্যাকমেইল?'

'না, তাহলে টাকা চাইত। বা অন্য কোন কিছু। সে আমাদের এমন সব কাজ করতে বলছে, যাতে আমরা ভয়াবহ মানসিক যন্ত্রণা পাই।'

'সেই লোকটা কে?' আবার আগের প্রশ্নে ফিরে গেল ড্যানি।

'কি করে বলব?' হতাশ ভঙ্গিতে দুই হাত তুলল রবিন। 'জানলে তো গিয়ে চেপেই ধরতাম। যে লোকটাকে গাড়ি চাপা দিলাম তার পরিচয়ই জানি না, আর এর কথা জানব কিভাবে?'

'এখন কিশোরকে খুব প্রয়োজন ছিল আমাদের,' হাই তুলতে তুলতে বলল মুসা। 'এত জটিল একটা ধাঁধার সমাধান ও ছাড়া আর কেউ করতে পারবে না।'

আবার এক মুহূর্ত নীরবতার পর ক্লডিয়া বলল, 'আমাদের মধ্যে কেউ কাজটা করিনি তো? জোক করার জন্যে?' সবার মুখের দিকে তাকাতে লাগল সে।

'তুমি কিছু করেছ কিনা তুমি জানো,' মারলা বলল, 'তবে আমি এই জঘন্য চিঠি লিখিনি। সোফিকেও আমি খুন করিনি।'

'আবার খুনের কথা আসছে কেন? ও তো নিজে নিজে অ্যাক্সিডেন্ট করে মারা গেছে। আমি বলতে চাইছি চিঠিটার কথা...'

'লিখলে তাহলে তুমিই লিখেছ,' রেগে গেল মারলা, 'তোমার মাথায়ই ছিট আছে। এখানে ছিলেও না অনেকদিন। চিঠি লিখে ডাকে ফেলে পালিয়ে গিয়েছিলে। তোমার এই জঘন্য শয়তানির জন্যেই ঘাবড়ে গিয়ে অ্যাক্সিডেন্ট করে সোফি মারা গেছে। ওর মৃত্যুর জন্যে তুমি দায়ী!'

'দেখো, মুখ সামলে কথা বোলো!' আগুন জ্বলে উঠল ক্লডিয়ার চোখে। 'চিঠিটা যেদিন পেয়েছ তোমরা তার বহু আগে আমি শহর থেকে চলে গেছি...'

'আহ্, কি শুরু করলে তোমরা!' বিরক্ত হয়ে হাত নাড়ল রবিন। 'নিজেরা নিজেরাই মারামারি শুরু করে দিচ্ছ! থামো! চুপ করো!'

মুসা বলল, 'অহেতুক নিজেদের সন্দেহ করছি আমরা। আমাদের মধ্যে কেউ তত্ত্বাবধায়ক নই। আসল কথা বাদ দিয়ে বসে বসে ঝগড়া করলে কাজ এগোবে না।'

'সরি!' নিজেকে সামলে নিল মারলা।

ক্লডিয়ারও চোখের আগুন নিভে এল।

ড্যানি বলল, 'সমস্যাটা এখন আমার কাঁধে। কারণ এরপর আমাকে টার্গেট করেছে তত্ত্বাবধায়ক। যে কাজটা করতে বলেছে মরে গেলেও আমি তা করতে পারব না।'

'তা তো সম্ভবই নয়,' মাথা নাড়ল ক্লডিয়া। 'যত বড় হুমকিই দিক তত্ত্বাবধায়ক, ছোট বোনের হাত পোড়ানোর প্রশ্নই ওঠে না।'

'পুলিশকে জানানো দরকার,' রবিন বলল।

মাথা সোজা করল মারলা। 'পাগল হয়েছ?'

'না, হইনি। একটা অন্যায়কে ধামাচাপা দিতে গিয়েই আজ আমাদের এই অবস্থা। কেউ মানসিক শান্তিতে নেই। বুকে হাত রেখে কেউ বলতে পারবে না ঘটনাটার পর কোন একরাত শান্তিতে ঘুমাতে পেরেছে কেউ। আর সেই অপরাধটা গোপন করার কারণেই চিঠি লিখে হুমকি দেয়ার সুযোগ

পেয়েছে তত্ত্বাবধায়ক।'

'পুলিশকে জানালে এখন জেলে যেতে হবে,' ভোঁতা গলায় বলল ড্যানি। 'তাতে আমার অন্তত আপত্তি নেই। কারও থেকে থাকলে সে গিয়ে আগে একজন উকিলের সঙ্গে পরামর্শ করতে পারো।'

'তোমার শাস্তিটাই সবচেয়ে বেশি হবে, ড্যানি,' মারলা বলল। 'কারণ গাড়িটা তুমি চালাচ্ছিলে। লোকটাকে তুমি চাপা দিয়েছ···'

'সেজন্যেই তো যেতে চাই। যতই দিন যাবে, মনের যন্ত্রণা বাড়বেই শুধু, কমবে না। এই পনেরো দিনে সেটা ভালমতই বোঝা হয়ে গেছে আমার। কোন শাস্তির ভয়েই আর ব্যাপারটা গোপন রাখতে রাজি নই আমি।'

'কিশোর থাকলে আমাদের এই অবস্থা হত না,' রবিন বলল। 'একটা না একটা ব্যবস্থা করেই ফেলত ও।'

'কি করত?' ভুরু নাচাল ক্লডিয়া। 'এটা কোন রহস্য নয় যে তার সমাধান করবে। জলজ্যান্ত একজন লোককে গাড়িচাপা দিয়ে মেরে ফেলেছি আমরা। কিশোর কি করবে? সবারই কমবেশি দোষ ছিল সেদিন। ড্যানি তো বলেইছিল, কনসার্ট শুনে মাথা গরম হয়েছিল ওর, চেঁচামেচিতে কানের মধ্যে ঝাঁ-ঝাঁ করছিল, তারপরেও ওকে গাড়ি চালাতে দিলাম কেন? দিলাম তো দিলাম, শান্তভাবে চুপচাপ বসে থাকলেই পারতাম। এমন হট্টগোল শুরু করলাম গাড়ির মধ্যে, এ ওর গায়ে ঢলে পড়তে লাগলাম, স্যান্ডউইচ নিয়ে খাবলাখাবলি শুরু করলাম যেন জীবনে খাইনি···এবং তার ওপর হেডলাইট না জ্বেলে অন্ধকারে গাড়ি চালানোর বাজি···'

'থাক, ওসব স্মৃতিচারণ করে আর লাভ নেই এখন,' বাধা দিল রবিন। 'ভাবলেও রাগ লাগতে থাকে। বরং ড্যানির ব্যাপারটা নিয়ে কি করা যায় তাই বলো।'

'যদি মনে করো,' ক্লডিয়া বলল, 'তত্ত্বাবধায়কের কথা না শুনলে সত্যি সে কোন অঘটন ঘটাবে, তাহলে পুলিশের কাছে যাওয়াই ভাল।'

'ঘটায় কিনা সেটা দেখলে কেমন হয়?' প্রস্তাবটা ড্যানিই দিল।

'সত্যি দেখতে চাও?'

'চাই বলাটা ভুল হবে। হুকুম যা দিচ্ছে তাতে তো পরিষ্কার সে একটা উন্মাদ। কোন সুস্থ লোক এসব করার কথা বলতে পারত না। কাপুরুষ বলো আর যা-ই বলো, কাউকে কিছু না জানিয়ে পালিয়ে যাওয়াই উচিত এখন আমার, তত্ত্বাবধায়কের ধরা-ছোঁয়ার বাইরে। কোথায় গেছি জানতেও পারবে না সে, ক্ষতিও করতে পারবে না।'

ছয়

পুরানো প্রিয় জায়গায় ফিরে যেতে ভাল লাগে মানুষের। বিশেষ করে সেই জায়গাটা যদি কোন কারণে তার কাছে নিষিদ্ধ হয়ে যায় তাহলে আকর্ষণ যেন

আরও বেড়ে যায়। রকি বীচে ফিরে অনির্দিষ্টভাবে ঘোরাঘুরি করতে করতে কখন যে স্কুলের স্টেডিয়ামের কাছে চলে এল মুসা, নিজেও বলতে পারবে না। বাইরে গাড়ি রেখে মাঠে ঢুকল। বাস্কেটবল খেলতে তাকে আপাতত বারণ করে দিয়েছেন ডাক্তার। তবে এটাও বলেছেন, মেরুদণ্ড ব্যথা করলেও হালকা ব্যায়ামে কোন অসুবিধে হবে না। ভাল দৌড়াতে পারে সে। মানে, পারত। কোয়ার্টার মাইল আর হাফমাইলে লীগ চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল। এখনও কি শরীরের সে-ক্ষমতা অটুট আছে?

শার্ট-প্যান্ট-জুতো খুলে রেখে শুধু আন্ডারওয়্যার পরে মাঠের একধার থেকে দৌড়ানো শুরু করল সে। প্রথমে খুব ধীরে। গতি বাড়তে লাগল। ছন্দময় পদক্ষেপ। দেখতে দেখতে গতি উঠে গেল অনেক।

জোরে জোরে দম ফেলছে। কিন্তু পরিশ্রম লাগছে না। বাহ্, ভালই তো পারছে। যেন মুক্তির আনন্দ। ডানাভাঙা পাখির ডানা ফিরে পাওয়ার মত। মন থেকে ঝেঁটিয়ে বিদেয় হয়ে যাচ্ছে সমস্ত দুশ্চিন্তা। বিষণ্ণতা কেটে যাচ্ছে।

এক মাইল দৌড়াল সে…দুই মাইল…তিন…চার…

থামল যখন, দেহের প্রতিটি পেশি অবশ হয়ে গেছে। ঘামছে দরদর করে। হেঁটে চলে এল মাঠের ধারে একটা গাছের নিচে। সবুজ ঘাসে শুয়ে পড়ল চিত হয়ে। আকাশ দেখতে পাচ্ছে। নীল, পরিষ্কার আকাশ। মন উড়ে গেল যেন সুদূর মহাশূন্যে। ভেসে বেড়াতে লাগল শরীরটা।

ঘুম ভাঙলে দেখল আকাশের নীল রঙ ধূসর হয়ে গেছে। ঝলমলে রোদ হারিয়ে গেছে বহু আগে। তারা ফুটবে এখনই। অন্ধকারের দেরি নেই। কি কাণ্ড! সারাটা দিন গাছের নিচে ঘুমিয়ে কাটিয়ে দিল, অথচ মনে হচ্ছে এই তো মাত্র কয়েক সেকেন্ড আগে শুয়েছে।

উঠে বসল। ক্লান্তিতে ভেঙে আসছে শরীর। ব্যথা করছে সর্বাঙ্গ। এত ঘুমিয়েও ঝরঝরে হয়নি। তবে দুশ্চিন্তা করল না সে। ব্যায়ামে দীর্ঘদিন বিরতি দিয়ে আবার হঠাৎ শুরু করলে এরকমই হয়। হাঁটতে হাঁটতে ফিরে এল কাপড়গুলো যেখানে ফেলে গিয়েছিল সেখানে। পরে নিল। ধীরেসুস্থে করছে সবকিছু। বাড়ি ফেরার তাড়া নেই। দিনটা তো কাটাল। এখন কি করবে? যাবে কোথায়? বাড়ি ফিরতে ইচ্ছে করছে না। ভাবতে ভাবতে চলে এল গাড়ির কাছে।

স্টিয়ারিং হুইলের পেছনে উঠে বসল। পা দুটো আড়ষ্ট লাগছে। মাথা ধরেছে। গাড়িতে ওষুধের শিশি আছে। ব্যথা পাওয়ার পর থেকে টাইলিনল ট্যাবলেট রাখে সঙ্গে। শিশিটা বের করে দুটো ট্যাবলেট নিয়ে মুখে পুরল। চিবিয়ে গুঁড়ো করে পানি ছাড়াই গিলে ফেলল তেতো ওষুধ। শিশিটা আবার রাখতে গিয়ে হাতে ঠেকল একটা কাগজের টুকরো। ফেলে দেয়ার জন্যে বের করে আনল। স্ট্রীটল্যাম্পের হ্যালোজেন লাইটের আলোয় লেখার ওপর চোখ পড়তেই কাগজধরা আঙুল দুটো শক্ত হয়ে গেল। ক্রিসি ট্রেভারের ঠিকানা আর ফোন নম্বর।

ঘড়ি দেখল। মোটে সাতটা বাজে। কানে বেজে উঠল ক্রিসির কণ্ঠ:

বিকেলের পর আর বেরোই না আমি। তোমার ম্যাসাজ দরকার হলে ওই সময়টায় এসো।

কিন্তু আজ শনিবার। ওর মত অল্পবয়েসী একজন মহিলা কি ছুটির সন্ধ্যায় ঘরে বসে থাকবে? আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধবদের সঙ্গে আড্ডা দিতে না যাক, সিনেমায়ও তো চলে যেতে পারে? যাওয়ার আগে ফোন করে নেয়া দরকার।

গাড়ি চালিয়ে সবচেয়ে কাছের ফোন বুদটায় এসে ক্রিসির নম্বরে ডায়াল করল সে।

তৃতীয় রিঙে ধরল ক্রিসি। বাড়িতেই আছে। 'হালো?'

'ক্রিসি? আমি মুসা।'

একটা মুহূর্ত চুপ করে রইল ক্রিসি। তারপর ভেসে এল তার উচ্ছল কণ্ঠ, 'হাই, মুসা। কেমন আছ?'

'ভাল। আপনি কেমন?'

'ভাল। একা একা ঘরে বসে অবশ্য বিরক্ত লাগছে। কি করছ?'

'একা একা রাস্তায় ঘুরতে আমারও ভাল লাগছে না। দিনের বেলা খুব দৌড়াদৌড়ি করেছিলাম। ব্যথা করছে।'

'তারমানে ম্যাসাজ লাগবে?' হাসল ক্রিসি। 'নো প্রব্লেম। চলে এসো।'

যে মলে ওদের দেখা হয়েছিল তার কাছাকাছিই একটা নতুন অ্যাপার্টমেন্ট কমপ্লেক্সে থাকে ক্রিসি। মুসা বেল বাজাতেই দরজা খুলে দিল। কালো প্যান্ট আর সাদা ব্লাউজ পরেছে। নার্সের সাদা পোশাকের চেয়ে এই কাপড়ে অনেক বেশি সুন্দরী লাগছে ওকে। সবুজ চোখে উজ্জ্বলতা। লিপস্টিক লাগানো ঠোঁটে আন্তরিক হাসি।

'এসো, ভেতরে এসো,' দরজা থেকে সরে জায়গা করে দিল ক্রিসি। 'নোংরা করে রেখেছি। কিছু মনে কোরো না।'

ঘরের চারপাশে তাকিয়ে দেখল মুসা। নোংরাটা কোথায় বুঝতে পারল না। কেবল একটা কফি-টেবিলে পড়ে থাকা দুটো পেপারব্যাক বইয়ের পাশে রাখা একটা কফির পট আর একটা মগে আধমগ কফি ছাড়া। ঘরের সমস্ত আসবাব বেশ উঁচু মানের। ক্রিসির বাবা-মা মনে হয় খুব ধনী। টাকা দিয়ে তারাই বোধহয় সাহায্য করে। হাসপাতালে নার্সের চাকরি করে এত বিলাসিতায় বাস করা সম্ভব নয়।

কেমন একটা বিচিত্র ধোঁয়া ধোঁয়া গন্ধ ঘরের বাতাসে। কোন ধরনের সুগন্ধী? বুঝতে পারল না মুসা।

ওর মুখ দেখেই অনুমান করে ফেলল যেন ক্রিসি, 'বোঝা যায়?'

'যায়। কিসের? মশার কয়েল?'

'না না, কয়েলের এত ভাল গন্ধ হয় নাকি। ও তো দম আটকে দেয়। এটা ধূপের গন্ধ। ইনডিয়ায় খুব ব্যবহার এটার, জানো বোধহয়। মশা তাড়াতে কাজ করে ধূপের ধোঁয়া। আরও নানা কাজে, বিশেষ করে দেবদেবীর পূজায় ব্যবহার করে ওরা এই জিনিস।'

'এখানে তো মশা নেই। আপনি কিসের পূজা করেন?'

হেসে প্রশ্নটা এড়িয়ে গেল ক্রিসি। 'করি যেটারই হোক। কফি খাবে?'

'দিতে পারেন। মাথাটা খুব ধরেছে।'

'দুধ দিয়ে না দুধ ছাড়া?'

'দুধ দিয়ে। চিনি দেবেন বেশি করে যাতে তেতোটা না থাকে।'

রিফ্রিজারেটরের দিকে ঘুরল ক্রিসি। 'আমি খাই খুব কড়া। দুধ চিনি ছাড়া। আর এত গরম, জ্বলতে জ্বলতে ভেতরে নামে। কি, অবাক লাগছে শুনতে? হাসপাতালের সব নার্সই এরকম খায়। নাইট ডিউটি করতে হয় যে।'

'হাসপাতালে আসলে কাজটা কি করেন আপনি?' জিজ্ঞেস করল মুসা।

'এই নানা রকম টুকটাক কাজ,' দুধ আর চিনি বের করে আনল ক্রিসি। একটা কাপও আনল। পট থেকে কফি ঢেলে তাতে দুধ-চিনি মিশিয়ে ঠেলে দিল মুসার দিকে। 'বাজে চাকরি। ছেড়ে দেয়ার কথা ভাবছি আমি।'

'সেটা কি ঠিক হবে?'

মুসার মুখোমুখি বসল ক্রিসি। সবুজ চোখ মেলে তার দিকে তাকিয়ে ভুরু নাচাল, 'কেন হবে না?'

ঘরের জিনিসপত্রের দিকে ইঙ্গিত করল মুসা, 'বেতন তো ভালই পান মনে হচ্ছে। নাকি বাবার টাকা আছে?'

'বাবার টাকাই বলতে পারো,' মগ তুলে কফিতে চুমুক দিল ক্রিসি। 'দেখা হওয়ার পর থেকেই তোমার জন্যে অপেক্ষা করছিলাম আমি। তুমি ফোন করবে জানতাম।'

'কি করে জানলেন?'

'অনুমান। খেলোয়াড়রা চায় ওষুধপত্র খেয়ে, ম্যাসাজ করে যতটা তাড়াতাড়ি সম্ভব রোগ আর ব্যথা কমিয়ে ফেলতে। খেলার মাঠ ছাড়া থাকতে পারে না তো।'

হেসে ফেলল মুসা। 'ঠিকই বলেছেন। এখন কোত্থেকে এসেছি জানেন? মাঠ থেকে। দিনের বেলা এমন দৌড়ান দৌড়েছি···তারপর ক্লান্ত হয়ে শুয়ে পড়লাম গাছের নিচে। এক ঘুমে পার করে দিয়েছি সারাটা দিন।'

হাসল ক্রিসি। 'কফিটা শেষ করো। তারপর শুরু করছি।'

সাত

পার্ক থেকে ফেরার পর গুম হয়ে বাড়িতে বসে রইল রবিন। একা বাড়িতে কিছুই ভাল লাগছে না। খেতে ইচ্ছে করছে না। টিভি দেখতে ইচ্ছে করছে না। এমনকি বই পড়তেও ভাল লাগছে না। না খেলে শরীর ভেঙে পড়বে। তাই সামান্য কিছু মুখে দিয়ে এসে শুয়ে পড়ল বিছানায়। মুসার মতই আগের রাতটায় তারও ঘুম হয়নি।

বিকেলে টেলিফোনের শব্দে ঘুম ভাঙল। ক্লান্ত ভঙ্গিতে উঠে গিয়ে

রিসিভার তুলল। 'হ্যালো?'

ওপাশের কণ্ঠটা শুনে সচকিত হয়ে উঠল মুহূর্তে। 'কিশোর! ফিরেছ! কখন?'

'এই তো খানিক আগে। মুসাদের বাড়িতে ফোন করলাম। পেলাম না। ও কোথায়, জানো নাকি?'

'কিশোর,' উত্তেজনায় রীতিমত কাঁপছে রবিন। 'অনেক কথা আছে। তুমি তো ছিলে না, জানোও না। সাংঘাতিক ঘটনা ঘটে গেছে। তোমার সঙ্গে দেখা করা দরকার। এখুনি। ইয়ার্ডে আসছি আমি। তুমি কোথাও বেরিয়ো না।'

'এসো। বেরোব না।'

✡

'হুঁ, ভাল বিপদেই পড়েছ!' আনমনে নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটল কিশোর। 'পুলিশের কাছে না যাওয়াটাই বোকামি হয়ে গেছে। সবচেয়ে বড় ভুল। ক্যাপ্টেন ইয়ান ফ্লেচারের কাছে গিয়ে খুলে বলতে পারতে।'

'কি করব?' রবিন বলল। 'সবাই এমন বিরোধিতা শুরু করল, বাধা দিতে লাগল, কিছুই করতে পারলাম না। অ্যাক্সিডেন্টটা করে ড্যানি তো পুরোপুরি বোকা হয়ে গিয়েছিল। কথাই বেরোচ্ছিল না মুখ দিয়ে।'

স্যালভিজ ইয়ার্ডে জঞ্জালের নিচে তিন গোয়েন্দার হেডকোয়ার্টারে মুখোমুখি বসে আছে দুজনে। কিশোর বসেছে ডেস্কের ওপাশে তার চেয়ারে। অন্যপাশে একটা টুলে পিঠ বাঁকা করে বসেছে রবিন।

'ওই সব ঘোড়ার ডিম কনসার্টগুলো এই জন্যেই আমার ভাল লাগে না,' মুখ বাঁকিয়ে বলল কিশোর। 'কোন আনন্দ তো নেইই, যত রাজ্যের হট্টগোল আর পাগলামি। গায়কদের দেখে মনে হয় না ওরা কোন সুস্থ লোক। সব যেন উন্মাদ। ওসব দেখে বেরোলে কোন লোকের মাথা ঠিক থাকে? ড্যানি তো সহ্য করতে পারে না জানোই, গাড়ি চালাতে দিলে কেন?'

'সেটাও হয়ে গেছে আরেক বোকামি,' বিষণ্ন কণ্ঠে বলল রবিন। 'যা হবার তো হয়েছে। এখন কিভাবে মুক্তি পাওয়া যায়, তাই বলো? পুলিশের কাছে যাব?'

ঘন ঘন নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটতে শুরু করল কিশোর। কয়েক সেকেন্ড পর মাথা ঝাঁকাল, 'যেতে তো হবেই। সঙ্গে সঙ্গে গেলে শুধু ড্যানির শাস্তি হত, জেলে যেত সে একা। তবে তোমরা বেঁচে যেতে···'

'সেজন্যেই তো গেলাম না।'

'কিন্তু এখন সবাইকে জেলে যেতে হবে। ড্যানি যাবে অ্যাক্সিডেন্ট করে খুন করার অপরাধে, আর তোমরা যাবে লাশ গুম করতে তাকে সহযোগিতা আর সত্য গোপন রাখার অপরাধে। বাঁচতে আর কেউ পারবে না।'

'না পারলে নেই। জেলে গিয়ে বসে থাকা বরং অনেক ভাল। একে তো অপরাধ করে মানসিক চাপে ভুগছি, তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে এই তত্ত্বাবধায়কের যন্ত্রণা। সহ্যের সীমা ছাড়িয়েছে। শীঘ্রি এ থেকে মুক্তি না পেলে পাগল হয়ে

যাব।'

চুপ করে ভাবতে লাগল কিশোর।

অধৈর্য হয়ে উঠল রবিন, 'কি ভাবছ?'

'উঁ!' ঠোঁট থেকে আঙুল সরাল কিশোর। 'পুলিশের কাছে তো যেতেই হবে। ভাবছি, নিজেরা আগে একবার তদন্ত করে দেখলে কেমন হয়।'

'কি তদন্ত করবে?'

'এই তত্ত্বাবধায়ক লোকটা যদি তোমাদের কেউ না হয়ে থাকে তাহলে বাইরের লোক। অ্যাক্সিডেন্টের কথাটা সে জানে। আমার প্রথম প্রশ্ন: কি করে জানল? তোমাদের মধ্যে মুখ ফসকে কেউ বলে ফেলেছে অন্য লোকের সামনে। তা যদি না হয়ে থাকে তাহলে খুন হওয়া লোকটার সঙ্গে তত্ত্বাবধায়কের কোন সম্পর্ক ছিল। কিংবা অ্যাক্সিডেন্টটা সেরাতে ঘটতে দেখে ফেলেছে সে।'

'না, দেখেনি, আমি শিওর। ওই সময় ত্রিসীমানায় কোন লোক কিংবা গাড়ি দেখা যায়নি। কেউ ছিল না।'

'তাহলে জানল কি করে? বেশ, তর্কের খাতিরে ধরে নিলাম, যেভাবেই হোক জেনেছে...'

'জেনেছে তাই বা কি করে বলব? চিঠিতে তো উল্লেখ করেনি। কেবল লিখেছে: তোমাদের গোপন কথাটা আমি জানি। অনেক ব্ল্যাকমেইলারই একরম আন্দাজে ঢিল ছুঁড়ে কামিয়াব হয়ে যায়, সেজন্যেই বলে এমন করে।'

'তা হয়। কিন্তু আমাদের এই বিশেষ লোকটি আসল কথাটা জানে না এটা ভেবে ঝুঁকি নেয়া ঠিক হবে না। ও জানতেও পারে। তত্ত্বাবধায়ককে খুঁজে বের করতে হলে এখন আমাদের প্রথম কাজ হবে সেই মৃত লোকটার পরিচয় জানা। এমনও হতে পারে লোকটাকে ড্যানি খুন করেনি। ত্রিসীমানায় আর কোন গাড়ি দেখোনি বলছ। এমনও হতে পারে আগেই তাকে খুন করে এনে রাস্তার ওপর ফেলে রেখেছিল কেউ। এবং সেই "কেউ"টা হতে পারে এই তত্ত্বাবধায়ক। কেবল এইভাবেই তোমাদের কথা তার জানা সম্ভব।'

এতক্ষণে হাসি ফুটল রবিনের মুখে। এই না হলে কিশোর পাশা। এতদিন ধরে এই সহজ কথাটা ওদের কারও মাথায় আসেনি। 'তাহলে এই সম্ভাবনার কথাটা আমরা গিয়ে পুলিশকে বললেই তো পারি?'

'না,' মাথা নাড়ল কিশোর, 'আমি বিশ্বাস করছি বলেই যে ওরাও করবে, তা না-ও হতে পারে। করাতে হলে এর স্বপক্ষে কিছু প্রমাণ জোগাড় করা দরকার।'

'কি করে করবে? কোন সূত্রই তো নেই।'

'পুলিশ স্টেশনে গিয়ে ওদের কম্পিউটার ব্যবহার করতে পারি। গত এক মাসে যত লোক নিখোঁজ হয়েছে, তাদের লিস্ট বের করব। ওদের মধ্যে থেকে খুঁজে বের করব আমাদের বিশেষ লোকটাকে। এখন ওর চেহারা-সুরৎ সম্পর্কে যতটা পারো, জানাও আমাকে। কবর দেয়ার আগে দেখেছ তো?'

মাথা ঝাঁকাল রবিন। যতটা সম্ভব নিখুঁতভাবে লোকটার চেহারার বর্ণনা

দেয়ার চেষ্টা করল রবিন। বয়েস সাতাশ-আটাশ, ককেশিয়ান, সুদর্শন। গায়ে ছিল তামাটে স্পোর্টস কোট আর হালকা বাদামী স্ল্যাকস।

'হুঁ, চমৎকার,' একটা পেপারওয়েট নিয়ে উল্টো করে গোল মাথাটা টেবিলে রেখে ঘোরাতে লাগল কিশোর। 'আচ্ছা, ড্যানি সত্যি সত্যি শহর ছেড়ে চলে যাবে তো?'

'তাই তো বলল।'

'কোথায় যাবে কাউকে কিছু বলেছে?'

'জানি না! মুসাকে বলতে পারে। ওর সঙ্গে খাতির বেশি।'

'না বললেই ভাল করবে,' পেপারওয়েটটার দিকে তাকিয়ে বিড়বিড় করল কিশোর।

'কেন? মুসা মরে গেলেও কাউকে বলবে না।'

জবাব না দিয়ে আচমকা উঠে দাঁড়াল কিশোর। 'চলো, বেরোই। পুলিশ অফিসে যেতে হবে।'

আট

রকি বীচ পুলিশ স্টেশনের কম্পিউটার রুমটা বেশ সাজানো-গোছানো। ঢোকার মুখে ডেস্কে বসে কাজ করছেন একজন অফিসার। তিনি গোয়েন্দাকে চেনেন। কম্পিউটার থেকে কিছু তথ্য নিতে চায় জানাল কিশোর।

'কেন, কোন কেসের তদন্ত করছ নাকি?'

মাথা ঝাঁকাল কিশোর, 'হ্যাঁ।'

'কি কেস?'

'এখনও বলার সময় আসেনি।'

কিশোর পাশার স্বভাব জানা আছে অফিসারের। হেসে ঢোকার অনুমতি দিয়ে দিলেন।

ঘরটা এখন খালি। কেউ নেই। থাকার কথাও নয়। কোন কাজ না পড়লে, অর্থাৎ তথ্যের দরকার না হলে কেউ ঢোকে না এখানে। সারাক্ষণ বসে ডিউটি দেয়ার প্রয়োজন পড়ে না।

ঢুকেই রবিনের উদ্দেশ্যে লেকচার শুরু করল কিশোর, 'কম্পিউটার হলো আগামী প্রজন্মের ডিটেকটিভ। সঠিক প্রোগাম আর সঠিক ডাটা সরবরাহ করতে পারলে যে কোন ধাঁধার জবাব দিয়ে দিতে পারে কম্পিউটার। রহস্য সমাধান করতে চাইলে এর চেয়ে যোগ্য গোয়েন্দা আর কোথাও পাবে না। এর জন্যে কয়েকটা প্রোগ্রামও লিখেছি আমি। আমার নিজস্ব উদ্ভাবন। কাজে লাগানোর সুযোগ খুঁজছিলাম। পেয়ে গেছি আজ। আমি যেটা ব্যবহার করব, একধরনের ফিল্টার বা ছাঁকনি বলতে পারো একে। আসল লোকটাকে ছাড়া বাকি সব বাদ দিয়ে দেবে। এটা করতে পারা খুব জরুরী। সময় বাঁচবে

অনেক। প্রতিমাসে লস অ্যাঞ্জেলেসে কত লোক যে নিখোঁজ হয়, হিসেবটা শুনলে তুমি আঁতকে উঠবে।'

'যায় কোথায় ওরা?' জানতে চাইল রবিন।

'কোথায় আর যাবে? বেশির ভাগই পালায়। অসুখী স্বামী কিংবা স্ত্রী। পালিয়ে বাঁচে।'

'হুঁহ্!'

'হাসছ?'

'তো কি করব? খুনের সঙ্গে এর কোন সম্পর্ক নেই।'

'একেবারেই নেই তা বলা যাবে না। এদের কেউ কেউ খুনও হয়ে যায়। এখানকার কেসফাইলগুলো যদি সব পড়তে তাহলে হাসি মুছে যেত মুখ থেকে। মনে হত দুনিয়াটা বড় বিশ্রী জায়গা। এখানে হাসির কিছু নেই।'

'তোমার লেকচারটা একটু থামাও না দয়া করে।'

'কেন, ভাল লাগছে না?'

'মানুষের চরিত্র নিয়ে আলোচনা করতে আমার ভাল লাগে না।'

'বলো কি! মানুষ নিয়ে গবেষণা করাটাই তো সবচেয়ে মজার। এত রহস্যময় আর বিচিত্র প্রাণী সারা দুনিয়ায় আর একটাও খুঁজে পাবে না তুমি। মানুষ যে কি করে আর করে না...'

'দোহাই তোমার, কিশোর,' হাল ছেড়ে দেয়ার ভঙ্গিতে দুহাত তুলল রবিন, 'কচকচি ভাল্লাগছে না! যা করতে এসেছ, করো।'

চিন্তিত ভঙ্গিতে ওর দিকে তাকিয়ে থেকে আনমনে মাথা দোলাল কিশোর, 'হুঁ, তোমার মনমেজাজ এখন খুব খারাপ। দুশ্চিন্তায় ভরা। এসব কথা এখন তোমার ভাল লাগবে না...'

'একটা কথা সত্যি করে বলো তো। মানুষ জাতটাকে কি তুমি পছন্দ করো না?'

'করব না কেন? নিজেও তো মানুষ। মানুষের স্বভাব জানার এত আগ্রহ কেন আমার জানো? ওদের সাহায্য করার জন্যে। মানুষ যেসব অপরাধ করে, কেন করে সেটা যদি না জানো, ভাল গোয়েন্দা তুমি কোনদিনই হতে পারবে না।'

একটা কম্পিউটারের সামনে গিয়ে বসে পড়ল কিশোর। নিখোঁজ মানুষদের ফাইলটা খোলার নির্দেশ দিল কম্পিউটারকে। যতটা সময় লাগবে ভেবেছিল রবিন, ফাইল খুলতে তারচেয়ে বেশি সময় লাগিয়ে দিল কম্পিউটার। ফাইলগুলো সব একজায়গায় নেই। বিভিন্ন নামে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে। সবগুলোকে জোগাড় করে একখানে এনে খুলতে সময় লাগবেই। অপেক্ষা করতে হবে।

নামগুলো সব লাইন দিয়ে ফুটে উঠলে এক এক করে বাছাই শুরু করল কিশোর। রাশি রাশি নাম থেকে বাছাই করে রাত এগারোটায় ছয়টা নামে এনে ঠেকাল। কমে যাওয়ায় স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল দুজনেই।

'এবার কি করবে?' জানতে চাইল রবিন।

'দুটো কাজ,' দুই আঙুল তুলল কিশোর। 'এক, ফোন বুক দেখে ঠিকানা জেনে নিয়ে ওদের আত্মীয়স্বজনদের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করব। হয়তো দেখা যাবে ছয়জনের মধ্যে কয়েকজনই আর নিখোঁজদের মধ্যে নেই, বাড়ি ফিরে গেছে। তালিকা থেকে বাদ যাবে ওরা। আরও কমে আসবে নিখোঁজের সংখ্যা। দ্বিতীয় কাজটা করতে পারি পত্রিকা দেখে। বিজ্ঞাপনের পাতার নিখোঁজ সংবাদে ওদের নাম-ঠিকানা দিতে পারে। তাতে সময় লাগবে অনেক বেশি। মাইক্রোফিল্ম করে কম্পিউটারে ভরে রাখা প্রতিটি পাতা দেখে দেখে ওই ছয়জনের নাম-ঠিকানা বের করতে সারারাতও লেগে যেতে পারে। তারপরেও কথা আছে, যদি পত্রিকায় থাকে। নইলে কষ্টটাই সার হবে।'

'কিন্তু এখন তো বাজে রাত এগারোটা। এত রাতে মানুষের বাড়িতে ফোন করবে?'

'উপায় কি? সময় এখন অতি মূল্যবান। কথা না বলে এসো হাত লাগাও। সেরে ফেলি। পত্রিকায় খোঁজার চেয়ে ডিরেক্টরিতে খোঁজাই সহজ হবে।'

আসলেই সহজ হলো। পনেরো মিনিটেই ছয়জনের মধ্যে চারজনেরই ঠিকানা জোগাড় করে ফেলল। দেরি না করে ফোন শুরু করল। প্রথমজন কিশোর দুটো কথা বলার আগেই ফোন রেখে দিল। দ্বিতীয়জন মহিলা। নিখোঁজ লোকটার কথা বলতেই কাঁদতে শুরু করল। শিকারে গিয়ে হারিয়ে গিয়েছিল তার স্বামী। কয়েকদিন পর ভালুকের গুহার সামনে পাওয়া যায় তার ক্ষতবিক্ষত লাশ। তৃতীয়জনও মহিলা। তার বাড়ির নিখোঁজ লোকটার কথা জিজ্ঞেস করতেই রেগে উঠল। জানাল, আরেক মহিলার কাছে চলে গেছে তার স্বামী। খোঁজ পাওয়া গেছে। চতুর্থ নম্বরটায় রিঙ হয়েই চলল, হয়েই চলল। ধরল না কেউ।

কয়েকবার চেষ্টা করে রিসিভার রেখে দিল কিশোর। 'মনে হয় বাড়ি নেই। দেখা যাক, খানিক পরে আবার করব।'

'বাকি দুজন?'

নামের তালিকার দিকে তাকাল কিশোর। ডেভন ব্রেক আর ইয়ান জোসেফ। 'ডিরেক্টরিতে তো পেলাম না।'

ভুরু নাচাল রবিন, 'কি করবে?'

'ডিরেক্টরিতে যখন পেলাম না, পত্রিকাতেই দেখতে হবে।'

খুব বেশিক্ষণ লাগল না প্রথম নামটা বের করতে। ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই ডেভন ব্রেকের ওপর লেখা একটা প্রতিবেদন পেয়ে গেল রবিন। ছবি সহ। দেখেই চোখ কপালে। সেই চেহারা। মরুভূমিতে চিত হয়ে পড়ে থাকা লাশের মুখটা ভেসে উঠল কল্পনায়। একই পোশাক। তামাটে রঙের স্পোর্টস কোট। যেটা সহ ওকে কবর দিয়েছিল ওরা। ছবির সঙ্গে লাশটার তফাত কেবল ওটার ঠোঁটের কোণে রক্ত ছিল, এটার নেই। কম্পিউটারের পর্দার দিকে কাঁপা কাঁপা তর্জনী তুলে প্রায় ফিসফিস করে বলল, 'এই সেই লোক!'

'তুমি শিওর?'

ঢোক গিলল রবিন, 'এই চেহারা জীবনে ভুলব না।'

প্রতিবেদনটা একই সঙ্গে পড়তে শুরু করল দুজনে। লিখেছে:

ব্যবসায়ী নিখোঁজ

তেত্রিশ বছর বয়স্ক ডেভন ব্রেক, একজন দোকানদার, সাত দিন ধরে নিখোঁজ। সান্তা মনিকার স্থায়ী অধিবাসী তিনি। দোকানটা তাঁর বাবার। প্রায় বাইশ বছর চালিয়েছেন। গানের ক্যাসেট, রেকর্ড, এসব বিক্রি হয়। বাবা মারা যাওয়ার পর ছেলে দোকান চালাত। তাঁর মা মিসেস ব্রেক একজন টীচার। অবসরে সমাজ-সেবার কাজ করেন। ছেলে নিরুদ্দেশ হয়ে যাওয়াতে বড়ই দুশ্চিন্তায় আছেন তিনি। হুট করে কোথায় গেছে, বা কোথায় যেতে পারে তাঁর ছেলে, এ সম্পর্কে কোনই ধারণা নেই তাঁর। ওয়েস্টউড বুলভারে তাঁদের বাড়ি। গত দশ বছর ধরে সমাজ-সেবার কাজ করে আসছেন মহিলা। তাঁদের বিরুদ্ধে কখনও কোন অভিযোগ শোনা যায়নি, কেউ কখনও বদনাম করেনি। ডেভন ব্রেকের কোন খোঁজ যদি কারও জানা থাকে, দয়া করে নিচের ঠিকানায় খবর দিলে বাধিত হবেন মিসেস ব্রেক।

চেয়ারে হেলান দিয়ে বিড়বিড় করতে লাগল রবিন, 'তারমানে ভাল মানুষটাকে খুন করলাম আমরা!'

'তোমরাই তার মৃত্যুর কারণ কিনা এখনও জানো না,' কিশোর বলল। 'বলেছি না, এমনও হতে পারে আগেই তাকে কেউ খুন করে নিয়ে গিয়ে মরুভূমির ধারের ওই রাস্তায় ফেলে এসেছিল।'

হতাশ ভঙ্গিতে মাথা নাড়তে নাড়তে রবিন বলল, 'গোপনে ওকে কবর দেয়াটা যে কত দিক থেকে ভুল হয়ে গেছে···ইস! পুলিশকে যদি জানাতাম, মহিলা জেনে যেতেন এতদিনে তাঁর ছেলের কি হয়েছে!···ইস, মহিলা নিশ্চয় রোজ ছেলের পথ চেয়ে বসে থাকেন। তাঁর ছেলে আর কোনদিনই ফিরে আসবে না জানলে এই পথ চাওয়ার কষ্ট থেকে বাঁচতেন।'

'আমার কিছুতেই বিশ্বাস হতে চাইছে না লোকটাকে তোমরা খুন করেছ। ও চাপা পড়ার সময় চিৎকার শুনেছ?'

'না। চিৎকার করার কোন সুযোগই হয়তো পায়নি সে।'

'যে ভাবে চাপা পড়েছে বলছ, তাতে মনে হয় রাস্তায় হাঁটার সময় হঠাৎ করে চাকার নিচে চলে এসেছিল সে। সেটা কি সম্ভব? ভেবে দেখো, হাঁটার সময় কারও গায়ে ধাক্কা লাগলে শব্দ হবে, লোকটা চিৎকার করবে···সেসবও কোন কিছুই শোনোনি তোমরা।'

'গাড়ির মধ্যে এত বেশি চেঁচামেচি করছিলাম আমরা, শোনার সুযোগই ছিল না···'

'কি জানি! আমার দৃঢ় বিশ্বাস, একটা ভুলের শিকার হয়েছ তোমরা। ভয় তোমাদের স্বাভাবিক চিন্তার ক্ষমতাও নষ্ট করে দিয়েছে। যেহেতু কবর দিয়ে ব্যাপারটা গোপন করে ফেলেছ, ওর মাকে কষ্ট দিয়েছ, সেটা পূরণের এখন সবচেয়ে ভাল উপায় হলো আসল খুনীকে ধরে আদালতে সোপর্দ করা। রাত দুপুরে ওই মরুভূমিতে কি করতে গিয়েছিল তাঁর ছেলে, সেটা জানতে হবে আগে।'

কিছুটা শান্ত হলো রবিন। 'কি করে জানব কে খুন করেছে?'

'অবশ্যই তদন্ত করে। আজ রাতে আর কিছু করার নেই আমাদের। বাড়ি গিয়ে ভালমত একটা ঘুম দাও। কাল সকালে উঠে ব্রেকের দোকানে যাব। ঠিকানা যখন জেনে গেছি, খুঁজে বের করতে কষ্ট হবে না। ওর মার সঙ্গে দেখা করে কথা বলব।'

'কি লাভ হবে? নিখোঁজ সংবাদটা দেখে তো মনে হয় না ছেলে কোথায় যেতে পারে এ ব্যাপারে মিসেস ব্রেকের কোন রকম ধারণা আছে।'

'অনেক সময় জানলেও চেপে যায় মানুষ। নিখোঁজ হওয়ার পেছনে এমন সব কারণ থাকে, যেগুলো লজ্জা কিংবা অস্বস্তিতে পড়ার ভয়ে ফাঁস করতে চায় না। যে নিখোঁজ হয়েছে তার খোঁজ পাওয়ার জন্যে যতটুকু দরকার, তার বেশি বলে না।' রবিনকে কম্পিউটারের সামনের চেয়ারটা থেকে সরিয়ে তাতে বসল কিশোর। আবার খুলল ডেভন ব্রেকের ফাইলটা। হাতের তালুতে থুতনি রেখে পর্দার দিকে তাকিয়ে ভাবতে লাগল।

'কি দেখছ?' জানতে চাইল রবিন।

জবাব না দিয়ে কিশোর জিজ্ঞেস করল, 'কনসার্টের দিনটা কত তারিখ ছিল?'

'জুলাইর শেষ দিন। একতিরিশ।'

'কিন্তু এই প্রতিবেদনটার তারিখ দেখো। জুলাইর মাঝামাঝি। বাড়ি থেকে নিখোঁজ হয়েছে তোমরা ওকে ধাক্কা দেয়ার দুই হপ্তা আগে। ওর ঠোঁটের কোণে তাজা রক্ত দেখেছ তোমরা। তারমানে মারা গেছে সে একতিরিশ তারিখেই। বাড়ি থেকে বেরোনোর প্রায় পনেরো দিন পর।'

'ইনটারেসটিং তো!'

'গুড। মাথায় তাহলে ঢুকতে আরম্ভ করেছে। আমি ভাবছি ওই দুটো হপ্তা কোথায় ছিল ডেভন? কার সঙ্গে?' পর্দার দিকে আঙুল তুলল কিশোর। যেন জবাব চায় কম্পিউটারের কাছে। 'সেটা জানলে খুনী কে সেটাও জানতে পারব সহজেই।'

✡

পুলিশ স্টেশন থেকে বেরিয়ে কিশোর কোথায় যাবে জানতে চাইল রবিন। কিশোর বলল, রকি বীচে। স্যালভিজ ইয়ার্ডে। গোস্ট লেনে ওদের বাড়িতে থাকতে অনুরোধ করল রবিন। কিশোর বলল, জরুরী কাজ আছে। সকালে উঠেই তাকে বেরোতে হবে। গোস্ট লেন থেকে বেকায়দা। রকি বীচে যাওয়াই ভাল।

আর কিছু বলল না রবিন। চুপচাপ গাড়ি চালাল।

হঠাৎ জিজ্ঞেস করল কিশোর, 'আংকেলরা কবে ফিরবেন?'

'দেরি হবে।'

'হুঁ।'

আবার কিছুক্ষণ চুপচাপ। এবার রবিন কথা বলল, 'কিশোর, একটা কথা তোমাকে বলা হয়নি। চিঠিতে আমার নাম নেই। গাড়িতে সেরাতে আমরা

যারা যারা ছিলাম, তাদের মধ্যে শুধু আমার নামটাই নেই।'

ঝট করে সোজা হলো কিশোর। 'আগে বলোনি কেন?'

'ভুলে গিয়েছিলাম। কেন লিখল না বলো তো? এত কিছু যখন জানে তত্ত্বাবধায়ক, নিশ্চয় জানে আমি কে?'

'তা তো জানেই। সব জানে সে। সেজন্যেই তো দুশ্চিন্তা হচ্ছে আমার।'

'কেন?'

'নিশ্চয় কোন উদ্দেশ্য আছে ওর। অকারণে করছে না এসব। আমি শিওর, কারণটা ভয়ানক কিছু।'

নয়

কফি খাওয়া শেষ হলে লম্বা একটা টেবিলের কাছে মুসাকে নিয়ে এল ক্রিসি। বলল, 'কাপড় খুলে উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ো।'

'খাইছে! কাপড় খুলব?'

হাসল ক্রিসি, 'কেন, লজ্জা লাগছে? আরে সব খুলতে হবে না। শুধু শার্ট আর গেঞ্জিটা খোলো। ঘাড়ের কাছটা ডলতে হবে না?'

হাঁপ ছাড়ল মুসা, 'তাই বলুন। আমি তো ভাবলাম...'

পাশের ঘরে চলে গেল ক্রিসি। একটা তোয়ালে আর দুটো শিশি নিয়ে ফিরে এল। একটা শিশিতে বড়ি, আরেকটাতে মালিশ। তোয়ালেটা একটা চেয়ারের হেলানে রেখে জিজ্ঞেস করল, 'রেডি?'

'হ্যাঁ।'

উপুড় হয়ে টেবিলে শুয়ে পড়তে গেল মুসা।

'দাঁড়াও,' শিশি খুলে দুটো বড়ি বের করল ক্রিসি। 'এদুটো আগে খেয়ে নাও।'

'পেইন কিলার?'

'রোগীর অত কথা জানার দরকার নেই,' রহস্যময় কণ্ঠে বলে চোখ মটকে হাসল ক্রিসি। 'যা করতে বলছি করো।'

পানি দিয়ে বড়ি দুটো গিলে টেবিলে উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ল মুসা।

ডান হাতের তালুতে তেল নিয়ে ডলে ডলে দুই হাতেই মিশিয়ে নিল ক্রিসি। আস্তে করে হাত দুটো রাখল মুসার পিঠে। শিউরে উঠল মুসা। তেলের কারণে নাকি হাতের স্পর্শে, বুঝতে পারল না। তবে অস্বস্তি বোধ করতে লাগল।

ডলতে শুরু করল ক্রিসি। আস্তে আস্তে চাপ বাড়াচ্ছে।

'কেমন লাগছে?'

'ভাল,' অস্বস্তি বোধটা চলে যাচ্ছে মুসার।

'তোমার মনে কোন দুশ্চিন্তা আছে,' যেন কথার ছলে কথাটা বলল ক্রিসি। প্রশ্ন নয়।

'উঁহু!'

'স্বীকার না করলে কি হবে? আমি জানি, আছে।...পিঠ অত শক্ত কোরো না। আরও ঢিল করো।...হ্যাঁ, এখন বলো তো দেখি তোমার সমস্যাটা কি?'

চুপ করে রইল মুসা। এক ধরনের ঘোর লাগছে মাথার মধ্যে। ঝিমুনি ঝিমুনি ভাব। স্বপ্নের জগতে চলে যাচ্ছে যেন সে। সত্যি, ম্যাসাজ করতে জানে বটে ক্রিসি। এত আরাম লাগছে! যেন জাদু করে ব্যথাটা কমিয়ে দিচ্ছে।

ঘুমে জড়িয়ে এল তার চোখ।

ঘুমিয়ে পড়ল...

✡

বারান্দা দিয়ে হেঁটে চলল মুসা। পাশে একটা দরজা দেখে থামল। দরজা খুলে উঁকি দিয়ে দেখে একটা বেডরুম। বিছানায় শুয়ে নিশ্চিন্তে নাক ডাকাচ্ছে ওর বন্ধু ড্যানি।

'ড্যানি?' আস্তে করে ডাকল মুসা। 'শুনছ? ওঠো। উঠে পড়ো।'

আড়মোড়া ভেঙে উঠে পড়ল ড্যানি। হাই তুলতে তুলতে জিজ্ঞেস করল, 'কে?'

'আমি, ড্যানি। মুসা।'

ওর কথা যেন শুনতেই পায়নি ড্যানি। দরজার দিকে তাকিয়ে বলে উঠল, 'কেরিআন্টি, দাঁড়াও, আসছি।'

আন্ডারওয়্যার পরা অবস্থায়ই তাড়াতাড়ি বিছানা থেকে নেমে দরজার দিকে এগিয়ে গেল সে। মুসার পাশ দিয়েই গেল অথচ ফিরেও তাকাল না ওর দিকে।

কি হলো? দেখল না কেন ওকে? ড্যানি কি অন্ধ হয়ে গেছে? না সে নিজেই ভূত হয়ে গেছে—মানুষের চোখে অদৃশ্য?

দরজায় দাঁড়িয়ে বারান্দায় উঁকি দিল ড্যানি।

একটা শব্দ কানে আসছে মুসার। নিচতলা থেকে।

আবার খালার নাম ধরে ডাকতে লাগল ড্যানি। তারপর ছুটে বেরিয়ে গেল।

নিচে কিসের শব্দ দেখার জন্যে তার পেছন পেছন দৌড় দিল মুসা। চিৎকার করে সাবধান করল ড্যানিকে, 'ড্যানি, বাইরে যেয়ো না! তত্ত্বাবধায়কটা কোনখান থেকে তাকিয়ে আছে কে জানে!'

কিন্তু শুনল না ড্যানি। ওভাবে আন্ডারওয়্যার পরেই নিচতলার সদর দরজার কাছে গিয়ে দরজা খুলে বাইরে তাকাল। গ্যারেজ থেকে মনে হয় শব্দটা আসছে। গাড়ির গায়ে সিরিশ দিয়ে ঘষছে যেন কেউ।

'কে ওখানে?' চিৎকার করে জিজ্ঞেস করল ড্যানি।

'যেয়ো না, যেয়ো না!' বন্ধুর পাশে এসে দাঁড়াল মুসা। 'ওই লোকটাই হবে।'

শুনল না ড্যানি। 'কে কে' করতে করতে বেরিয়ে চলে গেল। হাত ধরে টেনে ওকে ভেতরে নিয়ে আসার চেষ্টা করল মুসা। কিন্তু জোর পেল না। মনে হলো একটা ছায়াকে ধরেছে। খুব সহজেই ওর হাতের মুঠো থেকে পিছলে বেরিয়ে অযত্নে বেড়ে ওঠা লন ধরে দৌড় দিল ড্যানি।

'ড্যানি, আল্লার দোহাই লাগে তোমার, থামো!' চিৎকার করে বলল মুসা।

গ্যারেজের ভেতরে ঘষার শব্দ থেমে গেছে। সুইচের জন্যে হাতড়াতে শুরু করল ড্যানি। পাওয়ার পর যখন টিপে দিল তখনও অন্ধকার হয়ে রইল গ্যারেজ। আলো জ্বলল না। ভ্রূকুটি করল সে। বড় বড় হয়ে গেল চোখ যখন দেখল তার আন্টির গাড়ির বেশ খানিকটা জায়গার রঙ ঘষে ঘষে তুলে ফেলা হয়েছে।

'তুলুক,' তাগাদা দিল মুসা, 'দেখার দরকার নেই। জলদি চলো এখান থেকে।'

গ্যারেজের ভেতরে শব্দ হলো আবার। বোকার মত দুঃসাহস দেখিয়ে বসল ড্যানি। গ্যারেজের ভেতরে যেতে যেতে ডাকল, 'অ্যাই, কে ওখানে?'

ঝপঝপ করে একগাদা তরল পদার্থ এসে পড়ল ওর গায়ে। ভিজে গেল গা। ঝনঝন করে মেঝেতে একটা বালতি পড়ার শব্দ হলো। কি ঘটছে ও কিছু বুঝে ওঠার আগেই খস করে ম্যাচের কাঠি জ্বলে উঠল। গাড়ির হুডের কাছে দাঁড়িয়ে আছে একটা ছায়ামূর্তি। বিদঘুটে গন্ধ ঢুকল মুসার নাকে।

'ড্যানি!' চিৎকার করে উঠল সে। একটা অদ্ভুত ব্যাপার লক্ষ করছে, যতই চিৎকার করুক না কেন, গলা দিয়ে স্বর বেরোয় না।

জ্বলন্ত ম্যাচের কাঠি ড্যানির দিকে ছুঁড়ে মারল ছায়ামূর্তি। বুকে লেগে কাঠিটা পড়ল পায়ের কাছে জমে থাকা পেট্রলে। দপ করে জ্বলে উঠল আগুন। একটা সেকেন্ড বোকা হয়ে আগুনের দিকে তাকিয়ে রইল ড্যানি। পরক্ষণে জীবন্ত এক মানব-মশালে পরিণত হলো। দাউ দাউ করে জ্বলে উঠল কমলা রঙ আগুন। মুহূর্তে ছড়িয়ে পড়ল পা থেকে মাথায়। অদ্ভুত এক কাকতাড়ুয়া পুতুলের মত নাচানাচি শুরু করল ড্যানি। ভয়াবহ যন্ত্রণায় অমানুষিক চিৎকার করছে।

ওকে ধরার চেষ্টা করল মুসা। আগুন থেকে বাঁচাতে চাইল। একটা কিছু করার জন্যে মরিয়া হয়ে উঠল। কিন্তু কিছুই করতে পারল না। কিচ্ছু করার নেই। অনেক দেরি হয়ে গেছে। মাটিতে পড়ে গড়াগড়ি খেতে লাগল ড্যানি। চামড়া পুড়ে, কুঁচকে, বিকৃত হয়ে যাচ্ছে মুখ। মাঢ়ীসহ দাঁত বেরিয়ে পড়ছে। ভয়াবহ দৃশ্য। কিন্তু শুধু চিৎকার করা ছাড়া আর কিচ্ছু করতে পারছে না মুসা। চোখের সামনে প্রিয় বন্ধুর মৃত্যু ঘটতে দেখেও সহ্য করতে হচ্ছে।... চিৎকার...চিৎকার...চিৎকার...

✡

চোখ মেলতে ছাতের দিকে নজর গেল মুসার। প্রথমে বুঝতে পারল না কোথায় রয়েছে। কেয়ারও করল না। যেখানে খুশি থাক। দুঃস্বপ্নটা যে

কেটেছে এতেই সে খুশি। এত ভয়ঙ্কর দুঃস্বপ্ন কমই দেখেছে।

পাশ ফিরে তাকিয়ে দেখল, সোফায় কুকড়ি-মুকড়ি হয়ে ঘুমাচ্ছে ক্রিসি। মুহূর্তে মনে পড়ে গেল ওর কোথায় রয়েছে, বিকেলে কি কি ঘটেছিল, সব।

কিন্তু বিছানায় এল কি করে? ছিল তো টেবিলে। ম্যাসাজে আরাম পেয়ে ওখানেই ঘুমিয়ে পড়েছিল। তারমানে ক্রিসি ওকে বয়ে এনেছে। জোর তো সাংঘাতিক!

উঠে বসল মুসা। ভীষণ ক্লান্তি লাগছে। ঘুমানোর পর এরকম তো লাগার কথা নয়! মাথার মধ্যে ঘোরটা এখনও কাটেনি। গা'টাও গোলাচ্ছে ও। তাতে অবাক হওয়ার কিছু নেই। একে শরীর অসুস্থ, তার ওপর গত কিছুদিন ধরে যে পরিমাণ উত্তেজনা আর মানসিক চাপ যাচ্ছে, এরকম হওয়াই স্বাভাবিক। তবে ঘাড়ের ব্যথাটা কমেছে। বাড়ি যাওয়ার তাগিদ অনুভব করল সে। নিজের বিছানায় ছাড়া ঘুমিয়ে শান্তি নেই।

দুঃস্বপ্নটা চেপে আছে এখনও মনে। ড্যানির পুড়ে যাওয়ার দৃশ্যটা এতই বাস্তব লেগেছিল, ভুলতে পারছে না। এত জায়গা থাকতে কেন কেরিআন্টির বাড়িতে ওকে দেখল, তারও যুক্তিসঙ্গত কারণ আছে। ড্যানির ওখানে যাওয়ার সম্ভাবনাই সবচেয়ে বেশি। যদিও কাউকে বলে যায়নি। কিন্তু অনুমান করতে কষ্ট হয় না।

কেরিআন্টি থাকেন সান্তা বারবারায়।

বিছানা থেকে নেমে একটা তোয়ালে টেনে নিয়ে বাথরুমে রওনা হলো মুসা। ম্যাসাজ টেবিলটার পাশ কাটানোর সময় ফোনের ওপর নজর পড়তেই থমকে দাঁড়াল। একটা ফোন করলে কেমন হয়? দূর! কি ভাবছে! স্বপ্ন কখনও সত্যি হয় নাকি?

কিন্তু ইচ্ছেটা তাড়াতে পারল না মন থেকে। শেষে পা টিপে টিপে এগিয়ে গিয়ে তুলে নিলে রিসিভার। ক্রিসির দিকে তাকাল। তেমনি ঘুমাচ্ছে। নম্বর টিপল। ওপাশে রিঙ হচ্ছে। দুরুদুরু বুকে অপেক্ষা করছে মুসা।

ফোনটা ড্যানিই ধরল। কণ্ঠ শুনে বোঝা গেল ঘুম থেকে উঠে এসেছে। তাতে অস্বস্তি বোধ করল না মুসা। দুঃখ নেই মোটেও। বরং স্বস্তি। একটা বিরাট বোঝা নেমে গেল মন থেকে। স্বপ্নটা মিথ্যে। ড্যানি বেঁচে আছে।

'কি ব্যাপার?' জানতে চাইল ড্যানি।

'তুমি ভাল আছ নাকি শিওর হয়ে নিলাম।'

হাই তুলল ড্যানি। 'ভালই আছি। এখানে এসেছি তুমি জানলে কি করে?'

'অনুমান,' স্বপ্নের কথাটা চেপে গেল মুসা। 'সরি, তোমার ঘুমটা ভাঙিয়ে দিলাম। যাও, শুয়ে পড়োগে। কেরিআন্টি কোথায়?'

'বেড়াতে গেছে।'

'আচ্ছা, রাখি। দুদিন পর যোগাযোগ করব।'

'ওখানে সব ঠিক আছে?'

'আছে। গুড নাইট, ড্যানি।'

'গুড নাইট।'

রিসিভার নামিয়ে রাখল মুসা। ফিরে তাকাতে দেখে সোফায় সোজা হয়ে বসে আছে ক্রিসি। চোখে চোখ পড়তে হাসল। 'কোথায় ফোন করলে?'

'সান্তা বারবারায়। আমার এক বন্ধুকে।'

'অ। কেমন লাগছে এখন?'

'ব্যথাটা কমেছে।'

আবার হাসল ক্রিসি। কমতেই হবে। বলেছিলাম না, আমার ম্যাসাজে জাদু আছে?...যাচ্ছ কোথায়?'

'বাথরুমে। বাড়ি যাব। ঘুমাতে হবে।'

'কেন, এখানে অসুবিধে কি?'

'আমার কোন অসুবিধে নেই। অসুবিধেটা আপনার। বিছানা আমি দখল করে রাখলে সোফায়ই থাকতে হবে আপনাকে...'

'তাতে কি? আমার অসুবিধে হচ্ছে না।'

'কিন্তু আমার হবে। অস্বস্তিতে ঘুমাতে পারব না আমি। শরীরটাও যে রকম খারাপ লাগছে, না ঘুমালে মারা পড়ব।'

বাথরুমের দিকে এগোল মুসা।

দশ

পরদিন রবিবার। সকালবেলা রবিনকে ফোন করল কিশোর। খবর আছে। ডেভন ব্লেকের দোকানের নতুন মালিক ওরই চাচা উইনার ব্লেক। মিসেস ব্লেকের কাছ থেকে কিনে নিয়েছে দোকানটা। লোকটা কোন সহযোগিতা করতে রাজি হয়নি। এমনকি ব্লেকের বাড়ির ফোন নম্বরটাও দিতে চায়নি।

রবিনকে মাথা ঠাণ্ডা রাখার পরামর্শ দিল কিশোর। গোস্ট লেনে এখন ঘনঘন যাওয়া তার পক্ষে সম্ভব নয়। বহুদিন পর বাড়ি ফিরেছে। ইয়ার্ডে কাজ জমে গেছে অনেক। তা ছাড়া আরও কাজ আছে।

সারাটা দিন মুসার সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করল রবিন। কিন্তু পেল না ওকে। কোথায় যে গেছে, কেউ বলতে পারল না।

সোমবারেও মুসার খবর নেই।

এমনকি সোফির শেষকৃত্য অনুষ্ঠানেও যোগ দিতে এল না।

ব্ল্যাক ফরেস্ট গোরস্থানের গির্জার সামনে রাখা হলো কফিন। আত্মীয়-স্বজন বন্ধু-বান্ধবরা এল শোকের কালো পোশাক পরে। মারলার পাশে দাঁড়ানো রবিন। চুপচাপ তাকিয়ে আছে কয়েক গজ দূরের কফিনটার দিকে। সোফি যে মারা গেছে, মাথাটা আলাদা, ধড়ের সঙ্গে জোড়া লাগিয়ে সেলাই করে দিয়েছে হাসপাতালের ডাক্তার, এখনও বিশ্বাস করতে পারছে না। একঘেয়ে বিষণ্ণ কণ্ঠে মৃত্যুর ওপারের সেই সবুজ তৃণভূমি আর পাশ দিয়ে বয়ে

যাওয়া টলটলে পানির নহরের বর্ণনা করে চললেন পাদ্রী। রূপকথার মত লাগছে রবিনের কাছে।

অনুষ্ঠান শেষ হতে বহু সময় লাগল। সোফিকে কবর দেয়ার পর তার মা-বাবার কাছে গিয়ে সান্ত্বনা দেয়ার জন্যে নানা কথা বলতে লাগল রবিন। কোন সাহায্য লাগবে কিনা জিজ্ঞেস করল। নিজের কানেই বড় ফাঁপা শোনাল কথাগুলো। কি সাহায্য করবে সে? তাঁদের মেয়েকে ফিরিয়ে দিতে পারবে? সোফি ছিল তাঁদের একমাত্র মেয়ে।

সবাই যার যার বাড়ি ফিরে গেল। রবিনের ফিরতে ইচ্ছে করল না। একা বাড়িতে মন টিকবে না। মুসাকে পাওয়া যাচ্ছে না। ইয়ার্ডে গিয়ে কিশোরের সঙ্গেও আড্ডা দিয়ে সময় কাটানো সম্ভব নয়। ও বলে দিয়েছে ব্যস্ত থাকবে।

গাড়ি নিয়ে পাহাড়ের কাছে চলে এল সে। পাহাড়ে চড়তে ভাল লাগে ওর। কিন্তু আজ লাগল না। চূড়ায় খানিকক্ষণ বসে থেকে আবার নেমে এল নিচের উপত্যকায়। লেকের পাড়ে বসে রইল, ঘোরাঘুরি করল, লেকের শান্ত পানিতে ঢিল ছুঁড়ল। অন্যমনস্ক। সারাক্ষণ মন জুড়ে রইল সোফির মৃত্যু, রহস্যময় তত্ত্বাবধায়কের চিঠি, মুসার জন্যে দুর্ভাবনা।

সারাটা দিন কাটিয়ে সন্ধ্যায় ঘরে ফিরল সে। বাবা-মা ফেরেননি। কি করবে? মুসাকে ফোন করল আবার। পাওয়া গেল না। একটা বই নিয়ে পিঠে বালিশ ঠেকিয়ে আধশোয়া হলো বিছানায়। কিছুতেই মন বসাতে পারল না। ড্যানির চেয়ে বেশি দুশ্চিন্তা হচ্ছে এখন মুসাকে নিয়ে। ড্যানি কাউকে কিছু না বলে পালিয়েছে, বাঁচার জন্যে। মুসাও কি তাই করল?

সারাদিনের পরিশ্রমের ক্লান্তিতে কখন যে ঘুমিয়ে পড়ল, বলতে পারবে না। টেলিফোনের শব্দটা যেন ঘুমের মধ্যেও কানে বোমা ফাটাল তার।

চোখ মেলতেই নজর পড়ল ঘড়ির দিকে। বারোটার বেশি। কেঁপে উঠল বুক। কে করল? কোন দুঃসংবাদ ছাড়া এত রাতে কেন ফোন করবে?

কাঁপা হাতে রিসিভার তুলে নিয়ে কানে ঠেকাল। 'হালো?'

'রবিন?' কাঁদো কাঁদো স্বরে মারলা বলল। 'ড্যানি...'

'কি হয়েছে ড্যানির?'

'ও নেই...'

'ইমপসিবল!'

ফোঁপাতে লাগল মারলা। 'সান্তা বারবারায় ওর খালার বাড়িতে চলে গিয়েছিল। এইমাত্র ফোন করে জানাল আমাকে মুসা। ও বাড়ি ফিরে এসেছে।...তত্ত্বাবধায়ক ঠিকই খুঁজে বের করেছে ড্যানিকে। গায়ে পেট্রল ঢেলে আগুন ধরিয়ে দিয়েছে।...উফ্, কি ভয়ঙ্কর!... রবিন, এবার আমার পালা...'

'মুসা ছিল কোথায় এতদিন, কিছু বলেছে?'

'জিজ্ঞেস করিনি। করতে মনে ছিল না। ড্যানির কথা শুনেই...'

'আমি আসব তোমার ওখানে?'

'না না!' হঠাৎ যেন বহু দূরাগত মনে হলো মারলার কণ্ঠ। 'কেউ আর

এখন আমার কাছে এসো না। আমার কাছ থেকে দূরে থাকো। আমি জানি যে-কোন সময় একটা চিঠি এসে হাজির হবে আমার নামে।'

'কিন্তু মীটিং হওয়া দরকার আমাদের। আলোচনা করতে হবে। পুলিশকে খবর দিতে হবে। আর বসে থাকা যায় না।...অ্যাই, মারলা, আমার কথা শুনছ?'

লাইন কেটে দিয়েছে মারলা। ওকে আর ফোন করে লাভ নেই। ধরবে না।

কিশোরকে ফোন করল রবিন। ঘুম থেকে টেনে তুলল। সব কথা জানাল।

দীর্ঘ কয়েকটা মুহূর্ত চুপ করে থাকার পর কিশোর বলল, 'এখন লাইনে আছে মারলা। তারপর ক্লডিয়া। সবশেষে মুসা। কাল সকালের ডাকেই একটা চিঠি পাবে মারলা, কোন সন্দেহ নেই তাতে। এই তত্ত্বাবধায়ক লোকটা মিথ্যে হুমকি দেয়নি। কাল অবশ্যই একটা মীটিং ডাকা উচিত তোমাদের। যাদের যাদের নাম আছে।'

'আমিও সেকথাই ভাবছি। সকালে?'

'সকালে না, বিকেলে করো। আমিও আসতে পারব। সকালে কাজ আছে।'

'মারলা আর ক্লডিয়া মীটিঙে বসলে হয়। মারলা তো এখনই আমার সঙ্গে কথা বলতে চাইল না। খবরটা দিয়েই লাইন কেটে দিয়েছে। ওর কাছ থেকে দূরে থাকতে বলেছে। কি করব বুঝতে পারছি না।'

'আলোচনায় বসতেই হবে। জায়গা ঠিক করো। বিকেলে হলে আমিও থাকব।'

'কি বোঝাবে ওদের? পুলিশের কাছে যেতে বলবে তো?'

এক মুহূর্ত চুপ করে থেকে কিশোর বলল, 'দেখি, কি করা যায়।'

'সকালে কি কাজ তোমার?'

'ডেভনের দোকানে যাব। তোমাকে নিয়ে যেতে পারতাম, কিন্তু উল্টো রাস্তা হয়ে যায়। বাসে করে চলে যেতে পারব। তোমার আসার দরকার নেই। বরং বাড়িতে থেকে রেস্ট নাও। টাইমসের অফিসেও যাব একবার। বিজ্ঞাপনটা কে দেয় খুঁজে বের করার চেষ্টা করব।'

'পারবে?'

'দেখা যাক। রাখি এখন। অত চিন্তা কোরো না। ঘুম না এলে বরং একটা ঘুমের বড়ি খেয়ে নাও। সকালে উঠে সবার সঙ্গে যোগাযোগ করে আলোচনায় বসার ব্যবস্থা করে রাখবে। সময় আর জায়গা ঠিক করে আমার অ্যানসারিং মেশিনে জানিয়ে রেখো। বাড়ি এসেই যাতে পেয়ে যাই।'

'আচ্ছা।'

'আর, রবিন...'

'বলো?'

'শয়তানটাকে ঠেকাতেই হবে আমাদের। আবার কারও ক্ষতি করার

আগেই।'

'কিন্তু খুঁজে বের করব কিভাবে ওকে?'

'করব। যেভাবেই হোক। ছাড়ব না।'

'অত শিওর হচ্ছ কি করে?'

'অপরাধ করতে করতে এক না এক সময় ভুল করেই ফেলে অপরাধী। অপরাধ বিজ্ঞান তা-ই বলে। তত্ত্বাবধায়কের বেলায়ও এর ব্যতিক্রম হবে না। ঠিক আছে, রাখলাম। কাল দেখা হবে।'

'আচ্ছা।'

লাইন কেটে দিল রবিন। এরপর ফোন করল মুসাদের বাড়ির নম্বরে।

এগারো

পরদিন ব্ল্যাক ফরেস্ট পার্কে আবার মিলিত হলো ওরা। মারলা, ক্লডিয়া, রবিন আর মুসা। আজ দলের দুজন কম : সোফিও নেই, ড্যানিও নেই।

কেউ যেন কারও দিকে তাকাতে পারছে না। মুখ নিচু করে গম্ভীর হয়ে আছে।

সকালের ডাকে ঠিকই একটা চিঠি পেয়েছে মারলা। নামের স্তম্ভে ড্যানির নামটা নেই। সবার ওপরে এখন মারলার নাম। টাইমস পত্রিকায় পার্সোন্যাল সেকশনে একটা সাঙ্কেতিক বিজ্ঞাপন। মানে করলে হয়:

তোমার ডান হাতের তর্জনী কেটে কাটা আঙুল সহ
চিঠিটা ক্লডিয়ার কাছে পাঠিয়ে দাও

কথা বলতে যাচ্ছিল ক্লডিয়া, কিন্তু ওকে থামিয়ে দিল রবিন। কিশোরের জন্যে অপেক্ষা করছে। বাড়ি থেকে বেরোনোর আগেই ফোন করে কিশোরের অ্যানসারিং মেশিনে মেসেজ দিয়ে রেখেছে।

বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হলো না। ঘাসে ঢাকা পাহাড়ের উপত্যকা ধরে লম্বা লম্বা পায়ে হেঁটে এল সে।

ফিরে তাকাল সবাই।

গাছের গোড়ায় হেলান দিয়ে বসেছে মুসা। তার কাছে এসে সবার মুখোমুখি বসল কিশোর।

কথা শুরু করল রবিন, 'একটা কথা এখনও জানানো হয়নি তোমাদের। ওই লোকটা কে, জেনে ফেলেছে কিশোর।'

'কোন লোকটা?' নেহাত সাদামাঠা স্বরে জানতে চাইল ক্লডিয়া।

'সেই লোকটা। মরুভূমিতে যাকে খুন করেছি আমরা।'

মুহূর্তে সতর্ক হয়ে উঠল সবাই। একটা ঘাসের ডগা চিবুচ্ছিল মুসা। তাড়াতাড়ি ফেলে দিয়ে বলল, 'খাইছে! বলো কি? কে?'

'ডেভন ব্রেক।'

'কে সে?'

'সান্তা বারবারার এক দোকানদার।'

'অ,' কোন উৎসাহ পেল না ক্লডিয়া। 'এ কথা এখন জেনেই কি আর না জেনেই বা কি। লোকটা তো এখন মৃত। আমরা ওকে খুন করেছি। কিশোর, তোমার জন্যে আলোচনা আটকে দিয়ে বসে আছে রবিন। কি নাকি বলবে তুমি আমাদের?'

'হ্যাঁ, বলব,' মাথা ঝাঁকাল কিশোর। 'তোমাদের চোখ এড়িয়ে গেছে এমন কিছু পয়েন্ট আমি উল্লেখ করতে চাই। তবে তার আগে একটা প্রশ্নের জবাব দাও তো। ড্যানি কোথায় গিয়েছিল এ কথাটা তোমাদের মধ্যে কে জানতে?'

'কেউ না,' মারলা জবাব দিল। 'কাউকে না জানিয়ে গিয়েছিল। উদ্দেশ্যটাই ছিল জেনে গিয়ে মুখ ফসকে কাউকে যাতে বলে না দিতে পারি আমরা, কোনমতেই তত্ত্বাবধায়কের কানে না যায়।'

'তাহলে তত্ত্বাবধায়ক কি করে জানল ও কোথায় গেছে?' কিশোরের প্রশ্ন।

কেউ জবাব দিতে পারল না।

এক এক করে সবার মুখের দিকে তাকাতে লাগল কিশোর। 'কেউ একজন নিশ্চয় জানো তোমরা। কে?' মুসার দিকে তাকাল সে। 'মুসা, তুমি? তোমার সঙ্গে বেশি ঘনিষ্ঠতা ছিল ড্যানির। বলে গেছে?'

কিশোর ছাড়া অন্য সবাইকে অবাক করে দিয়ে বলে উঠল মুসা, 'ও যে ওর আন্টির বাড়ি গিয়েছিল, এ কথা জানতাম আমি।'

'কি করে?' প্রায় চিৎকার করে উঠল রবিন।

চুপ করে রইল মুসা।

'জবাব দিচ্ছ না কেন?' ভুরু নাচাল মারলা। 'কি করে জানলে?'

'আমি ওকে ওখানে ফোন করেছিলাম। দেখলাম আছে নাকি।...মানে, ভাল আছে নাকি।'

'কিন্তু জানলে কি করে ওখানে আছে?'

মুখ নিচু করল মুসা। হাতের তালু দেখতে দেখতে জবাব দিল, 'জানি না।'

'দেখো, তুমি কিছু লুকাচ্ছ আমাদের কাছে!' কঠোর হয়ে উঠল ক্লডিয়ার কণ্ঠ। 'দুদিন ধরে নাকি তোমার কোন পাত্তা নেই। রবিন বহুবার ফোন করেছে বাড়িতে, তোমাকে পায়নি। কোন বন্ধু-বান্ধবের বাড়িতেও যাওনি। কোথায় ছিলে?'

দ্বিধা করতে লাগল মুসা।

'কোথায় ছিলে?' আবার জিজ্ঞেস করল মারলা।

'একটা মেয়ের বাড়িতে,' অবশেষে জানাল মুসা।

তাজ্জব হয়ে গেল সবাই। মুসা আমান মেয়ের বাড়িতে থেকেছে।

কোন মেয়ে?

কে সে?
কি নাম?
কোথায় থাকে?

'তোমরা চিনবে না,' যেন মস্ত কোন অপরাধ করে ফেলেছে এমন ভঙ্গিতে জবাব দিল মুসা। 'নতুন পরিচয় হয়েছে।'

'কি নাম ওর?' জানতে চাইল রবিন।

'ক্রিসি। ক্রিসি ট্রেভার। আমাদের চেয়ে কয়েক বছরের বড় হবে।'

'ওখানে কেন গিয়েছিলে?'

'ম্যাসাজ করাতে। সেদিন গুড-লাক ফাউনটেইনে বসে বারগার খাচ্ছিলাম। মেয়েটাও খাচ্ছিল। আমাকে পানিতে পয়সা ছুঁড়ে মারতে দেখে প্রশংসা শুরু করল। এভাবেই আলাপ। কথায় কথায় জানাল সে হাসপাতালে কাজ করে। আমিও একসময় বললাম আমার ঘাড়ের ব্যথার কথা। সে তখন বলল, খুব ভাল ম্যাসাজ করতে পারে সে। আমার ব্যথাটা কমিয়ে দিতে পারবে। ঠিকানা দিল, সময় করে যাওয়ার জন্যে। পরশুদিন স্কুলের মাঠে দৌড়াদৌড়ি করে ব্যথাটা বাড়ালাম। ক্রিসির কথা মনে পড়ল। চলে গেলাম ওর কাছে।' খুকখুক করে কাশল মুসা। 'সত্যি, ভাল ম্যাসাজ করে ও। ব্যথাটা কমিয়ে দিয়েছে। সেদিন রাতেই চলে আসতে চেয়েছিলাম। আসতে দিল না। জোর করে ধরে রাখল। বলল, ওর ম্যাসাজ শেষ হয়নি। রোগীকে পূর্ণ সুস্থ না করে বাড়ি পাঠানো উচিত না। কি আর করব!' কৈফিয়ত দেয়ার ভঙ্গিতে বলল, 'জোরাজুরি করেও লাভ হলো না। আসতে দিল না তো দিলই না। নিজের বিছানা ছাড়া ঘুম আসে না বলাতে ঘুমের বড়ি খাইয়ে দিল।'

কয়েক সেকেন্ড নীরবতার পর আবার আগের প্রসঙ্গে ফিরে গেল মারলা, 'ড্যানি যে আন্টির বাড়ি গেছে একথা জানলে কি করে তুমি, এখনও বলোনি কিন্তু।'

'কি বলব?' হতাশ ভঙ্গিতে দুই হাত ওল্টাল মুসা।

'কি করে জানলে?'

'অত দ্বিধা করছ কেন?' মারলার সঙ্গে সুর মেলাল রবিন।

'বলতে তো পারি। কিন্তু বললে তোমরা বিশ্বাস করবে না।'

'কেন? না করার কি হলো? ব্যাপারটা কি বলো তো?'

'ভূত বিশ্বাস করি বলে তো সবাই হাসাহাসি করো আমাকে নিয়ে...'

'তারমানে বলতে চাও ভূতে খবরটা দিয়েছে?' তীক্ষ্ণ হয়ে গেল মারলার কণ্ঠ।

মাথা নাড়ল মুসা, 'কে দিয়েছে জানি না। রাতে দুঃস্বপ্ন দেখলাম। দেখি, ড্যানি আন্টির বাড়িতে গেছে। আমিও আছি সেখানে। রাতে গ্যারেজে একটা শব্দ শুনে দেখতে চলল সে। চিৎকার করে অনেক মানা করলাম। শুনল না। গ্যারেজে ঢুকল। ওখানে অপেক্ষা করছিল লোকটা। একটা ছায়ামূর্তি। বালতিতে করে ড্যানির গায়ে পেট্রল ছুঁড়ে দিয়ে ম্যাচের কাঠি জ্বেলে ছুঁড়ে মারল...উফ্‌, এতই বাস্তব! এখনও দেখতে পাচ্ছি!'

অনেকক্ষণ চুপ থাকার পর ক্রডিয়া বলল, 'আশ্চর্য! স্বপ্ন যে মাঝে মাঝে সত্যি হয় এটাই তার প্রমাণ।...যদিও আমি বিশ্বাস করি না...লোকটার চেহারা দেখেছ?'

মাথা নাড়ল মুসা, 'না। অন্ধকারে লুকিয়ে ছিল। ড্যানির গাড়ির রঙ তুলে ফেলেছিল সিরিশ দিয়ে ঘষে। ঘষার শব্দ করে কৌতূহল জাগিয়ে টেনে নিয়ে গিয়েছিল ড্যানিকে...'

আবার নীরবতা। কাশি দিয়ে সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করল কিশোর। 'যা ঘটার তো ঘটে গেছে, এখন আসল কথায় আসা যাক। যে কারণে আজকের এই মীটিং। আমার একটা পরামর্শ আছে। তোমাদের বাঁচার এখন সবচেয়ে সহজ উপায় হলো পুলিশের কাছে গিয়ে সব জানিয়ে দেয়া।'

'হুঁ, ধরে নিয়ে গিয়ে জেলে ভরুক,' ঝাঁঝাল কণ্ঠে বলল মারলা। 'তাহলে এতদিন গোপন রেখে লাভটা হলো কি?'

'কোন লাভই হয়নি। ক্ষতি হয়েছে বরং অনেক। জেলে ঢোকাটাই এখন তোমাদের জন্যে সবচেয়ে নিরাপদ। মরার চেয়ে জেলে যাওয়া ভাল।'

কাঁপা গলায় মারলা বলল, 'কিন্তু এই তত্ত্বাবধায়ক ব্যাটা ওখানেও আমাদের ছাড়বে না। ড্যানি কোথায় আছে তার জানার কথা নয়। মুসা তাকে বলেনি। আর আমরা তো কেউ জানতামই না। কাণ্ড দেখে মনে হচ্ছে তত্ত্বাবধায়ক সবজান্তা। অলৌকিক ক্ষমতা আছে ওর। দূর থেকে যেন অলৌকিক ক্ষমতা দিয়ে সোফির অ্যাক্সিডেন্ট ঘটাল, ড্যানি কোথায় আছে জেনে নিয়ে পুড়িয়ে মারল...জেলের বদ্ধ জায়গায় আমরা একেবারেই অসহায় হয়ে যাব। বেরোতেও পারব না...'

বাধা দিয়ে বলল কিশোর, 'মুক্ত থেকেই বা কি লাভ হলো ড্যানির? জেলেই বরং তোমরা নিরাপদ। ওখানে অন্তত পুলিশ থাকবে তোমাদের পাহারা দেয়ার জন্যে। তত্ত্বাবধায়কের সাধ্য হবে না ওদেরকে ফাঁকি দিয়ে জেলের মধ্যে ঢোকে...'

'যদি ভূত-প্রেত কিছু না হয়,' বিড়বিড় করল মুসা।

'ভূতফুত কিছু না। ও জলজ্যান্ত মানুষ। মারলার সর্বনাশ করার আগেই ওকে খুঁজে বের করতে হবে আমাদের।'

'কোথায় আছে কি করে জানব?' জিজ্ঞেস করল রবিন।

'তাকে খুঁজতেই বেরিয়েছিলাম আজ সকালে।'

'কোন খোঁজ পেলে?'

'পত্রিকার অফিস থেকে কিছু বের করতে পারিনি। যারা বিজ্ঞাপন দিতে আসে তাদের নামধাম পরিচয় গোপন রাখে ওরা। পুলিশ গিয়ে চাপাচাপি করলে অবশ্য না বলে পারবে না। তবে তার আগে আমি একবার চেষ্টা করে দেখতে চাই।'

'মানে, পুলিশকে সবকথা জানানোর আগে?'

মাথা ঝাঁকাল কিশোর। 'হ্যাঁ। দেখি আরেকটু সময় নিয়ে, আর কিছু বের করতে পারি কিনা।'

'তত্ত্বাবধায়ক ধরা পড়লে খুন হওয়ার আর ভয় থাকবে না আমাদের, এটা ঠিক।' মুখ বাঁকাল ক্লডিয়া। 'কিন্তু অ্যাক্সিডেন্ট করে মানুষ খুনের দায় থেকে রেহাই পাব না কোনমতে।'

'সেটা পরের কথা, পরে দেখা যাবে। এখনকার বিপদ থেকে আগে বাঁচা দরকার।'

'ব্রেকের দোকানে গিয়ে কি জানলে?' জিজ্ঞেস করল রবিন।

'ডেভনের চাচার সঙ্গে কথা বলেছি। বিশেষ সাহায্য-সহায়তা করল না। ও নিশ্চয় কিছু জানে। কিন্তু চেপে গেল আমার কাছে। অনেক চাপাচাপি করে ডেভনদের বাড়ির ঠিকানা আদায় করে এনেছি।'

'ওর মা যেখানে থাকে?'

'হ্যাঁ।'

'দেখা করেছ?'

'না। যাব এখন।'

'আমিও যাব।'

'চলো।'

'মীটিং এখানেই শেষ।' মারলার দিকে তাকিয়ে বলল কিশোর, 'বাড়ি গিয়ে চুপ করে বসে থাকোগে। আমার ওপর ভরসা রাখো। তোমার একটা চুলও ছিঁড়তে পারবে না তত্ত্বাবধায়ক।'

গাড়ির হর্ন শোনা গেল।

ঘনঘন হর্নের শব্দে ফিরে তাকাল সবাই। সোনালি চুল একটা মেয়ে হাত নেড়ে মুসাকে ডাকছে।

'ও-ই ক্রিসি,' উঠে দাঁড়াল মুসা। 'কি জন্যে এল আবার...' পা বাড়াল গাড়ির দিকে।

বারো

সান্তা মনিকায় ছোট একটা লাল ইঁটের বাড়িতে থাকেন মিসেস ব্রেক। কিন্তু পাওয়া গেল না তাঁকে। বার বার দরজার ঘন্টা বাজিয়েও সাড়া মিলল না। বাড়ি নেই। তারমানে দেখা করতে হলে অপেক্ষা করতে হবে।

বাড়িটার আশেপাশে খানিকক্ষণ ঘুরঘুর করল কিশোর আর রবিন। লোকে কিছু বলে না, তবে সন্দেহের চোখে তাকায়।

এ ভাবে ঘোরাঘুরি না করে একটা রেস্টুরেন্টে গিয়ে বসার পরামর্শ দিল রবিন। খাওয়াও যাবে, বসারও ব্যবস্থা হবে।

খাওয়া সারতে ইচ্ছে করে অনেক দেরি করল ওরা। বেরিয়ে এসে আবার মিসেস ব্রেকের দরজার ঘন্টা বাজাল। এবারেও সাড়া নেই। তারমানে এখনও ফেরেননি।

খাওয়া তো হলো। আর কি করে সময় কাটানো যায়? ভাবতে লাগল ওরা। কিশোর বলল, 'চলো, সিনেমা হলে গিয়ে বসে থাকি।'

অতএব গেল সেখানেই। একটা সায়ান্স ফিকশন ছবি। ভবিষ্যতের মানুষদের কাহিনী। যারা মানব-জীবনের ওপর বিরক্ত হয়ে গিয়ে রোবট হয়ে যেতে চায়। সীটে বসে ঘুমিয়ে পড়ল রবিন। আগের রাতে ড্যানির মৃত্যুসংবাদ শোনার পর আর ঘুমাতে পারেনি। কিশোর পর্দার দিকে তাকিয়ে রইল আনমনা হয়ে।

ছবি শেষ হলে রবিনকে ডেকে তুলল সে। রাত দশটা বাজে।

ঘুম খারাপ হয়নি। শরীরটা বেশ ঝরঝরে লাগছে রবিনের।

হল থেকে বেরিয়ে আবার মিসেস ব্রেকের বাড়ি চলল ওরা।

এবার পাওয়া গেল তাঁকে। একবার বেল বাজাতেই খুলে দিলেন। দুজনের ওপর নজর বোলাতে লাগলেন। 'বলো?'

মোটাসোটা, খাটো মহিলা। নার্ভাস ভঙ্গিতে বার বার ডান চোখটা কাঁপে। বয়েসের তুলনায় মাথার চুলে ততটা পাক ধরেনি। ক্লান্ত লাগছে তাঁকে।

'মিসেস ব্রেক?' কিশোর জিজ্ঞেস করল।

মহিলা মাথা ঝাঁকাতে পরিচয় দিল সে, 'আমার নাম কিশোর পাশা। ও আমার বন্ধু, রবিন।'

'আপনার নিখোঁজ ছেলের ব্যাপারে কথা বলতে এসেছি আমরা,' বলে ফেলল রবিন।

ঘাবড়ে গেল কিশোর। এখনই এটা বলা উচিত হয়নি রবিনের। যদি মানা করে দেন মহিলা, কথা বলবেন না, বিফল হয়ে ফেরত যেতে হবে। কষ্ট করে এতক্ষণ সময় কাটানোর কোন অর্থ থাকবে না।

তবে মহিলা ওদের মুখের ওপর দরজা বন্ধ করে দিলেন না। স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল কিশোর।

'আমি কিছু বুঝতে পারছি না...' মহিলা বললেন। 'কি বলতে এসেছ?'

'আপনার ছেলের কি হয়েছে জানি আমরা,' কিশোর বলল। 'সব ঘটনা আপনাকে খুলে বলতে চাই। ঘরে আসব?'

'ডেভিকে তোমরা চিনতে?' অনিশ্চিত শোনাল মহিলার কণ্ঠ।

'না,' জবাব দিয়েই চট করে কিশোরের মুখের দিকে তাকাল রবিন, আবার বেফাঁস কিছু বলে ফেলল কিনা বোঝার জন্যে। তার কোন প্রতিক্রিয়া না দেখে বলল, 'ওকে কবর দিতে সাহায্য করেছে যারা, তাদের মধ্যে আমি একজন।'

কেঁপে উঠলেন মিসেস ব্রেক। 'কে তোমরা?'

'নাম তো বললামই,' জবাব দিল কিশোর। 'আমরা শখের গোয়েন্দা।'

দীর্ঘ একটা মুহূর্ত দুজনের দিকে তাকিয়ে চুপ করে রইলেন মহিলা। তারপর সরে জায়গা করে দিলেন, 'এসো।'

বসার ঘরে ওদের বসতে দিয়ে বললেন, 'আমি কফি খাব। তোমরা

খাবে?'

'কফি?' কিশোর বলল, 'এসব জিনিস আমরা খুব একটা খাই না। ঠিক আছে, দিন এককাপ। শরীরটা ম্যাজম্যাজ করছে। সেই কখন থেকে এসে আপনার বাড়ির কাছে ঘুরঘুর করছি দেখা করার জন্যে…'

'আমার বোনের বাড়িতে গিয়েছিলাম। বোসো এক মিনিট। নিয়ে আসছি।'

রান্নাঘরে চলে গেলেন মিসেস ব্রেক।

ঘরের চারপাশে চোখ বোলাতে গিয়ে দেয়ালে ঝোলানো একটা বাঁধানো ফটোগ্রাফ চোখে পড়ল রবিনের। কিশোরের গায়ে কনুইয়ের গুঁতো দিয়ে বলল, 'ওই যে, ডেভন।'

ছবিটার দিকে তাকিয়ে কাঁটা দিল রবিনের গায়ে। ওর মনে হলো, ওরই দিকে তাকিয়ে আছে ডেভন। ছবির চোখে যেন নীরব জিজ্ঞাসা—কেন আমাকে এত তাড়াতাড়ি দুনিয়া থেকে সরিয়ে দিলে? কি ক্ষতি আমি করেছিলাম তোমাদের? তাকিয়ে থাকতে পারল না সে। চোখ সরিয়ে নিল।

ট্রেতে করে কফি নিয়ে এলেন মিসেস ব্রেক। কেটলি থেকে কাপে কফি ঢালতে তাঁকে সাহায্য করল কিশোর।

ওদের মুখোমুখি চেয়ারে বসলেন মিসেস ব্রেক। কাপে চুমুক দিলেন। 'হ্যাঁ, বলো, কি বলতে এসেছ।'

কনসার্ট দেখে ফেরার পথে মরুভূমিতে যা যা ঘটেছিল, খুলে বলল রবিন। কবর দেয়ার কথায় আসতেই নীরবে কাঁদতে শুরু করলেন মহিলা। রবিনের চোখেও পানি এসে গেল। পুলিশের কাছে কেন যায়নি ওরা এই কৈফিয়ত দিতে গিয়ে কথা আটকে যেতে লাগল তার মুখে।

'আপনাকে খবর দেয়ার কথা ভেবেছি আমরা,' রবিন বলল। 'লোকটা কে, কোথায় বাস করে, কিছুই জানতাম না। জানলে খবরটা ঠিকই দিতাম, যেভাবেই হোক। এই যে, জানার পর পরই চলে এলাম, একটুও দেরি করিনি…ওর বাড়িতে কি করে খবর দেয়া যায় সেটা নিয়ে অনেক ভেবেছি আমরা। একবার মনে করলাম পুলিশকে একটা উড়োচিঠি দিয়ে জানিয়ে দিই অমুক জায়গায় অমুক দিন একটা অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে। লাশটাকে অমুক জায়গায় কবর দেয়া হয়েছে। কিন্তু তাতেও ভয় ছিল খোঁজ করতে করতে ঠিকই আমাদের হদিস করে ফেলবে পুলিশ।' দম নেয়ার জন্যে থামল সে।

'সত্যি বলছি, বিশ্বাস করুন,' আবার বলল রবিন, 'ওকে খুন করতে চাইনি আমরা। কিভাবে গাড়ির নিচে চলে এল সেটা এখনও মাথায় ঢুকছে না আমার। লাশটা দেখার পর মনে হয়েছিল, রাস্তার ওপর শুয়ে ছিল আপনার ছেলে। বেহুঁশ হয়ে। অন্ধকারে স্রেফ তার ওপর দিয়ে গাড়িটা চালিয়ে দেয়া হয়েছে। চাকার নিচে কিছু পড়েছে বোঝার সঙ্গে সঙ্গে ব্রেক কষে গাড়ি দাঁড় করিয়ে ফেলে আমার বন্ধু ড্যানি। নিচে নেমে দেখি…কি আর বলব!…মিসেস ব্রেক, আপনার ছেলেকে খুন করেছি আমরা। যে কোন শাস্তি দিতে পারেন আমাদের। ইচ্ছে করলে এখনই পুলিশে ফোন করে আমাকে ধরিয়ে দিতে

পারেন।'

রবিনকে অবাক করে দিয়ে তার বাহুতে হাত রাখলেন মহিলা। বিশ্বাস করতে পারল না সে। রেগে ওঠার বদলে সহানুভূতি দেখাচ্ছেন। আশ্চর্য!

'ওর লাশের কি হলো এটা নিয়ে অনেক ভেবেছি আমি,' মিসেস ব্লেক বললেন। 'রোজ রাতেই বিছানায় শুয়ে শুয়ে ভাবতাম, কোথায় পড়ে আছে লাশটা? জানতাম মারা গেছে ও। কে খুন করেছে তা-ও জানি। তোমরা ওকে খুন করোনি, রবিন। অহেতুক কষ্ট পাওয়ার দরকার নেই। ওর লাশের ওপর দিয়ে গাড়ি চালিয়েছিল তোমার বন্ধু। তোমাদের গাড়ির নিচে চাপা পড়ে মারা যায়নি। আগেই খুন হয়ে গিয়েছিল।'

চোখে অবিশ্বাস নিয়ে মহিলার দিকে তাকিয়ে আছে রবিন। কিশোর নির্বিকার। রবিন তাকাতেই চোখ টিপল। অর্থাৎ, কি, বলেছিলাম না?

কফির কাপটা নামিয়ে রেখে চেয়ারে হেলান দিলেন মিসেস ব্লেক। 'পুরো ব্যাপারটা তোমাদের খুলেই বলি! খুব মানসিক কষ্টে আছ তোমরা, বোঝা যাচ্ছে।' কপালে হাত ডললেন তিনি। 'তোমাদের সব বলতে পারলে আমারও মনটা খানিক হালকা হবে।'

চুপ করে রইল ওরা। শোনার জন্যে অপেক্ষা করছে।

কপাল থেকে হাত নামালেন মিসেস ব্লেক। 'কোনখান থেকে শুরু করব? প্রথম থেকেই বলি সব। ভালই চলছিল আমাদের মা-ছেলের সংসার। ঠিকমত দোকানে যেত ডেভি, ব্যবসা করত, ঠিকমত বাড়ি ফিরত। কোন রকম বদনেশা ছিল না। রাতে খাবার টেবিলে সারাদিন যা যা করত সব আমাকে বলত। একরাতে হঠাৎ করেই মেয়েটার নাম বলল। প্রায়ই আসত সিডি ডিস্ক কিনতে। উদ্ভট গান তার বেশি পছন্দ। মেয়েটার নাম মায়া। তেমন গুরুত্ব দিলাম না। দোকানে কত ধরনের কাস্টোমারই আসে। সবার গানের রুচিও একরকম না। এটা নিয়ে মাথা ঘামালাম না। তবে ঘামানো উচিত ছিল। তাহলে হয়তো আজ আমার ডেভি বেঁচেই থাকত।

'বদলাতে শুরু করল ডেভি। অসহিষ্ণু, বদমেজাজী হয়ে উঠল। কারণে-অকারণে আমার সঙ্গে খেঁচাখেঁচি শুরু করে দিত, আগে যেটা সে কখনোই করত না। ওর এই পরিবর্তনে শঙ্কিত হলাম আমি। অনিদ্রা রোগেও ধরল ওকে। দোকান থেকে দেরি করে বাড়ি ফিরতে লাগল। তারপর একদিন আর ফিরলই না। দুদিন কোথায় কাটিয়ে ফিরে এল। বুঝলাম কোন মেয়ের পাল্লায় পড়েছে। সেই মেয়েটাও হতে পারে, মায়া। ভাবলাম, পড়ে পড়ুকগে। জোয়ান বয়েসী ছেলে। পড়বেই। কিন্তু বাড়ি ফেরার পর কোথায় ছিল জিজ্ঞেস করাতে যখন এড়িয়ে গেল, সন্দেহ হলো আমার।

'তারপর একদিন বাথরুমে তাকে কোকেনের প্যাকেট বাছাই করতে দেখে ফেললাম। কলজে কেঁপে গেল আমার। গানের জগতে হেরোইন আর অন্যান্য নেশায় জড়িয়ে যাওয়াটা একটা অতি সাধারণ ব্যাপার, জানা আছে আমার। এই বিষ যে কোথায় নিয়ে যায় মানুষকে, তা-ও জানা। সাংঘাতিক ভয় পেয়ে গেলাম। একবার অভ্যস্ত হয়ে গেলে সর্বনাশ ঠেকানোর কোন পথই

আর খোলা থাকবে না। ওর বাবা মারা যাওয়ার পর দোকানের ভার ওর ওপরই ছেড়ে দিয়েছিলাম। কোন গণ্ডগোল করেনি কখনও, তাই হিসেব নেয়ার কথাও ভাবিনি। সেদিন ভাবলাম। হিসেব নিতে গিয়ে দেখি কিছুই নেই। সব খুইয়ে বসে আছে। ব্যাংকের অ্যাকাউন্ট শূন্য। আমি একটা স্কুলের টীচার। দোকানদারি না করলেও চলে যাবে মা-ছেলের। তাই দোকানের জন্যে চিন্তা না করে আগে ছেলের দিকে নজর দিলাম। ডাক্তারের কাছে নিয়ে যেতে চাইলাম ওকে। প্রথমে রাজি হতে চাইল না। আমিও লেগেই রইলাম। শেষমেষ আমার চাপাচাপিতে ক্লিনিকে যেতে যেদিন রাজি হলো, সেদিন এমন একটা জিনিস দেখে ফেললাম, বুঝলাম ক্লিনিকে নিয়ে গিয়েও আর লাভ নেই।

'বাগানে ফুলগাছের পাতা ছাঁটতে গিয়ে পচা গন্ধ লাগল নাকে। খুঁজতে খুঁজতে দেখি একটা ঝোপের ধারে নতুন গর্ত। মাটি চাপা দেয়া। অল্প একটু খুঁড়তেই বেরিয়ে পড়ল সবুজ একটা পলিথিন ব্যাগ। তার ভেতরে তিনটে জানোয়ারের ধড়, মাথা কেটে আলাদা করে ফেলা হয়েছে—কুকুর, বেড়াল এমনকি একটা খটাশও আছে। গায়ের চামড়া জায়গায় জায়গায় কামানো। ডেভিকে জিজ্ঞেস করলাম। অস্বীকার করল না ও।

'আমি বাড়ি ছেড়ে চলে যাওয়ার ভয় দেখালাম ওকে। কাকুতি-মিনতি শুরু করল। বলল সব ছেড়েছুড়ে দিয়ে আবার ভাল হয়ে যাবে। আমাকে ছাড়া থাকতে পারে না জানতাম, সেজন্যেই ভয় দেখিয়েছিলাম। কোন বদমাশদের দলে যোগ দিয়েছে জিজ্ঞেস করলাম। বলে দিল সব। ওই মেয়েটাই ওর সর্বনাশ করেছে।

'কয়েক দিন আর বাড়ি থেকেই বেরোল না ডেভি। একদিন মায়া এসে হাজির হলো। ডেভির চেয়ে দু'তিন বছরের ছোট হবে। খুব সুন্দরী। ডেভির সঙ্গে ফিসফাস করে কি সব বলল। সন্দেহ হলো আমার। ওরা গাড়িতে করে বেরিয়ে যেতেই আমিও গাড়ি নিয়ে পিছু নিলাম।

'বড় একটা গুদামের মত বাড়ির সামনে গাড়ি থামাল ওরা। খানিক দূরে গাড়িতে বসে রইলাম। ঘন্টার পর ঘন্টা পার হয়ে গেল। রাত হলো। তখনও ওদের বেরোনোর নাম নেই। আমার আশেপাশে যে সেব লোককে ঘোরাফেরা করতে দেখলাম, একটাকেও ভাল লোক বলে মনে হলো না। সব গুণ্ডাপাণ্ডা। ভয় পাচ্ছিলাম রীতিমত। রাত বারোটা পর্যন্ত বসে থেকে আর থাকার সাহস হলো না। বাড়ি না ফিরে চলে গেলাম আমার বোনের বাড়িতে। কি করা যায় ওর সঙ্গে পরামর্শ করতে।

'পরদিন পুলিশ নিয়ে গেলাম ওই গুদামে। দুজন অফিসার ভেতরে ঢুকল। আমি বসে রইলাম বাইরে, পুলিশের একটা পেট্রল কারে। কিছুক্ষণ পর ফিরে এল অফিসার দুজন। মুখ সাদা। একজন রাস্তার ধারে দেয়ালের কাছে গিয়ে বমি শুরু করল। অন্যজন আমাকে জানাল, ভেতরে কেউ নেই। তবে যা আছে দেখলে সহ্য করতে পারব না। ভাবলাম ডেভির কিছু হয়েছে। লাফ দিয়ে গাড়ি থেকে নেমে দৌড়ে ঢুকে পড়লাম গুদামে।'

অনেকক্ষণ একটানা কথা বলার পর দম নেয়ার জন্যে থামলেন মিসেস

ব্রেক।

'শয়তান উপাসকদের আস্তানা ছিল ওটা, তাই না?' শান্তকণ্ঠে জিজ্ঞেস করল কিশোর।

ভুরু কোঁচকালেন মিসেস ব্রেক, 'তুমি জানলে কি করে?'

'আপনার কথা শুনে। ওভাবে জন্তু-জানোয়ার বলি দিয়ে উপাসনা করে শয়তান উপাসকরাই। বলি দেয়ার জন্যে মানুষ তো আর সহজে মেলে না আজকাল···যাই হোক। কি দেখলেন?'

দৃশ্যটা কল্পনায় ভেসে উঠতে চোখমুখ বিকৃত করে ফেললেন মিসেস ব্রেক। 'কি যে ভয়াবহ দুর্গন্ধ ছিল ওখানে, বলে বোঝাতে পারব না। সব জায়গায় রক্ত, কোথাও শুকনো, কোথাও আধাশুকনো, কোথাও প্রায় তাজা। পশুর চামড়া আর নাড়ীভুঁড়ি ছড়িয়ে আছে সবখানে। বিচিত্র সব নকশা এঁকে রেখেছে মেঝেতে। কোনটা বৃত্ত, কোনটা পাঁচ কোণওয়ালা তারকা, কোনটা ছয় কোণ। ওগুলোর মধ্যে দুর্বোধ্য নানা রকম চিহ্ন আঁকা। কোন কোনটার মধ্যে নামও লিখেছে। সবই রক্ত দিয়ে। কালো রঙের আধপোড়া প্রচুর মোমবাতি পড়ে আছে মেঝেতে। কয়েক সেকেন্ডের বেশি ছিলাম না, কিন্তু তাতেই মাথা ঘুরতে শুরু করল আমার। মনে হলো পাগল হয়ে যাব। ছুটে বেরিয়ে এলাম বাইরে। অফিসাররা আমাকে নানা ভাবে শান্ত করার চেষ্টা করল। ডেভির জন্যে কষ্টে মনটা টুকরো টুকরো হয়ে যাচ্ছিল। এত ভাল স্বভাবের একটা ছেলে আমার এ কাদের সঙ্গে মিশল! ওরা শুধু খারাপ নয়, ভয়ানক খারাপ, নরকের ইবলিস! ছেলের আশা ছেড়ে দিলাম।'

'তারমানে শয়তান উপাসকদের কাণ্ডকারখানা অজানা নয় আপনার?' জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকাল কিশোর।

মাথা ঝাঁকালেন মিসেস ব্রেক। 'না। বইতে পড়েছি।'

'আপনার ছেলেকে ওরা পটিয়ে-পাটিয়ে বলি দেয়ার জন্যে নিয়ে গিয়েছিল।'

আবারও মাথা ঝাঁকালেন মিসেস ব্রেক। চোখে পানি টলমল করে উঠল আবার।

'বলো কি!' আঁতকে উঠল রবিন। 'এই যুগে খোদ আমেরিকা শহরে নরবলি!'

ফিরে তাকাল কিশোর। 'আমেরিকা হলে কি হবে? মানুষের চরিত্র তো আর বদলায়নি। আদিম যুগেই রয়ে গেছে। বিবেক-বুদ্ধি বেশি যাদের, তারা জোর করে খারাপ কাজ থেকে বিরত রাখে নিজেকে। যারা পারে না···যাকগে,' মিসেস ব্রেকের দিকে তাকাল কিশোর, 'তারপর কি হলো?'

'মায়া হলো একজন শিক্ষানবীস,' মিসেস ব্রেক বললেন। 'পুরোপুরি ডাইনী হতে হলে শুধু পশু বলি দিলে চলবে না, নরবলি দিতে হবে। শয়তান উপাসকদের বিশ্বাস, যে যত বেশি মানুষ খুন করতে পারবে, কিংবা অন্যকে প্ররোচনা দিয়ে তার সাহায্যে ছলে-বলে-কৌশলে খুন করাতে পারবে, সে তত বেশি অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী হবে। বলি দেয়া আত্মাগুলো দখলে

চলে আসবে তার। যে যত বেশি নিষ্ঠুর হবে, আত্মাগুলো তার আদেশ তত বেশি পালন করবে। আমার ছেলেকে বোকা পেয়ে প্রথম শিকার হিসেবে তাকে নির্বাচিত করেছিল মায়া।'

'কি করে জানলেন?' জিজ্ঞেস করল রবিন। 'মায়ার সঙ্গে কথা বলেছিলেন? নাকি ছেলেকে জিজ্ঞেস করেছেন?'

মিসেস ব্লেকের এক চোখের পানি গাল বেয়ে গড়িয়ে পড়ল। মোছার চেষ্টা করলেন না তিনি। ধরা গলায় বললেন, 'ওর সঙ্গে আর কখনও দেখা হয়নি আমার। গুদাম থেকে পালানোর দুদিন পর একদিন রাতদুপুরে ফোন করল আমাকে। কেমন আছি জিজ্ঞেস করল। ওটাই তার সঙ্গে শেষ কথা। আর কথাও হয়নি, দেখাও না। নিখোঁজ হয়ে গেল।'

'মায়াকে জিজ্ঞেস করেননি ও কোথায় গেল?'

'না। তবে ওর বাবা-মা'র সঙ্গে দেখা করেছি।'

'কোথায়?' গলা লম্বা করে সামনে মুখ বাড়িয়ে দিল কিশোর। 'কখন?'

'মর্গে। ওদের মেয়েকে শনাক্ত করতে এসেছিল।'

'মায়াও মারা গেছে!'

বিষণ্ণ ভঙ্গিতে মাথা ঝাঁকালেন মিসেস ব্লেক। 'হ্যাঁ। শুনতে হয়তো খারাপ লাগবে তোমাদের, কিন্তু তবু বলি, ও মরাতে আমি খুশি হয়েছি। বেঁচে থাকলে আমার ছেলের মত আরও কত ছেলের যে সর্বনাশ করত কে জানে। যা হোক, আমি সেদিন গুদামে পুলিশ নিয়ে গিয়ে দেখে আসার পর কি ঘটল বলি। গুদামটার ওপর সাদা পোশাকে নজর রাখল গোয়েন্দা পুলিশ। কিন্তু শয়তান উপাসকদের কেউ আর ফিরে এল না সেখানে। মায়ার নাম বললাম পুলিশকে। শুধু নামটাই জানাতে পেরেছিলাম, তখনও ওর পরিচয় জানতাম না। নাম আর চেহারার বর্ণনা।'

'একটা কথা,' বাধা দিয়ে বলল কিশোর, 'ওর চুলের রঙটা বলতে পারেন?'

'সোনালি।'

'হুঁ!' চিন্তিত ভঙ্গিতে নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটল একবার কিশোর।

'একথা কেন জানতে চাইলে?' জিজ্ঞেস করল রবিন।

'আছে, কারণ আছে। মিসেস ব্লেক, আপনি বলুন।'

'মায়া নামের কোন মেয়েকে খুঁজে বের করতে পারল না পুলিশ। ডেভিকেও না। ওর সন্ধান জানার চেষ্টা করতে লাগলাম আমি। পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দিলাম। জানতাম, আর কোনদিন ফিরে আসবে না আমার ছেলে। খুন করে কোথাও ফেলে দেয়া হয়েছে ওকে। তবু, মায়ের মন বুঝ মানল না, দিলাম। এক রাতে পুলিশ ফোন করল। স্যান বার্নাডিনো ভ্যালি হাসপাতালে যেতে অনুরোধ করল আমাকে। একটা মেয়ের লাশ নাকি নেয়া হয়েছে হাসপাতালে যার সঙ্গে মায়ার চেহারা মিলে যায়।

'যাওয়ার ইচ্ছে ছিল না, পুলিশের অনুরোধ এড়াতে না পেরেই গেলাম। দেখা হলো মায়ার মা-বাবার সঙ্গে। মায়াকে শনাক্ত করলাম। ওর আসল নাম

সারাহ্। হার্ট অ্যাটাক হয়ে মারা গেছে। মরার আগে নাকি অদ্ভুত কাণ্ড করছিল সে। একটা বেড়াল বলি দিয়ে সারা গায়ে রক্ত মেখে, কালো মোম জ্বেলে, ঘরের মেঝেতে তারকা এঁকে তার ওপর বসে শয়তানের উপাসনা করছিল। কিছুদিন থেকেই মেয়েকে নিয়ে চিন্তিত ছিলেন তার বাবা। চিৎকার শুনে তার ঘরে গিয়ে দেখেন মেঝেতে লুটিয়ে পড়ে আছে মেয়ে। অবস্থা খারাপ দেখে তাড়াতাড়ি হাসপাতালে নিয়ে গেলেন। হাসপাতালে যাওয়ার কিছুক্ষণ পর মারা গেল সে। মরার আগে পুলিশের কাছে স্বীকার করেছে ডেভিকে সে খুন করেছিল।'

দীর্ঘ একটা মুহূর্ত চুপ করে থেকে দম নিলেন তিনি। তারপর রবিনের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'ডেভিকে তোমরা খুন করোনি। খুন করে মরুভূমিতে ফেলে রেখে এসেছিল তাকে মায়া।'

'কত তারিখ ছিল সেটা?' জানতে চাইল কিশোর।

'জুলাইর একতিরিশ।'

রবিনের দিকে তাকাল কিশোর, 'ওই দিনই তোমরা অ্যাক্সিডেন্ট করেছিলে না?'

'হ্যাঁ।'

মাথা ঝাঁকাল কিশোর। মিসেস ব্রেকের দিকে ফিরল, 'তারপর?'

মিসেস ব্রেক বললেন, 'সারাহ্ নিজের মুখে স্বীকার করেছে ডেভিকে ওইদিন খুন করেছে সে। ওইদিনই রাতে বেড়াল বলি দিয়ে উপাসনা করেছে। ওইদিনই মারা গেছে। হাসপাতালের মর্গে নিজের চোখে ওর লাশ দেখেছি আমি। শুধু আমি একা নই, ওর মা-বাবাও দেখেছেন। ডাইনী তো আর হতে পারল না। শুধু শুধু ছেলেটাকে আমার খুন করল।'

আবার একটা মুহূর্ত নীরব থাকার পর মিসেস ব্রেক বললেন, 'সবই বললাম তোমাদের। ডেভির লাশটা যে খুঁজে পেয়েছ তোমরা, শেয়াল-কুকুরে খাওয়ার জন্যে ফেলে না রেখে কবর দিয়ে এসেছ, সেজন্যে তোমাদের কাছে আমি কৃতজ্ঞ।' আবার গাল বেয়ে চোখের পানি গড়িয়ে পড়তে লাগল তাঁর। 'কোনখানে দিয়েছ, মনে আছে? খুঁজে বের করতে পারবে?'

'পারব,' মাথা কাত করল রবিন।

'ঠিক আছে, একদিন নিয়ে যেয়ো আমাকে।'

'আচ্ছা।'

'আজ তাহলে উঠি আমরা, মিসেস ব্রেক?' কিশোর বলল। 'অনেক রাত হলো। অনেক সময় নষ্ট করলাম আপনার...'

'সময় আর নষ্ট করলে কোথায়? বরং ডেভির খোঁজ জানিয়ে আমাকে কৃতজ্ঞ করে দিলে। অনেক ধন্যবাদ তোমাদেরকে।... কিশোর, সেরাতে তুমিও কি গাড়িতে ছিলে?'

'না, আমি ছিলাম না। বেড়াতে গিয়েছিলাম। আমি তখন লস অ্যাঞ্জেলেস থেকে বহুদূরে। রবিন আর মুসা আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধু। ফিরে এসে যখন শুনলাম, মনটাই খারাপ হয়ে গিয়েছিল। মানুষ খুনের দায়ে ওরা জেলে যাবে, এটা

ভাবতেও কষ্ট হচ্ছিল…'

'না জেনে শুধু শুধুই কষ্ট পেয়েছ তোমরা। খুন করেছে আরেকজন, ভোগান্তিটা গেল তোমাদের…'

'ওহ্‌হো, মিসেস ব্রেক, একটা কথা,' কিশোর বলল, 'জিজ্ঞেস করতেই ভুলে গেছিলাম। মনে করতে হয়তো খারাপ লাগবে আপনার। তবু এত কথা যখন বললেন, এটাও জেনেই নিই। কিভাবে খুন করেছিল সারাহ্, বলেছে?'

কেঁপে উঠলেন মিসেস ব্রেক। ঠোঁটের কোণ কুঁচকে গেল। 'ঘুমের মধ্যে মাথার চাঁদিতে হাতুড়ি দিয়ে পিটিয়ে চোখা একটা পেরেক ঢুকিয়ে দিয়েছিল ডাইনীটা…'

আর বলতে পারলেন না মিসেস ব্রেক। ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলেন।

তাঁকে শান্ত হওয়ার সময় দিল কিশোর। রবিনের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'পেরেক-টেরেক কিছু দেখেছিলে তোমরা?'

'নাহ্,' মাথা নাড়ল রবিন। 'অত কিছু দেখার মত অবস্থা ছিল না কারও। সবাই খুব অস্থির হয়ে পড়েছিল। আতঙ্কিত।'

'হুঁ। তারমানে খুঁজলে এখনও চাঁদিতে পেরেকটা পাওয়া যাবে।'

'চাঁদিতে পেরেক ঢোকালে তো মাথা থেকে রক্ত বেরোত। ঠোঁটের কোণ থেকে কেন?'

'সরু পেরেক ঢোকালে রক্ত আর কতটা বেরোবে? সামান্যই। ব্যথার চোটে মরার আগে নিশ্চয় জিভে কামড় লেগে গিয়েছিল ডেভনের। জিভ কেটে রক্ত বেরিয়ে ঠোঁটের কোণে লেগে গিয়েছিল।' উঠে দাঁড়াল কিশোর। মিসেস ব্রেককে সান্ত্বনা দেয়ার ভাষা খুঁজে পেল না। কোনমতে বলল, 'আজ তাহলে যাই, মিসেস ব্রেক…'

'বোসো। যাওয়ার আগে আরও একটা অদ্ভুত খবর শুনে যাও। পরদিন সারাহ্‌র বাবা মিস্টার জবার মর্গ থেকে মেয়ের লাশ আনতে হাসপাতালে গিয়েছিলেন। কবর দেয়ার জন্যে। পাওয়া যায়নি লাশটা। রহস্যময় ভাবে গায়েব হয়ে গিয়েছিল। পুলিশ অনেক চেষ্টা করেও হদিস করতে পারেনি লাশটার কি হয়েছিল।'

এটা একটা খবর বটে। চোখমুখ কুঁচকে ফেলল কিশোর। 'মিস্টার জবারের ঠিকানাটা দিতে পারেন?'

'নাম জানি। কোন শহরে বাস করেন সেটা জানি। কিন্তু ঠিকানা জিজ্ঞেস করিনি। পুরো নাম গ্রেগরি জবার। রিভারসাইডে থাকেন। ইনফরমেশন থেকে ওদের ফোন নম্বর জেনে নিতে পারলে ঠিকানা বের করা কঠিন হবে না।'

রবিনের দিকে তাকাল কিশোর, 'চলো। মিসেস ব্রেককে অনেক কষ্ট দিয়েছি আমরা। ওনার এখন একা থাকা দরকার।…অনেক ধন্যবাদ আপনাকে, মিসেস ব্রেক। আমাদের দিয়ে যদি কোন রকম সাহায্য হবে মনে করেন কখনও, দ্বিধা-সঙ্কোচ না করে খবর দেবেন।'

তেরো

জবারের বাড়ি যাওয়ার জন্যে অস্থির হয়ে উঠল কিশোর। ইনফরমেশন থেকে ঠিকানা জোগাড় করেছে। কিন্তু রবিন বলল আগে মারলাকে দেখতে যাওয়া দরকার। পার্কের মীটিং থেকে যাওয়ার সময় ওর মনের অবস্থা অত্যন্ত খারাপ ছিল।

মারলাদের বাড়ির সামনে পৌঁছে কিশোরকে গাড়িতে বসতে বলে দেখতে চলল রবিন। মারলার ঘরের একটামাত্র জানালায় আলো জ্বলছে। বাকি পুরো বাড়িটাই অন্ধকার। বারোটা বাজতে কয়েক মিনিট বাকি। ভেজানো দরজা ঠেলে উঁকি দিল রবিন।

চিত হয়ে শুয়ে আছে মারলা। মৃদু শব্দে মিউজিক বাজছে। রবিনের সাড়া পেয়ে ফিরে তাকাল। চোখ কেমন ঘোর লাগা, লাল টকটকে। মাথার কাছের টেবিলে রাখা একটা আধখাওয়া মদের বোতল। অবাক হলো রবিন। মারলা তো মদ খায় না!

'রবিন,' বিড়বিড় করল মারলা, 'তুমি নাকি?'

'কেন দেখতে পাচ্ছ না?' এগিয়ে গিয়ে বিছানার কাছে দাঁড়াল রবিন। 'কি হয়েছে তোমার?'

ছাতের দিকে তাকিয়ে ফোঁস করে নিঃশ্বাস ফেলল মারলা। 'কি হয়েছে? কিছুই না। খুব ভাল আছি আমি। ড্যানির যা অবশিষ্ট আছে, কাল নিয়ে আসবে। ওর মা আমাকে ফোন করে অনুরোধ করেছেন, একটা বাক্স কিনে নিয়ে যেতে পারব কিনা। ভাবতে পারো? দুই হপ্তা আগে রাস্তায় দেখে জোর করে বাজারে ধরে নিয়ে গিয়েছিলেন আমাকে, পছন্দ করে ড্যানিকে একটা প্যান্ট কিনে দেয়ার জন্যে।' কাঁদতে শুরু করল সে। কথা জড়িয়ে গেল। 'আর এখন এল কফিন কিনে দেয়ার অনুরোধ।'

ওর বাহুতে হাত রাখল রবিন। 'ড্যানির জন্যে তোমার চেয়ে কষ্ট আমার কম হচ্ছে না, মারলা। ও আমারও বন্ধু ছিল। তত্ত্বাবধায়কের শয়তানি আমরা বন্ধ করবই। প্রতিশোধ নেব। কিশোর আর আমি অনেকখানি এগিয়ে গেছি। মরুভূমিতে পড়ে থাকা লোকটার মায়ের সঙ্গে কথা বলে এলাম...'

কোন আগ্রহ বোধ করল না মারলা। 'তত্ত্বাবধায়কের সঙ্গে লেগে সুবিধে করতে পারব না আমরা। বরং যা করতে বলে করে ওর হাত থেকে মুক্তি পাওয়া উচিত।'

'না, ওর কথা শুনব না আমরা!'

'শোনাই উচিত! নইলে সোফি আর ড্যানির অবস্থা হবে। বাঁচতে হলে ওর কথা শুনতেই হবে,' ব্যথায় ককিয়ে উঠল মারলা। কপাল থেকে ঘাম গড়িয়ে পড়ল। বোতলটার দিকে বাঁ হাত বাড়াল, যদিও ডান হাত দিয়েই

নেয়ার সুবিধে বেশি।

টান দিয়ে বোতলটা সরিয়ে ফেলল রবিন। 'অনেক খেয়েছ। ঘুমাও এখন। কাল সকালে এসে দেখে যাব আবার।'

বোতলটা দেয়ার জন্যে অনুরোধ করতে লাগল মারলা। নিজে উঠে রবিনের হাত থেকে কেড়ে নেয়ারও যেন শক্তি নেই। বাঁ হাতটা আরও বাড়িয়ে দিয়ে বলল, 'দাও, প্লীজ!'

বার বার বাঁ হাত বাড়াতে দেখে অবাক হলো রবিন। সন্দেহ হলো ওর। একটানে মারলার গায়ের ওপর থেকে চাদরটা সরিয়ে ফেলল।

মারলার ডান হাতে ব্যান্ডেজ বাঁধা। আনাড়ি হাতে বেঁধেছে। রক্তে ভিজে গেছে। রক্ত লেগে গেছে হাতটা বিছানার যেখানে ফেলে রেখেছিল সেখানকার চাদরে।

ডান হাতের তর্জনীটা নেই দেখাই যাচ্ছে।

'মারলা!' চিৎকার করে উঠল রবিন। 'তুমি কি মানুষ! করলে কি করে একাজ! নিজের আঙুল নিজে কেটে ফেললে!'

উঠে বসল মারলা। চোখেমুখে রাগ আর ভয় একসঙ্গে ফুটেছে। 'আর কি করতে পারতাম? একটা আঙুলই তো শুধু গেছে। যাক। প্রাণটা তো বাঁচল। জানো, খুব একটা কষ্ট হয়নি। ভালমত মদ খেয়ে মাতাল হয়ে নিলাম। তারপর ধারাল ছুরি দিয়ে কষে এক পোঁচ। ব্যস, গেল আলগা হয়ে। চিঠিটার সঙ্গে একটা খামে ভরে রেখেছি...'

'থামো! আর শুনতে চাই না!'

থামল না মারলা। 'ওটা এখন নিয়ে যেতে হবে ক্লডিয়ার কাছে। বিজ্ঞপ্তিতে তাই বলেছে। ডাকে তো আর পাঠানো যাবে না। রক্ত দেখলেই সন্দেহ করবে। কি আর করব? নিজেকেই বয়ে নিয়ে যেতে হবে। খামটা একটা পলিথিনের ব্যাগে ভরে নিয়ে যাব।'

'কাজটা করা তোমার মোটেও উচিত হয়নি...'

'এটাই উচিত হয়েছে! তত্ত্বাবধায়ক মানুষ না। পিশাচ! সোফি আর ড্যানির কি দুর্গতি করেছে দেখলেই তো। যেখানে খুশি যেতে পারে সে। যা ইচ্ছে করতে পারে। এর পরেও ওকে ঘাঁটানোর সাহস হবে? কথা না শুনলে কি ঘটত বুঝেই একাজ করেছি। টুকরো টুকরো হয়ে কিংবা ছাই হয়ে মরার চেয়ে একটা আঙুল খোয়ানো অনেক ভাল।'

হতাশ ভঙ্গিতে মাথা নাড়তে নাড়তে রবিন বলল, 'কি জানি কোনটা ভাল! কিন্তু এখন তুমি ওই শয়তানের তারকায় ঢুকে পড়েছ!'

'তাতে কি হয়েছে? একটা আঙুলের বিনিময়ে বেঁচে তো গেলাম।'

'কি জানি বাঁচলে না আরও মরলে! একদিন হয়তো আরও বেশি পস্তাতে হতে পারে এর জন্যে।...ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাব? যাবে?'

অদ্ভুত দৃষ্টিতে রবিনের দিকে তাকাল মারলা। 'সাহায্য লাগবে না। আমি নিজেই গাড়ি চালাতে পারব। মাত্র তো একটা আঙুল গেছে। বাকি নয়টাই এখনও ঠিক। তুমি কি ভেবেছ একটা আঙুল বাদ যাওয়াতেই পঙ্গু হয়ে গেছি

আমি?'

'তোমার আব্বা-আম্মাকে ডাকব?'

'আহ, বললাম তো আমার কোন সাহায্য লাগবে না,' বিরক্ত হলো মারলা। 'এখন ওদের দেখালে হুলস্থুল কাণ্ড বাঁধিয়ে দেবে। যে জন্যে নিজের আঙুল খোয়ালাম, সেটাও আর করতে দেবে না। কথার অবাধ্য না হয়েও তত্ত্বাবধায়কের আক্রোশ থেকে বাঁচতে পারব না তখন। বরং সকলেই জানুক। ততক্ষণে ব্যথাও শুরু হবে, তত্ত্বাবধায়কের ফাঁদ থেকেও বেরিয়ে আসব। ডাক্তারের কাছে যাওয়ার প্রয়োজন মনে করলে নিজেই যেতে পারব···তুমি যাও। এখানে কিছু আর করার নেই। বোতলটা দিয়ে যাও দয়া করে।'

✡

গাড়িতে বসে অস্থির হয়ে উঠেছে কিশোর। এত দেরি করছে কেন রবিন? নেমে গিয়ে দেখে আসার কথা যখন ভাবছে এই সময় এল সে। সব কথা জানাল। জবারের সঙ্গে দেখা করে এসেই ক্লডিয়াদের বাড়িতে যাবে, ঠিক করল ওরা। মারলার পরের নামটা ক্লডিয়ার। তত্ত্বাবধায়ক এরপর ওর নামেই মেসেজ পাঠাবে। মারলা কি করেছে সেটা জানিয়ে ক্লডিয়াকে সাবধান করে দেয়া দরকার।

গাড়ি চালাচ্ছে রবিন। পাশে চুপচাপ বসে আছে কিশোর। নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটছে।

'কি ভাবছ?' রবিনের চোখ সোজা সামনের দিকে। ঝলমলে জ্যোৎস্নার বান ডেকেছে যেন। আকাশে পূর্ণ চাঁদ। 'পূর্ণিমা নাকি আজ? আচ্ছা, শয়তান উপাসকরা কি পূর্ণিমাকে বেছে নেয়? নাকি অমাবস্যা?'

'সেটা নির্ভর করে কোন ধরনের পূজা ওরা করছে।'

'কিশোর, একটা কথা ভাবছি। আমাদের এই তত্ত্বাবধায়কের সঙ্গে ওই শয়তান উপাসকদের কোন সম্পর্ক নেই তো?'

সোজা হলো কিশোর। 'আমিও এতক্ষণ ধরে এই কথাটাই ভাবছি

✡

রিভারসাইডে পৌঁছে মিস্টার জবারের বাড়িটা খুঁজে বের করতে পুরো একটা ঘণ্টা লেগে গেল ওদের। দুজনে একসঙ্গে এসে দাঁড়াল তাঁর দরজার সামনে।

শহরের দরিদ্রতম এলাকায় বাস করেন। এখানে পুরো ব্লকের সব বাড়িই পুরানো। চাঁদের আলোয় বিচিত্র দেখাচ্ছে, যেন কার্ডবোর্ডের তৈরি ছাউনি সব।

মিস্টার জবারের বাড়িটা আরও বেশি পুরানো। মলিন, বিবর্ণ, হতদরিদ্র চেহারা।

দরজায় থাবা দিল কিশোর। বেশ কয়েকবার থাবা দেয়ার পর দরজা খুলে দিলেন একজন বয়স্ক ভদ্রলোক। ছেঁড়া পর্দার ওপাশ থেকে উঁকি দিলেন। বাড়িটার চেহারার সঙ্গে মিল রাখতেই যেন পরনের পোশাকটাও তাঁর অতি পুরানো।

'কি?' জিজ্ঞেস করলেন জবার।

'আমরা আপনার মেয়ের ব্যাপারে কথা বলতে এসেছি,' কিশোর বলল। 'যাদের সঙ্গে মিশেছিল, তারা আবার জ্বালানো শুরু করেছে। আমরা ওদের শয়তানি বন্ধ করতে চেষ্টা করছি। সেজন্যে আপনার সাহায্য দরকার।'

'কে তোমরা?'

'আমার নাম কিশোর। ও রবিন। আমরাও ওদের শয়তানির শিকার। সাংঘাতিক বিপদে ফেলে দিয়েছে। উদ্ধার পেতে চাই।'

'সারাহ্‌কে চিনতে নাকি তোমরা?'

'না। তবে তার সব কথা জানি। কিভাবে মারা গেছে শুনেছি। মারা যাওয়ার আগে যে লোকটাকে খুন করেছে তার কথাও জানি।'

'ওই ইবলিসগুলোর সঙ্গে মেশার আগে একটা পিঁপড়ে মারারও ক্ষমতা ছিল না ওর। কি মেয়েটাকে কি বানিয়ে ফেলল!' কেঁপে উঠল বৃদ্ধের কণ্ঠ। 'এসো। ভাল ছেলে বলেই মনে হচ্ছে তোমাদের। দেখি, কি সাহায্য করা যায়।'

'মিসেস জবারকে ডিস্টার্ব করব না তো আবার?' বিনীত ভঙ্গিতে বলল কিশোর।

'না না, ও ঘুমের বড়ি খেয়ে ঘুমাচ্ছে। একটু আস্তে কথা বললেই হবে। মেয়েটা মারা যাওয়ার পর থেকেই ঘুম-নিদ্রা একেবারে গেছে বেচারির। কড়া কড়া ঘুমের ওষুধ খেয়ে ঘুমাতে হয় এখন।'

বসার ঘরে ওদেরকে নিয়ে এলেন মিস্টার জবার। বয়েস ষাটের কাছাকাছি হবে। সারাহ্‌ নিশ্চয় ওদের বেশি বয়েসের সন্তান। কিংবা পালিতা কন্যাও হতে পারে।

রবিন আর কিশোরকে বসতে দিয়ে বললেন, 'হ্যাঁ, বলো এখন, কি জানতে চাও?'

'কি করে মারা গেল আপনার মেয়ে?' জানতে চাইল কিশোর। সে একাই কথা বলছে। রবিন চুপ করে আছে।

'যেদিন মারা গেল সেদিন রাতে ওর ঘর থেকে একটা চিৎকার শুনলাম। মনে হলো প্রচণ্ড ব্যথায় চিৎকার করছে। দৌড়ে গিয়ে দেখি বুক চেপে ধরে মেঝেতে গড়াগড়ি করছে সারাহ্‌। বুঝলাম হার্ট অ্যাটাক হয়েছে। তাড়াতাড়ি হাসপাতালে নিয়ে গেলাম। ডাক্তাররা অনেক চেষ্টা করেছে। কিন্তু বাঁচাতে পারল না।' বুক চেপে ধরে কাশতে লাগলেন জবার। অবস্থা দেখে মনে হলো যেন তাঁরই হার্ট অ্যাটাক হয়ে যাবে। অনেক কষ্টে কাশি থামিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'আমার মেয়ে মানুষ খুন করেছে একথা তোমাদের কে বলল?'

'মিসেস জোসেফিনা বেক।'

'বেচারি,' একটা সেকেন্ড মুখ নিচু করে রাখলেন মিস্টার জবার। মুখ তুলে জিজ্ঞেস করলেন, 'আমার কাছে কি জানতে চাও?'

'আপনার মেয়ের যে কোন বন্ধুর নাম, যে ওই শয়তান উপাসকদের সঙ্গে জড়িত ছিল, কিংবা এখনও আছে।'

'ওর কোন বন্ধু ছিল না। ও ছিল একেবারে একা। নিঃসঙ্গ। এত সুন্দরী ছিল, কিন্তু কোন দিন কোন ছেলেবন্ধু জোটেনি! কোন ছেলে এসে ওর সঙ্গে যেচে বন্ধুত্ব করতে চায়নি। খুব অবাক লাগত আমার। কোন মেয়ে ওকে কখনও ফোন করত না। কেন, কখনও বুঝতে পারিনি। এখনও পারি না। জন্মের পর থেকেই খুব শান্ত ছিল মেয়েটা। হৈ-হট্টগোল পছন্দ করত না। কারও সঙ্গে কথা বলত না। একা একা নিজের মত থাকত। সেই মেয়েটাই শেষে কি হয়ে গেল!'

'কার সঙ্গে প্রথম মেলামেশা করেছিল, জানেন নাকি?' এতক্ষণে একটা প্রশ্ন করল রবিন। 'কথা তো সে নিশ্চয় কারও সঙ্গে বলেছে নইলে শয়তান উপাসকদের খপ্পরে পড়ল কি করে?'

'নাহ্, জানি না!' ক্ষোভের সঙ্গে জবাব দিলেন মিস্টার জবার। 'যদি জানতাম এই অবস্থা হবে, তাহলে তো কড়া নজরই রাখতাম। কি করে যে ওই ইবলিসগুলোর সঙ্গে পরিচয় হলো, কিছুই বলতে পারব না।'

এদিক ওদিক তাকাতে গিয়ে কয়েকটা বাঁধানো ছবির ওপর দৃষ্টি আটকে গেল রবিনের। একটা বুকশেলফের ওপর দাঁড় করানো। জবারদের পারিবারিক ছবি।

চেয়ার থেকে উঠে পায়ে পায়ে সেগুলোর দিকে এগিয়ে গেল সে। একটা ছবিতে একা একটা মেয়ে বসে আছে। লাল চুল। সবুজ চোখ। বেড়ালের চোখের মত জ্বলছে। মেয়েটার চোখ দেখলেই মনে হয় মানসিক রোগী। কোন সুস্থ-স্বাভাবিক মানুষ এরকম করে তাকায় না। হাত নেড়ে কিশোরকে ডাকল রবিন।

কাছে এসে দাঁড়াল কিশোর, 'কি?'

'দেখো তো চিনতে পারো নাকি?'

একবার তাকিয়েই বলে উঠল কিশোর, 'বিকেলে মুসাকে ডেকেছিল যে সেই মেয়েটার মত না?'

মাথা ঝাঁকাল রবিন। 'হ্যাঁ। কেবল চুলের রঙ বাদে।'

ফিরে তাকাল কিশোর, 'মিস্টার জবার, সারাহ্র কোন যমজ বোন ছিল?'

'না তো!' উঠে এলেন তিনি। 'কেন?'

ছবির দিকে আঙুল তুলল কিশোর, 'আজ বিকেলে অবিকল এই চেহারার একটা মেয়েকে দেখেছি আমরা।'

'কাকে দেখেছ কে জানে। আমার মেয়ে মারা গেছে পনেরো দিন আগে। ওকে দেখতেই পারো না।'

'কিন্তু দেখেছি,' জোর দিয়ে বলল রবিন, 'কোন সন্দেহ নেই আমার।'

'অসম্ভব!' জোর দিয়ে বললেন মিস্টার জবার।

দ্বিধায় পড়ে গেল রবিন, 'চেহারার তো কোন অমিল নেই। চুলের রঙে মিলছে না যদিও। কিন্তু সেটাও কোন ব্যাপার নয়। হেয়ার ড্রেসারের দোকানে গিয়ে যে কেউ লাল চুলকে সোনালি করিয়ে নিতে পারে…'

'ঠিক বলেছ,' ওর সঙ্গে একমত হয়ে বলল কিশোর। 'মিস্টার জবার,

আপনি যা-ই বলুন না কেন, আপনার মেয়ে বেঁচে আছে…'

'কি বলছ তোমরা মাথায় ঢুকছে না আমার! নিজের চোখে ওকে মর্গে মৃত দেখে এলাম…'

'কিন্তু পরদিন গিয়ে আর লাশটা খুঁজে পাননি…'

'পাইনি। তাতে অত অবাক হওয়ার কিছু নেই। হাসপাতালের মর্গ থেকে লাশ গায়েব হওয়াটা নতুন ঘটনা নয়। কঙ্কাল বিক্রির লোভে ডোমেরাই অনেক সময়…'

উত্তেজিত হয়ে সবাই কিছুটা জোরে জোরে কথা বলা শুরু করেছিল, তাতে ঘুম ভেঙে গেল মিসেস জবারের। ভেতরের ঘর থেকে ডেকে জিজ্ঞেস করলেন, 'গ্যারি, কার সঙ্গে কথা বলছ?'

'কারও সঙ্গে না, মাই ডিয়ার,' জবাব দিলেন মিস্টার জবার। 'ঘুম আসছে না তো, একা একাই। তুমি ঘুমাও। আমি আসছি একটু পরেই,' রবিন আর কিশোরের দিকে তাকিয়ে হাত নেড়ে ফিসফিস করে বললেন, 'জলদি পালাও! তোমাদের দেখলে সারারাতেও আর ঘুমাবে না। বকবক করতেই থাকবে।'

বকবকে কিশোরেরও বড় ভয়। রবিনের হাত ধরে টেনে নিয়ে চলল দরজার কাছে গিয়ে ফিরে তাকিয়ে বলল, 'মিস্টার জবার, পরে আপনার সঙ্গে যোগাযোগ করব।'

রবিনকে নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে এল সে। বাইরে বেরিয়েই বলে উঠল, 'সারাহ্‌কেই দেখেছি আমরা। সেরাতে মারা যায়নি সে। হার্ট অ্যাটাকে অনেক সময় 'কমা'তে চলে যায় মানুষ। মৃত্যুর সমস্ত লক্ষণ ফুটে ওঠে শরীরে। ডাক্তাররাও ভুল করে ফেলেন। সারাহ্‌র ক্ষেত্রেও নিশ্চয় ওরকম কিছু ঘটেছিল। হুঁশ ফেরার পর পালিয়েছে।'

'হ্যাঁ, এটা হওয়া বিচিত্র নয়। এমনও হতে পারে হার্ট অ্যাটাকটা ছিল তার বাহানা। মেডিটেশন করে করে এত ক্ষমতাই অর্জন করেছে, ইচ্ছে করলে সুপ্তির এমন এক জগতে চলে যেতে পারে, যাতে মনে হয় মরেই গেছে…অনেক পীর-ফকির তো এসব করেই মানুষকে ধোঁকা দেয়…'

'জানি!' চিন্তিত ভঙ্গিতে মাথা দোলাল কিশোর। 'জলদি গাড়িতে ওঠো। মেয়েটাকে খুঁজে বের করতে হবে।'

'ক্লডিয়াদের ওখানে যাব না?'

'যাও। ওকে সাবধান করা দরকার। তাড়াতাড়ি করো।'

✡

এত রাতেও ক্লডিয়াদের গেট খোলা। হাঁ হয়ে খুলে আছে। হয় কেউ গাড়ি নিয়ে ঢুকেছে, ঢোকার পর আর বন্ধ করেনি। নয়তো কেউ তাড়াহুড়ো করে বেরিয়ে গেছে। লাগানোর সময় ছিল না।

সোজা গাড়িবারান্দায় ঢুকল রবিন। গাড়ি থামাল। নেমে গিয়ে বেল বাজাল। খুলে দিলেন ক্লডিয়ার বাবা মিস্টার নিউরোন। পরনে পাজামা। ঘুম থেকে উঠে এসেছেন। রবিনকে চেনেন।

'এত রাতে তোমারও দরকার পড়ল নাকি ক্লডিয়াকে?' কণ্ঠস্বরেই বোঝা

গেল মেজাজ ভারী হয়ে আছে তাঁর। কোন কারণে খাপ্পা। পুলিশের লোক। চোর-ডাকাত নিয়ে কারবার। মেজাজ খিঁচড়ে থাকাটা অস্বাভাবিক না।

'মানে!' অবাক হলো রবিন। 'কি বলছেন, আঙ্কেল? আরও কেউ এসেছিল নাকি?'

'কি যে সব হয়েছে আজকাল তোমাদের, বুঝি না! আমাদের কি অমন বয়েস ছিল না নাকি? রাত দুপুরে যত্ত সব জরুরী কাজ পড়ে গেল সবার। তোমার দেখা করাটাও নিশ্চয় জরুরী?'

'সত্যি বলছি, আঙ্কেল, আসলেই জরুরী। ক্লডিয়াকে একটু ডেকে দেবেন, প্লীজ?'

'ও কি বাড়ি আছে নাকি যে ডেকে দেব। খানিক আগে মারলা এসেছিল। হাতে করে একটা পলিথিনের ব্যাগ নিয়ে এসেছিল। ডান হাতে তোয়ালে জড়ানো। কি যে বলল ক্লডিয়াকে কে জানে। একটু পরেই দেখি হন্তদন্ত হয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে। জিজ্ঞেস করলাম, কোথায় যাচ্ছিস? বলে, মুসাদের বাড়ি।...কেন?...জরুরী কাজ আছে। এজন্যেই তো বলছি রাত দুপুরে এমন কি কাজ পড়ে গেল যে...' সরাসরি রবিনের দিকে তাকালেন মিস্টার নিউরোন। 'কোথাও যাওয়ার কথা আছে নাকি তোমাদের?'

'আছে' বলাটাই নিরাপদ ভেবে তা-ই বলে দিল রবিন। পুলিশী সন্দেহ এবং জেরা এড়ানোর জন্যে। জেরার মধ্যে পড়লেই ফাঁস করে দিতে হবে সব। কোন উপায় থাকবে না। তার পেট থেকে সমস্ত কথা আদায় করে নেবেন মিস্টার নিউরোন। এখনও সব কথা পুলিশকে জানানোর জন্যে তৈরি নয় ওরা।

'বেরোনোর সময় সঙ্গে করে কিছু নিয়ে গেছে?' জানতে চাইল রবিন।

'হ্যাঁ। একটা পলিথিনের ব্যাগে করে কি যেন নিয়ে গেল।'

'অনেক ধন্যবাদ আপনাকে, আঙ্কেল। শুধু শুধু এত রাতে কষ্ট দিলাম। সরি।'

'কিন্তু ঘটনাটা কি...কোথায় যাচ্ছ তোমরা?'

'পর্বতে,' বলার সময় মিস্টার নিউরোনের দিক থেকে চোখ সরিয়ে রাখল রবিন। মিথ্যে কথা ধরা পড়ে যাওয়ার ভয়ে। তাড়াতাড়ি এসে গাড়িতে উঠল।

দরজায় দাঁড়িয়ে তখনও ওদের দিকে তাকিয়ে আছেন মিস্টার নিউরোন। চিন্তিত মনে হচ্ছে তাঁকে। হাজার হোক পুলিশের লোক। সন্দেহটা বোধহয় ঠিকই করে বসেছেন।

গাড়িতে উঠে কিশোরকে সব জানাল রবিন। তারপর বলল, 'ব্যাপারটা মোটেও ভাল ঠেকছে না আমার, কিশোর। ক্লডিয়া মুসাদের বাড়ি গেল কেন?'

'তাই বললেন নাকি মিস্টার নিউরোন? নিশ্চয় তত্ত্বাবধায়কের কাজে গেছে,' তীক্ষ্ণ হয়ে উঠল কিশোরের গলা। 'আমার দৃঢ় বিশ্বাস মারলার কাটা আঙুল পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মুসাকে জানানোর জন্যে ক্লডিয়াকে জরুরী কোন মেসেজ দিয়েছে তত্ত্বাবধায়ক। জলদি যাও এখন মুসাদের বাড়িতে।'

'ক্ষতির আশঙ্কা করছ নাকি তুমি?'

'সে তো বটেই।'
'কি ক্ষতি?'
'স্টার্ট দাও, বলছি। তোমার নামটা নেই কেন চিঠিতে, বুঝে ফেলেছি আমি। রবিন, ভয়ানক বিপদের মধ্যে রয়েছ তুমি আর মুসা!'

চোদ্দ

চোখ মেলল মুসা। আবার দুঃস্বপ্ন দেখেছে। কদিন ধরে যে কি হয়েছে তার বুঝতে পারছে না। ঘুমালেই দুঃস্বপ্ন দেখে।

ছাতের দিকে চোখ পড়ল। পরিচিত ছাত। নিজেদের বাড়ি।

পাশ ফিরে তাকাল। বিড়ালের মত কুণ্ডলী পাকিয়ে সোফায় ঘুমাচ্ছে ক্রিসি। নিজের ঘরে যেমন ঘুমাত, তেমনি ভাবেই। কিছুতেই ওকে বিছানায় শুতে রাজি করাতে পারেনি মুসা।

হাত-পা টানটান করে দিয়ে আড়ামোড়া ভাঙল মুসা। পা লম্বা করে দিয়ে গড়িয়ে গড়িয়ে নেমে এল বিছানা থেকে। মুখের ভেতরটা শুকনো। মাথা ধরেছে। কদিন ধরে এই ব্যথাটা লেগেই আছে, কখনও টিপ টিপ করে, কখনও তীব্র। ব্যথা কমানোর ওষুধ খেয়েও পুরোপুরি সারানো যাচ্ছে না। সেই সঙ্গে অদ্ভুত একটা ঘোর লাগা ভাব। সেই সঙ্গে ক্লান্তি। বহুবার বলেছে ক্রিসিকে। গুরুত্বই দেয়নি সে। হেসে উড়িয়ে দিয়েছে।

জানালার কাছে এসে বাইরে রাতের শহরের দিকে তাকাল সে। নির্জন রাস্তা। পৃথিবী মনে হচ্ছে না। যেন অন্য কোন গ্রহ। নিজের শরীরটাকেও নিজের লাগছে না তার। পেশিতে পেশিতে ব্যথা। একটা অদ্ভুত ব্যাপার হলো কোনমতেই তাকে কাছছাড়া করতে চাইছে না ক্রিসি। কোন না কোন ছুতোয় সঙ্গে রয়ে যাচ্ছে। বিকেলে মীটিং থেকে ধরে নিয়ে যেতে চেয়েছিল নিজের বাসায়। মুসা রাজি হয়নি। শেষে যেচে-পড়েই ওর সঙ্গে চলে এসেছে ওদের বাড়িতে। খানিকটা গাঁইগুঁই করলেও চক্ষুলজ্জায় সরাসরি মানা করতে পারেনি মুসা।

কিন্তু কেন?

কি চায় ওর কাছে ক্রিসি?

কেন ওর সঙ্গে ছায়ার মত লেগে আছে?

এতদিনে বুঝে গেছে শুধু ম্যাসাজ করার জন্যে ওকে ডেকে নেয়নি সে। তাকে দিয়ে কিছু একটা করাতে চায়। যে কারণে আটকে রেখেছে। নিজের চোখে চোখে রেখেছে। কি করতে হবে সেটা এখনও বলেনি। তবে বলবে। শীঘ্রি। অনুমান করতে পারছে মুসা।

গেট দিয়ে একটা গাড়ি ঢুকল। এঞ্জিনের আওয়াজ শোনা গেল। গাড়ি বারান্দায় এসে থামল গাড়িটা।

ফিরে তাকাল মুসা।

জেগে গেছে ক্রিসি। ওর সবুজ চোখ পুরোপুরি সজাগ। ঘুমের সামান্যতম ছোঁয়া নেই। বিড়ালের মত। বিড়াল যেমন জাগার সঙ্গে সঙ্গে সতর্ক হয়ে যায়, ঠিক তেমনি।

'এত রাতে কে?' দরজার দিকে এগোতে গেল মুসা।

বাধা দিল ক্রিসি। 'দাঁড়াও। ডাকুক আগে। তোমার কাছেই এসেছে।'

সদর দরজায় ঘণ্টা বাজল। চোখের ইশারা করল ক্রিসি, 'এবার যাও। সাবধান থাকবে।'

'কেন?'

'যা বললাম কোরো। আমার কথার অবাধ্য হলে বিপদে পড়বে।'

থমকে গেল মুসা। হুমকি দিল নাকি ওকে ক্রিসি? ওর কণ্ঠস্বর এরকম বদলে গেছে কেন?

আবার ঘণ্টা বাজল। ক্রিসির ব্যাপারটা নিয়ে ভাবতে ভাবতে দরজার দিকে এগোল মুসা। নিচে নেমে দরজা খুলে দিল। ও ভেবেছিল রবিন কিংবা কিশোর হবে। কিন্তু ক্লডিয়াকে আশা করেনি। ওর হাতে একটা পলিথিনের ব্যাগ।

'তুমি!'

'হ্যাঁ,' ভোঁতা, শুকনো গলায় বলল ক্লডিয়া, 'তোমার জন্যে এনেছি এটা।' ব্যাগটা বাড়িয়ে দিল, 'নাও। যা খুশি করো এটা নিয়ে।'

ব্যাগটা নিল মুসা, 'ঘটনাটা কি, বলো তো?'

'মারলা তার কাজ সেরে চিঠিটা পৌঁছে দিয়েছে আমাকে,' কেমন যান্ত্রিক গলায় বলল ক্লডিয়া। 'ওকে যা করতে বলা হয়েছে সে করেছে। আমাকে যা বলা হয়েছে এখন আমি সেটা করলাম।'

'কে বলেছে?'

'তত্ত্বাবধায়ক। আমাদের ডাকবাক্সে একটা নোট পেয়েছি। দুটো মেসেজ লেখা আছে তাতে। একটা আমার জন্যে। একটা তোমার জন্যে। ব্যাগের মধ্যে আছে সেটা। আর একটা পিস্তল আছে।'

'পিস্তল?'

'হ্যাঁ, আমার আব্বারটা। তত্ত্বাবধায়ক তোমার কাছে পৌঁছে দেয়ার হুকুম দিয়েছে আমাকে। মেসেজ পড়লেই সব জানতে পারবে। যা যা দিলাম এই ব্যাগে, সব তোমার প্রয়োজন হবে।'

এই সময় মুসার পাশে এসে দাঁড়াল ক্রিসি।

দেখে চোখ বড় বড় হয়ে গেল ক্লডিয়ার। এক পা পিছিয়ে গেল।

দাঁত বের করে দরাজ হাসি হাসল ক্রিসি। 'পিস্তলটাতে গুলি আছে তো, ক্লডিয়া?'

ঢোক গিলল ক্লডিয়া। 'আপনাকে চেনা চেনা লাগছে?'

'চেনা মানুষকে তো চেনাই লাগবে,' রহস্যময় কণ্ঠে জবাব দিল ক্রিসি। 'সময় যাক, আরও ভাল করে চিনতে পারবে। তোমাকে যা করতে বলা

হয়েছে, করেছ নিশ্চয় ঠিকঠাক মত?'

'আ-আপনাকেও কিছু করতে বলেছে নাকি তত্ত্বাবধায়ক?'

হেসে উঠল ক্রিসি। 'কথা কম বলো। ভাগো এখন, যাও।' ক্লডিয়ার মুখের ওপর দড়াম করে দরজাটা লাগিয়ে দিল সে। মুসার দিকে ঘুরে দাঁড়াল: 'ব্যাগ খোলো।'

ব্যাগের ভেতরে হাতড়াতে লাগল মুসা। ক্লডিয়া তার বাবার পিস্তলটা নিয়ে এসেছে। বের করে হাতে নিল। বলে গেছে গুলি ভরা আছে। দেখার প্রয়োজন বোধ করল না সে। মাথার মধ্যে কেমন করছে। ঘোরটা যেন বাড়ছে। গুলিয়ে যাচ্ছে সবকিছু। এমন লাগছে কেন?

পিস্তলটা একহাতে নিয়ে আবার ব্যাগ হাতড়াল মুসা। মারলার কাটা আঙুলটা বের করে আনল। সঙ্গে সঙ্গে হাত থেকে ফেলে দিল ওটা। ব্যাগ আর পিস্তলটাও পড়ে গেল মেঝেতে। ভাগ্য ভাল, ঝাঁকুনি লেগেও গুলি ফুটল না।

কাটা আঙুল এবং পিস্তল, দুটোই মাটি থেকে কুড়িয়ে নিল ক্রিসি। আঙুলটা নিজের পকেটে ভরে পিস্তলের চেম্বার খুলল। খোলার ভঙ্গি দেখেই বোঝা গেল এ কাজে অভ্যস্ত সে। ব্যবহার করতে জানে।

ম্যাগাজিন গুলিতে ভর্তি।

খলখল করে হেসে উঠল ক্রিসি। 'আজকের রাতটা হবে আমাদের মহাআনন্দের রাত। জলদি তোমার মেসেজটা পড়ে ফেলো।'

কাঁপা হাতে ব্যাগ থেকে কাগজের টুকরোটা বের করল মুসা। দোমড়ানো লাল কাগজে লেখা নোট। জানালা দিয়ে আসা চাঁদের উজ্জ্বল আলোয় লেখাটা পড়ার চেষ্টা করল সে। কষ্ট হলো বুঝতে, তবে পড়তে পারল। উল্টো করে লেখা বাক্যটার মানে করলে হয়:

রবিনের খুলি উড়িয়ে দাও

নোটটাও হাত থেকে খসে পড়ে গেল মুসার। 'আমি পারব না!'

'পারবে, পারবে। না পারার কোনই কারণ নেই। নইলে কি ঘটবে জানো? জেলে যেতে হবে তোমাকে।'

'গেলে যাব। তবু রবিনকে খুন করতে পারব না আমি। মাথা খারাপ নাকি!'

'তাহলে তোমাকে খুন হতে হবে,' কঠিন হয়ে গেল ক্রিসির কণ্ঠ। 'তারপরও বাঁচবে না রবিন। তাকে খতম করার ব্যবস্থা করা হবে। একবার যখন টার্গেট হয়ে গেছে, তত্ত্বাবধায়কের হাত থেকে তার নিস্তার নেই...'

'তত্ত্বাবধায়কের কথা আপনি জানলেন কি করে?'

মুচকি হাসল ক্রিসি। 'কারণ আমিই তত্ত্বাবধায়ক। এতক্ষণে তোমার বুঝে যাওয়ার কথা। আমি তো ভাবলাম বুঝে গেছ।'

মাথার ঘোলাটে ভাবটা কাটছে না মুসার। ঘোরটা যাচ্ছে না। ভাবল, আবার দুঃস্বপ্ন দেখতে আরম্ভ করেছে। 'কিন্তু এভাবে খুন-খারাপি করে, একজনকে দিয়ে আরেকজনকে খুন করিয়ে লাভটা কি আপনার?'

'লাভ আছে। আমার গুরু বলেছেন নিজের হাতে খুন করার চেয়ে অন্যকে দিয়ে খুন করিয়ে মৃত আত্মাগুলোর মালিক হতে পারলে অনেক বেশি ক্ষমতাশালী হওয়া যায়। কারণ এতে চালাকির দরকার হয়। শয়তান নিজে চালাক। তাই চালাক মানুষকে পছন্দ করে। আমি নিজে কতটা চালাক সেটা বোঝার জন্যে, এবং একই সঙ্গে আত্মার মালিক হওয়ার জন্যে এই ফাঁদ পেতেছি আমি। তোমাদের টার্গেট করেছি। কনসার্টের টিকেটগুলো তোমাদের কাছে আমিই পাঠিয়েছিলাম। বোকার মত আমার ফাঁদে ধরা দিয়েছ তোমরা।

'তোমরা কনসার্ট থেকে ফেরার আগে ডেভন গাধাটাকে খুন করে নিয়ে গিয়ে রাস্তায় ফেলে রেখেছিলাম। কাকতালীয় ভাবে হেডলাইট নিভিয়ে গাড়ি চালিয়ে আমার সুবিধে করে দিলে তোমরা। আমার বিশ্বাস, এ ব্যাপারে আমাকে সাহায্য করেছেন খোদ শয়তান। লোকটাকে যে তোমরাই খুন করেছ এটা তোমাদের বোঝাতে কোন কষ্টই হলো না আমার। চিঠি দিয়ে তখন তোমাদের ব্ল্যাকমেইল করা সহজ হয়ে গেল আমার জন্যে। ঘাবড়ে গিয়ে সোফি অ্যাক্সিডেন্ট করে মারা যাওয়াতে আরও ভড়কে গেলে তোমরা! ওকে আর আমার নিজের হাতে মারতে হয়নি। তবে আমার চিঠি পাওয়াতেই ঘাবড়ে গিয়ে অ্যাক্সিডেন্ট করেছে সে। ওর আত্মার মালিক তাই আমি।' শয়তানি হাসি ফুটল ক্রিসির ঠোঁটে। 'ড্যানিকে আমিই পুড়িয়ে মেরেছি। আমার অবাধ্য হয়ে পালিয়ে বাঁচতে চেয়েছিল বলে ভীষণ রাগ হয়েছিল আমার। তবে ওর খোঁজ দেয়ার জন্যে তোমাকে একটা ধন্যবাদ দিতেই হয়...'

'আমি খোঁজ দিয়েছি!' মুসা অবাক। 'কখন?'

'সেরাতে ওকে ফোন করাটা মোটেও উচিত হয়নি তোমার। ফোন করে নিজের অজান্তেই আমাকে জানিয়ে দিলে ও কোথায় আছে...'

রাগ মাথাচাড়া দিচ্ছে মুসার মগজে। পা বাড়াতে গেল সে।

পিস্তল নেড়ে নিষেধ করল ক্রিসি, 'উঁহু! মারা পড়বে! একটু এদিক ওদিক দেখলেই গুলি মেরে দেব। আমি যে সেটা পারব, তোমার বিশ্বাস করা উচিত।'

বিশ্বাস করল মুসা। 'এখন আমাকে কি করতে হবে?'

'বললামই তো, রবিনকে খুন করো।'

'তাতে আমার লাভটা কি হবে? বন্ধুকে খুন করব। তাকে খুনের দায়ে আমাকে ধরে নিয়ে যাবে পুলিশ...'

'নিতে যাতে না পারে, সে ব্যবস্থা আমি করতে পারি। তবে এক শর্তে।'

'বলে ফেলুন।'

'আমাদের দলে যোগ দিতে হবে।'

'শয়তানের দলে!'

'শয়তানকে ঘৃণা করা উচিত না। শয়তান ভীষণ ক্ষমতাশালী। তোমাকে আমার খুব পছন্দ হয়েছে। আমি জানি, গুরুরও হবে। তোমার মত ছেলে

আমাদের দরকার।'

ঘুম ভেঙেছে অনেকক্ষণ। তারপর চমকের পর চমক। আস্তে আস্তে ঘোরটা কেটে যাচ্ছে মুসার। মাথার ভেতরটা পরিষ্কার হয়ে আসছে। কেন এই ঘোর, শরীর খারাপ লাগা, মাথা ধরা, দুঃস্বপ্ন দেখা, তা-ও অনুমান করতে পারছে এখন। ম্যাসাজ করার আগে দুটো করে বড়ি খাইয়েছে ওকে ক্রিসি। নিশ্চয় তার মধ্যে ভয়ঙ্কর নেশা জাতীয় কোন জিনিস দিত। আফিম-টাফিম জাতীয় কিছু। বলল, 'কিন্তু আপনার কথায় বিশ্বাস কি?'

'বিশ্বাস করা ছাড়া আর কোন পথ নেই এখন তোমার। তবে সত্যি বলছি, তোমাকে দিয়ে আমাদের দলের অনেক কাজ হবে। সেজন্যেই তোমাকে মারব না। তা ছাড়া শুরুতেই একটা খুন করে ফেলে সাধনার একটা বড় ধাপ ডিঙিয়ে যাবে তুমি। এরপরের ধাপগুলো ডিঙানো খুব একটা কঠিন হবে না তোমার জন্যে। মহাক্ষমতাধর হয়ে যাবে তুমি অল্প বয়েসেই।' আবার পিস্তল নাচাল ক্রিসি, 'ভেবে দেখো, কোনটা করবে? বেঁচে থেকে ক্ষমতাশালী হবে, না অকালে ধ্বংস হবে?'

ভাবল মুসা। ক্ষমতাশালীও হতে চায় না, ধ্বংসও হতে চায় না। ঘাড় কাত করল, 'ঠিক আছে, আমি রাজি।' হাত বাড়াল, 'দিন পিস্তলটা।'

'উঁহু, অত সহজে না,' মাথা নাড়ল ক্রিসি। 'তোমাকে সেই জায়গাটায় নিয়ে যাব, যেখানে কবর দিয়েছ ডেভনকে। নাটকীয়তার জন্যে করছি ভেবো না। ওর আত্মা ঘোরাফেরা করছে ওর কবরের কাছে। সাধনা করে সোফি আর ড্যানির আত্মাকেও ওখানে পাঠিয়ে দিয়েছি। রবিনকে ওখানে নেয়ার ব্যবস্থা করতে হবে। হলো চারজন। ছয়টা তারকার বাকি দুটো কোণও ভরব আমি আর দুজনকে দিয়ে—মারলা আর ক্লডিয়া। ইতিমধ্যেই তারকার কোণে ঢুকে পড়েছে ওরা। একবার যখন ঢুকেছে, বেরোতে আর পারবে না। তারকার ছয়টা কোণ ভর্তি করার পর মাঝখানে ঢোকাব আমার নাম…'

'কি করে ঢুকবেন? আপনাকেও তো মরতে হবে তাহলে।'

'মরব। তবে আবার বেঁচে ওঠার জন্যে। হৃৎপিণ্ডে ছুরি ঢুকিয়ে আত্মহত্যা করব। তারকার ছয়টা আত্মাকে বশ করার পর ওদের সাহায্যেই বেঁচে উঠব আবার। বেঁচে থাকব অনন্তকাল। অসীম ক্ষমতার অধিকারী হব আমি…'

'আপনার পাগলা গুরুটা বুঝিয়েছে বুঝি এসব?' নেশার ঘোর পুরোপুরি কেটে গেছে মুসার। 'উন্মাদ না হলে কোন ছাগলে বিশ্বাস করে…'

ধক করে জ্বলে উঠল ক্রিসির বিড়াল-চোখ। 'খবরদার, আমার গুরুকে নিয়ে ঠাট্টা করবে না! যা বলছি করো, প্রমাণ পেয়ে যাবে কার কথাটা সত্যি।'

'হ্যাঁ, প্রমাণই দরকার আমার। বলুন, কি করতে হবে।'

পনেরো

মুসাদের বাড়ির সদর দরজায় টেপ দিয়ে সাঁটা কাগজটা প্রথম চোখে পড়ল রবিনের। তাতে গোটা গোটা করে লেখা:

রবিন, মরুভূমিতে সেই লোকটার কবরের কাছে
যাচ্ছি আমি। তুমি এখনই চলে এসো।
আসবে অবশ্যই। জরুরী কথা আছে।—মুসা।

অবাক হলো রবিন। ডেকে দেখাল কিশোরকে।

গম্ভীর হয়ে গেল কিশোর। 'বিপদের গন্ধ পাচ্ছি আমি, রবিন। সাবধান থাকতে হবে।'

'যাবে না ওখানে?'

'যাব তো বটেই। না গেলে মুসাকে বাঁচানো যাবে না। চলো। রাতের বেলা এখন জায়গাটা খুঁজে পাবে তো?'

'পাব।'

খুব একটা অসুবিধে হলো না রবিনের। মোড়ের কাছে পাহাড়ের একটা খাড়া দেয়ালের কাছে এসে গাড়ি থামাল। সেরাতে গাড়ির গুঁতো লেগে বালির দেয়ালে গর্ত হয়ে গিয়েছিল। সেটা দেখাল কিশোরকে।

'রাস্তা থেকে কতটা দূরে কবর দিয়েছিলে?' জানতে চাইল কিশোর। টর্চ জ্বালার প্রয়োজন নেই। দেখার জন্যে চাঁদের আলোই যথেষ্ট।

'এই পঞ্চাশ কদম হবে। কিন্তু আর গাড়ি কই? মুসার তো আমাদের আগেই চলে আসার কথা।'

'যেখানে যেতে বলেছে সেখানে আগে যাই চলো। নিশ্চয় আসবে।'

রাস্তা থেকে নেমে বালির ওপর দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে সেই রাতটার কথা ভাবল রবিন। একটা ভয়াবহ অশুভ রাত। অন্ধকার। ঝোড়ো বাতাসে বালি উড়িয়ে এনে ওদের চোখে-মুখে ফেলছিল। লোকটাকে কবর দিতেও কত যে অসুবিধে ভোগ করেছে ওরা। ইস্, যদি খালি জানত, ও আগেই মরে গিয়েছিল। ওরা খুন করেনি। তাহলে কি এই ঝামেলায় পড়তে হয়।

আকাশের দিকে মুখ তুলে তাকাল। বিশাল গোল চাঁদ। উজ্জ্বল জ্যোৎস্না। আর সেদিন ছিল অমাবস্যার অন্ধকার। কোন কুক্ষণে যে হেডলাইট নিভিয়ে গাড়ি চালানোর বাজিটা ধরেছিল ওরা। ডাকে আসা রহস্যময় টিকিট পেয়ে কনসার্টে যাওয়াটাও পাপ হয়েছে। সেজন্যেই এই শাস্তি…

কিন্তু ওরা কি আর জানত ওদের কোন বন্ধু মজা করে নয়, তত্ত্বাবধায়কই শয়তানি করে টিকেটগুলো পাঠিয়েছিল, ওদের ফাঁদে ফেলার জন্যে। কিভাবে জানবে?

কয়েক মিনিটের মধ্যে ক্যাকটাস আর মরুর শুকনো ঝোপে ঘেরা একটা জায়গায় এসে দাঁড়াল দুজনে। গোল খোলা জায়গাটাকে ঘিরে যেন প্রহরীর মত দাঁড়িয়ে আছে বড় বড় ক্যাকটাসগুলো। চাঁদের আলোয় লম্বা ছায়া পড়েছে মাটিতে। ওগুলোর মাঝখানে তিন-চার ফুট গভীর একটা খাদ। খাদের তলায় পাথরের স্তূপ। বালি খুঁড়ে কবর দেয়ার পর পাথর দিয়ে ঢেকে দেয়া হয়েছিল কবরটা যাতে শেয়াল বা মরুভূমির অন্য কোন লাশখেকো জানোয়ারে তুলে নিয়ে যেতে না পারে।

হাত তুলে দেখাল রবিন, 'ওই যে...'

ওর কথা শেষ হতে না হতেই উহ্ করে উঠল কিশোর। গড়িয়ে পড়ে গেল খাদের মধ্যে।

'কি হলো!' বলে চিৎকার দিয়ে ফিরে তাকিয়েই রবিন দেখল মুসা দাঁড়িয়ে আছে। ওর হাতে একটা বেজবল ব্যাট, কোমরের বেল্টে গোঁজা পিস্তল। ক্যাকটাসের আড়াল থেকে বেরিয়ে এসেছে। বাড়ি মেরে ফেলে দিয়েছে কিশোরকে।

'পাগল হয়ে গেলে নাকি?' বলতে গেল রবিন। কিন্তু তাকেও এক ধাক্কায় খাদে ফেলে দিল মুসা।

খিলখিল হাসি শোনা গেল আরেকটা গাছের আড়াল থেকে। বেরিয়ে এল সোনালি চুল সেই মেয়েটা। ওর হাতেও একটা রূপালী রঙের পিস্তল। আদেশ দিল, 'ব্যাটটা ফেলো। পিস্তল খুলে নাও। শেষ করে দাও ওকে।'

ব্যাট ফেলে কোমর থেকে পিস্তল খুলে নিল মুসা।

বালিতে পড়ায় তেমন ব্যথা পায়নি রবিন। কোনমতে উঠে বসে চিৎকার করে বলল, 'কি করছ, মুসা? তোমার মাথা খারাপ হয়ে গেল নাকি?'

'না,' রবিনের দিকে পিস্তল তাক করে জবাব দিল মুসা, 'আমার মনিব তত্ত্বাবধায়কের হুকুম পালন করছি। ক্লডিয়া এসে এই পিস্তল সহ মেসেজ রেখে গেছে। তাতে বলা হয়েছে গুলি করে তোমার খুলি উড়িয়ে দিতে। সেটাই করতে যাচ্ছি। নইলে ভয়ঙ্কর মৃত্যু ঘটবে আমার।'

'মুসা, শোনো...বোকামি কোরো না...'

পিস্তল কক করল মুসা। 'বিদায়, রবিন।'

'শোনো, মুসা, প্লীজ!'

'কি শুনব?'

'আমাকে খুন করলেও ও তোমাকে ছাড়বে না। আমি জানি...'

'সেজন্যেই তো ওদের দলে যোগ দিতে যাচ্ছি আমি। তোমার আত্মা চুরি করে একদিন মহাক্ষমতাধর হয়ে যাব।'

'এসব কথা তোমাকে বুঝিয়েছে বুঝি ডাইনীটা? তোমার মগজ ধোলাই করে দিয়েছে...'

'দেরি করছ কেন, মুসা?' ক্রিসি বলল। 'গুলি করো।'

'হ্যাঁ, করছি। একটা কথা মনে পড়ল। যুদ্ধের সময় জার্মানরা অনেক বন্দিকে দিয়ে কবর খোঁড়াত, তারপর কবরের কিনারে ওদের দাঁড় করিয়ে গুলি

করত। ডিগবাজি খেয়ে গর্তে উল্টে পড়ত গুলি খাওয়া মানুষগুলো। দেখতে নাকি খুবই ভাল লাগত ওদের। আমার এখন সেটা দেখতে ইচ্ছে করছে।'

হা-হা করে অট্টহাসি হাসল ক্রিসি। নির্জন মরুর বাতাসে ছড়িয়ে পড়ল সে-শব্দ। 'বাহ্, আমার নির্বাচনে ভুল হয়নি। শয়তানের উপাসনা করতে হলে এই মানসিকতাই তো দরকার। যে যত নিষ্ঠুরতাই বলুক এসব কাজকে, আমি বলব না। এগুলোই তো মজা। প্রথম পরীক্ষায় উতরে গেলে তুমি, মুসা! ঠিক আছে, তোমার ইচ্ছেই পূরণ হোক। খাদ থেকে উঠে আসতে বলো ওকে। আমার নির্দেশেরও কিছুটা পরিবর্তন করে দিচ্ছি। মাথায় নয়, পেটে গুলি করো ওর। যাতে অনেকক্ষণ ধরে কষ্ট পেয়ে গুঙিয়ে গুঙিয়ে মরে। দেখতে ভাল লাগবে।'

'অ্যাই, উঠে এসো,' পিস্তল নেড়ে কঠোর কণ্ঠে আদেশ দিল মুসা। চাঁদের আলোয় চকচক করছে কালো নল।

ফিরে তাকাল রবিন। বেহুঁশ হয়ে পড়ে আছে কিশোর। নড়ছে না।

গর্ত থেকে বেরোতে অতিরিক্ত দেরি করল রবিন। ভাবছে, থাবা দিয়ে মুসার হাত থেকে পিস্তলটা ফেলে দেয়া যায় কিনা। কিন্তু তাতেও লাভ হবে না। ক্রিসির হাতেও পিস্তল আছে।

খাদ থেকে উঠে এল রবিন। তার বাঁয়ে রয়েছে এখন ক্রিসি, মুসা ডানে। দুজনেই দাঁড়িয়ে আছে খাদের কিনারে।

'তোমার প্ল্যানটা কি, সারাহ্?' জানতে চাইল রবিন। সময় বাড়াচ্ছে। বাঁচার যদি কোন সুযোগ পাওয়া যায়।

হেসে উঠল ক্রিসি। 'আমি আর এখন সারাহ্ নই। সারাহ্ ঢুকে পড়েছে তারকার মধ্যে। মায়াও নই। সে-ও গেছে। আমি এখন ক্রিসি।'

'আমাদের সবাইকেই তারকায় ঢোকানোর শখ হয়েছে নাকি তোমার?' ক্রিসির পিস্তলটার দিকে তাকাল রবিন।

'শখ নয়, এটা আমার প্রয়োজন। ছয়টা আত্মা দরকার আমার। ছয় কোণে ছয়টা ভরে দিয়ে মাঝখানে থাকব আমি। ওরা হবে আমার গোলাম। তিনটে পেয়ে গেছি—ডেভন, সোফি আর ড্যানি। তোমাকে নিয়ে হবে চারজন। আমার ভাগ্য ভাল, না চাইতেই এসে হাজির হয়েছে আরও একজন,' খাদে পড়ে থাকা কিশোরকে দেখাল ক্রিসি। 'ওকেও নেব। শেষটা পূরণ করে নেব মারলা কিংবা ক্লডিয়াকে দিয়ে। যাকে সুযোগমত পাই।'

'আর মুসা? ওকে দিয়ে কি করবে?'

'ও হবে আমার ডান হাত। আমার বাহন। আমার প্রধান গোলাম। ওকে দিয়ে যা ইচ্ছে করাব আমি…' মুসার দিকে ফিরল ক্রিসি। 'মুসা, দেরি করছ কেন? দাও পেটে একটা বুলেট ঢুকিয়ে। খাদে পড়ে কেঁচোর মত মোচড়াতে থাকুক। আহ্, কি মজাই না হবে দেখতে! করো করো, গুলি করো!'

'হ্যাঁ, করছি,' রোবটের মত যান্ত্রিক কণ্ঠস্বর মুসার। রোবটের মতই নড়ল। পিস্তল তুলল রবিনকে তাক করে। 'নাহ্, হচ্ছে না। এই, আরেকটু পিছাও। খাদের আরও কিনারে যাও! নইলে ডিগবাজিটা হবে না ভালমত।'

পেছনে সরতে গিয়ে কিশোরের দিকে চোখ পড়ল রবিনের। একটু যেন নড়ল মনে হলো? নাকি চোখের ভুল?

পিছিয়ে গেল রবিন।

একসঙ্গে কয়েকটা ঘটনা ঘটল। লাফ দিয়ে সরে গেল মুসা। চরকির মত পাক খেয়ে ঘুরেই বাড়ি মারল ক্রিসির পিস্তলধরা হাতে। ঠিক একই সময়ে ঝটকা দিয়ে উঠে বসে ক্রিসির পা ধরে হ্যাঁচকা টান মারল কিশোর।

মুসার বাড়িতে পিস্তলটা উড়ে চলে গেল ক্রিসির হাত থেকে। কিশোরের টানে পড়ে গেল ক্রিসি খাদের মধ্যে। হাঁচড়ে-পাঁচড়ে ওঠার চেষ্টা করল। কিন্তু ততক্ষণে বেজবল ব্যাটটা তুলে নিয়েছে কিশোর। নির্দ্বিধায় বসিয়ে দিল ক্রিসির মাথায়। এক বাড়িতেই বেহুঁশ।

'ওকে বেঁধে ফেলা দরকার!' চিৎকার করে বলল মুসা। 'ওই ডাইনীকে বিশ্বাস নেই!'

'তারমানে ওর কোন অলৌকিক ক্ষমতাই নেই,' এমন ভঙ্গিতে বলল রবিন, যেন নিরাশই হয়েছে। 'তাহলে এত সহজে কাবু করা যেত না।'

'কথা পরে, আগে দড়ি!' মুসা বলল

'দড়ি কোথায় পাব? গাড়িতেও তো নেই।'

তাড়াতাড়ি কোমরের বেল্টটা খুলে নিল মুসা। ওটা দিয়ে ক্রিসির হাত পিছমোড়া করে নিজেই বাঁধল।

রবিন আর কিশোরও ওদের বেল্ট দুটো খুলে দিল। ভালমত বাঁধতে আর অসুবিধে হলো না।

খাদের কিনারে পা ঝুলিয়ে জিরাতে বসল রবিন। মুসাকে বলল, 'ভাল অভিনয় শিখেছ তো। আমি তো বিশ্বাসই করে ফেলেছিলাম তুমি সত্যি সত্যি ক্রিসির গোলাম হয়ে গেছ।'

'গত কয়েক দিন গোলাম হয়েই ছিলাম। আফিম না কি জানি খাইয়ে আমাকে সারাক্ষণ নেশার ঘোরে রেখে দিত। আজ সেটা সময়মত কেটে না গেলে কি যে ঘটাতাম কে জানে!'

'এমনিতেই কম ঘটিয়েছ নাকি? উফ্,' ঘাড় ডলতে ডলতে বলল কিশোর। 'বাড়িটা আরেকটু আস্তে মারতে পারলে না?'

'পারতাম। তাহলে আমাকে বিশ্বাস করত না ক্রিসি। ফাঁকিটা আর দিতে পারতাম না। সত্যি কি বেহুঁশ হয়ে গিয়েছিলে নাকি?'

'নাহ্,' মাথা নাড়ল কিশোর। 'তুমি যদি অভিনয় করতে পারো, আমি পারব না কেন?...গাড়িটা রেখেছ কোথায় তোমরা? রাস্তায় তো দেখলাম না।'

'মোড়ের কাছ থেকে একশো গজ দূরে, ঝোপের ধারে।' পড়ে থাকা ক্রিসিকে দেখাল মুসা, 'একে নিয়ে যাওয়া দরকার। কিভাবে নেয়া যায় বলো তো?'

'বয়ে নেব, আর কিভাবে?' বলেই কান পাতল কিশোর। 'কিসের শব্দ? পুলিশের সাইরেন না?'

'তাই তো মনে হচ্ছে! খবর পেল কিভাবে?'

কয়েক মিনিটের মধ্যেই বাঁকের কাছে পুলিশের গাড়ি দাঁড়ানোর শব্দ শোনা গেল। দৌড়ে আসতে দেখা গেল কয়েকটা ছায়ামূর্তিকে। সবার আগে আগে ছুটে আসছে একটা মেয়ে।

ক্লডিয়া! চাঁদের আলোতে চিনতে কষ্ট হলো না ওকে।

পিস্তল হাতে খাদের কাছে এসে দাঁড়াল তিনজন পুলিশ অফিসার। তাদের মধ্যে একজন ক্লডিয়ার বাবা মিস্টার নিউরোন।

✡

ফেরার পথে রবিনের গাড়িতে করে চলেছে কিশোর, মুসা আর ক্লডিয়া। ওদের সামনে একটা পুলিশের গাড়ি, পেছনে আরেকটা। সামনেরটাতে তোলা হয়েছে হাতকড়া লাগানো ক্রিসিকে। মুসার জেলপিটা স্টার্ট নিচ্ছিল না, যেটাতে করে সে আর ক্রিসি এসেছে। রাস্তার ধারে ঝোপের ধারেই ওটা ফেলে রবিনের গাড়িতে করে ফিরে চলেছে চারজনে।

গাড়ি চালাচ্ছে রবিন। পাশে মুসা।

পেছনের সীটে কিশোর আর ক্লডিয়া।

'একটা কথার জবাব দাও তো,' কিশোর বলল, 'তুমি জানলে কি করে আমরা এখানে আছি?'

'মুসাকে ব্যাগটা দিয়ে বাড়ি ফিরতেই পাকড়াও করল আমাকে আব্বা,' ক্লডিয়া জানাল। 'দুই ধমক দিয়েই জেনে নিল কোথায় গিয়েছিলাম। সঙ্গে সঙ্গে থানায় ফোন করে পেট্রল কার আনাল। আমাকে নিয়ে ছুটল মুসাদের বাড়িতে। দরজায় মুসার নোটটা দেখে কারোরই বুঝতে অসুবিধে হলো না কোথায় তোমাদেরকে পাওয়া যাবে...'

'হুঁ,' তিক্তকণ্ঠে বলল কিশোর, 'আজকাল আর গোয়েন্দাগিরি নিয়ে গর্ব করার উপায় নেই। সবাই খুব সহজেই সব কিছু বুঝে ফেলে।'

'তাতে কি কোন ক্ষতি হয়েছে?' হাসল ক্লডিয়া। 'ক্রিসি ডাইনীটার বোঝা বওয়া থেকে তো রেহাই পেলে।'

'তা পেয়েছি;' সামনের সীট থেকে বলে উঠল মুসা। 'তবে সবচেয়ে আনন্দ লাগছে ওর ভয়ঙ্কর মায়াজাল কেটে যে বেরোতে পেরেছি সেজন্যে। মাথা থেকে একটা পাহাড় নেমে গেছে মনে হচ্ছে। উফ্, কি ভয়াবহ দুঃস্বপ্নের মাঝেই না কেটেছে পনেরো-ষোলোটা দিন!'

'ডাকে আসা উড়োটিকেট পেলে কনসার্ট দেখতে যাবে আর?' পেছন থেকে হেসে জিজ্ঞেস করল কিশোর।

'আরও! তওবা! তওবা!' দুই গালে চটাস চটাস চাটি মারতে শুরু করল মুসা।

***

সৈকতে সাবধান

প্রথম প্রকাশ: ডিসেম্বর, ১৯৯৮

বিকেলটা মায়ের সঙ্গে কাজ করে কাটাল জিনা। গাড়ি থেকে মালপত্র নামানো, ব্যাগ-সুটকেস খুলে জিনিসপত্র গোছানো, দীর্ঘদিন বন্ধ থাকা ঘরগুলো সাফসুতরো করা, খাবার আর প্রয়োজনীয় জরুরী জিনিস কিনে আনা, অনেক কাজ।

জিনার বাবা মিস্টার পারকার কোন সাহায্যই করতে পারলেন না। করতে এসেছিলেন, কিন্তু কাজের চেয়ে অকাজ বেশি–উল্টোপাল্টা করে কাজ আরও বাড়াতে লাগলেন, শেষে তাঁকে বিদেয় করে দিয়ে রেহাই পেয়েছেন মিসেস পারকার।

বারান্দায় বসে একটা বিজ্ঞানের বইতে ডুবে আছেন এখন মিস্টার পারকার।

বালিয়াড়ির আড়ালে অস্ত যাচ্ছে সূর্য। প্রবল বাতাসে নুয়ে নুয়ে যাচ্ছে বাড়ির পেছনের শরবন। মিসেস পারকার রান্নাঘরে। হট ডগ আর মাংস ভাজার সুগন্ধ ছড়িয়ে পড়েছে।

ডিনারের পর ওপরে চলে এল জিনা। হাত-মুখ ধুয়ে কাপড় বদলানোর জন্যে আলমারি খুলল। অ্যানটিক ড্রেসিং টেবিলে রাখা ঘড়ির দিকে তাকাল। দেরি হয়ে গেছে। মুসারা বসে থাকবে। দেখা করার কথা সাড়ে সাতটায়।

দুই টান দিয়ে পাজামা খুলে মেঝেতে ছুঁড়ে ফেলল সে। আলমারি ঘেঁটে বের করল একটা ডেনিম কাটঅফ।

'সৈকতে যাবে না?' নিচ থেকে শোনা গেল মায়ের কণ্ঠ।

'নাহ্। তুমি যাও,' জবাব দিলেন মিস্টার পারকার। 'আমি এই চ্যাপ্টারটা...'

'একা যেতে ইচ্ছে করছে না। থাক, সকালের নাস্তার জোগাড়টা করে ফেলিগে।'

'কিছুক্ষণ শুয়ে থাকলেও পারো। অনেক পরিশ্রম করেছ।'

'আগে কাজকর্মগুলো সেরে ফেলি, তারপর...'

আয়নার সামনে এসে বসল জিনা। তামাটে চুল অনেক লম্বা হয়েছে। তারপরেও কাটতে ইচ্ছে করল না। ভাবতেই হেসে উঠল তামাটে চোখের বড় বড় দুটো মণি। মনে পড়ল, কয়েক বছর আগের গোবেল বীচের কথা। তখন চুল কেটে ছেলেদের মত করে রাখতে পছন্দ করত সে। এখন রাখে লম্বা চুল। মাত্র কয়েক বছরেই কত পরিবর্তন এসে যায় একজন মানুষের। বিশেষ

করে মেয়েদের। আগে হলে রাফিয়ানকে অবশ্যই সঙ্গে আনত। কোথাও বেড়াতে গেলে ওকে ফেলে যাওয়ার কথা ভাবতেও পারত না। আর এখন দিব্যি ফেলে এসেছে বাড়িতে, রকি বীচের বাড়িতে। আনাটাই বরং ঝামেলার মনে হয়েছে ওর কাছে।

সৈকত শহর স্যান্ডি হোলোতে বেড়াতে এসেছে ওরা। গরমকালটা এখানেই কাটানোর ইচ্ছে মিসেস পারকারের। মিস্টার পারকারের এ নিয়ে কোন মাথাব্যথা নেই। যেখানেই যান, বই আর গবেষণায় ডুবে থাকতে পারলেই তিনি খুশি।

নিচে নেমে হাত নেড়ে মাকে 'গুড-বাই' জানিয়ে বাইরে বেরিয়ে এল জিনা। বাড়ির সামনের দিকটা ঘুরে এসে দ্রুতপায়ে হাঁটতে লাগল বীচ হ্যাভেন ড্রাইভ ধরে শহরের দিকে।

বীচ হ্যাভেন ড্রাইভ!

আহা, কি নাম! কানা ছেলে তার নাম পদ্মলোচন। সরু, এবড়োখেবড়ো একটা পথ, খোয়াও বিছানো হয়নি ঠিকমত।

গুচ্ছ গুচ্ছ সামার কটেজগুলোর কাছ থেকে মিনিট দশেক হেঁটে এলে পড়বে এক চিলতে বালিতে ঢাকা জমি। চারপাশ ঘিরে জন্মেছে শরবন। তারপর বিশাল ছড়ানো প্রান্তর, ঘাসে ঢাকা, মাঝে মাঝে তাতে মাথা তুলে রেখেছে একআধটা ওক কিংবা উইলো গাছ। ওগুলো সব পার হয়ে গেলে দেখা মিলবে ছোট্ট শহরটার।

রাস্তা ধরে মিনিট পাঁচেক এগোতেই শরবনের আড়াল থেকে লাফ দিয়ে এসে সামনে পড়ল একটা ছায়ামূর্তি। বাঘ আর কুকুরের মিশ্র ডাকের মত চিৎকার করে উঠল 'খাউম' করে। হাত চেপে ধরল জিনার।

ঝাড়া দিয়ে হাত ছাড়িয়ে নিল জিনা। অস্ফুট একটা শব্দ করল। মুখোমুখি হলো মূর্তিটার।

'কেমন ভয়টা দেখালাম,' হাসি ছড়িয়ে পড়েছে মুসার মুখে। ঝকঝকে সাদা দাঁত।

'ভয় না, কচু! কিচ্ছু ভয় পাইনি আমি।'

'তাহলে চেঁচিয়ে উঠলে কেন?'

'কোথায় চেঁচালাম?'

'কোথায় চেঁচালে? দাঁড়াও, সাক্ষি জোগাড় করছি।' শরবনের দিকে তাকিয়ে ডাক দিল মুসা, 'রিকি। বেরোও।'

শরবনের ভেতর থেকে বেরিয়ে এল মুসার চেয়ে অনেক খাটো, রোগা একটা ছেলে। গাজর রঙের কোঁকড়া চুল। নীল চোখ। লাজুক ভঙ্গি। খুব শান্ত।

ওর দিকে হাত বাড়াল মুসা, 'দাও পাঁচ ডলার। বলেছিলাম না ভয় দেখাতে পারব।'

জিনার চোখের দিকে একবার তাকিয়েই চোখ সরিয়ে নিল রিকি। কড়া দৃষ্টি সহ্য করতে পারল না। 'তা তো বলেছিলে...'

'আমি ভয়ে চিৎকার করেছি!' কোমরে হাত দিয়ে খেঁকিয়ে উঠল জিনা। 'আমি!'

'অ্যাঁ!...না না না!' ভয়ে প্রায় কুঁকড়ে গেল ছেলেটা। মুসার চোখে চোখ পড়তেই আবার বলল, 'করেছে, কিন্তু...'

'নাহ্, তোমাকে আর মানুষ করা গেল না,' হতাশ ভঙ্গিতে মাথা নাড়তে লাগল জিনা। 'পুরুষ মানুষ, এত ভয় পাও কেন?'

জবাব না দিয়ে মাথা নিচু করে রইল রিকি।

মাস দুই হলো জিনাদের বাড়ির পাশে ওদেরই অন্য একটা বাড়ি ভাড়া নিয়েছে রিকিরা। ভীষণ লাজুক ছেলে। দুই মাসে জিনা আর তিন গোয়েন্দা ছাড়া আর কারও সঙ্গে বন্ধুত্ব করতে পারেনি। পড়শী বলে ওরাই যেচে পড়ে খাতিরটা করেছে, নইলে তা-ও হত না।

'আজই এলে?' পাশাপাশি হাঁটতে হাঁটতে জানতে চাইল মুসা।

'আজ বিকেলে,' জবাব দিল জিনা। 'বাড়িটা ভালই, কিন্তু পরিষ্কার করতে জান শেষ। একটা হপ্তা লাগবে।'

'আমাদেরটাও একই। কাল এসে তো ঢুকেই মাথা খারাপ হওয়ার জোগাড় হলো মা'র। একটা জানালার কাঁচ ভেঙে কি জানি কি একটা জানোয়ার ঘরে ঢুকেছিল। আমাদের কার্পেটটাকে বাথরুম মনে করেছিল।'

'ওয়াক! থুহ্! আন্টির নিশ্চয় দাঁতকপাটি লেগে গিয়েছিল?'

'না, চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকল খানিকক্ষণ। তারপর ঘুরে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে। "আর কোনদিন আসব না" বলে রকি বীচে ফিরে যেতে চেয়েছিল তক্ষুণি,' হাসতে হাসতে বলল মুসা। 'আমি আর বাবা অনেক কষ্টে ঠেকিয়েছি।'

'এটা রকি বীচের চেয়ে খারাপ জায়গা,' পেছন থেকে বলল রিকি। জিনা আর মুসার কয়েক কদম পেছনে থেকে হাঁটছে।

'আমার তো খুব ভাল লাগছে,' মুসা জবাব দিল। 'দারুণ। সারাটা বিকেল সাগরে সাঁতরে কাটালাম, রোদের মধ্যে পড়ে থাকলাম। রাতে সৈকতে পার্টি হবে। সকালে উঠে নতুন করে আবার সব শুরু। কত মজা।'

'নতুন করে কি হবে?'

'গাধা নাকি। বুঝলে না। আবার বেড়ানো, সাঁতার কাটা, রোদে পোড়া, রাতে পার্টি...'

'একঘেয়ে লাগবে না?'

'মোটেও না। থাকো না দু'তিন দিন, বুঝবে আনন্দ কাকে বলে।'

আঁকাবাঁকা কাঁচা রাস্তাটা ঘাসের মাঠ পেরিয়ে, একগুচ্ছ সাদা রঙ করা কাঠের বাড়ির পাশ কাটিয়ে চলে গেছে শহরের দিকে।

শহরের মেইন রোডের কাঠে তৈরি ফুটপাথে যখন উঠল ওরা, বাতাস তখন বেশ গরম। এদিক ওদিক তাকাতে লাগল ওরা।

'আরে,' মুসা বলল, 'প্রিন্সেসের পাশে আবার ভিডিও-গেম আর্কেডও খুলেছে দেখি এবার। রিকি, টাকাপয়সা কিছু এনেছ?'

জিনসের পকেট হাতড়ে নীল রঙের প্লাস্টিকের বুটেন লাইটারটা শুধু বের করে আনল রিকি। সব সময় জিনিসটা তার পকেটে থাকে। মাথা নাড়ল।

'এই গরমের মধ্যে ওই বদ্ধ জায়গায় ঢোকার ইচ্ছে হলো কেন তোমার?' জিনা বলল। 'বেড়াতে এসেছি, বেড়াব। ঘরে আটকে থাকার কোন মানে হয় না, সেটা যে ধরনের ঘরই হোক। চলো, খানিকক্ষণ হাঁটাহাঁটি করে সৈকতে চলে যাই।'

'চলো, কি আর করা,' আর্কেডের দিকে শেষবারের মত লোভাতুর দৃষ্টি নিক্ষেপ করে পা বাড়াল মুসা।

দুই

মেইন স্ট্রীট ধরে হাঁটছে ওরা। জিনা ভাবছে, কিশোর আর রবিন থাকলে ভাল হত। ওরা আসেনি। ইয়ার্ডে প্রচুর কাজ। এই গ্রীষ্মে মেরিচাচী আর রাশেদ পাশা কোথাও বেড়াতে যাবেন না। কিশোরকেও আটকে দিয়েছেন চাচী। আর রবিন আবার পা ভেঙেছে পাহাড়ে চড়তে গিয়ে। এখন শয্যাশায়ী। পাহাড়ে চড়া ওর কাছে নেশার মত। বহুবার পা ভেঙেছে। এমনও হয়েছে, জোড়া লাগতে না লাগতে আবার ভেঙেছে কয়েক মাসের মধ্যেই। তা-ও পাহাড়ে ওঠা বন্ধ করতে পারে না।

কিশোর অবশ্য বলে দিয়েছে, ইয়ার্ডের কাজ সেরে ফাঁক পেলেই চলে আসবে। তবে সেই ফাঁকটাই পাবে কিনা যথেষ্ট সন্দেহ আছে জিনার। সবাই একসঙ্গে না থাকলে জমে না। কিন্তু আসতে না পারলে কি আর করা। মেনে নিতেই হয়।

মেইন রোডের একধারে সারি সারি দোকানের পাশ দিয়ে হেঁটে চলল ওরা। উইন্ডোতে সাজানো জিনিসপত্র দেখতে দেখতে। ট্যুরিস্ট সীজন সবে শুরু হয়েছে। এখনই প্রচুর ভিড়। মেইন স্ট্রীটে যানজট। ফুটপাথে মানুষের জট। একা, জোড়ায় জোড়ায়, কিংবা দল বেঁধে হাঁটছে। যার যেভাবে খুশি, যেদিকে ইচ্ছে। কারোরই কোন নির্দিষ্ট গন্তব্য নেই।

'খাইছে!' আচমকা চিৎকার করে উঠল মুসা। রাস্তার অন্য পাড়ে পুরানো আদলে তৈরি সিনেমা হলটার দিকে চোখ। 'কি সব পোস্টার লাগিয়েছে দেখেছ? ভূতপ্রেতেরা উৎসব করছে নাকি?' রিকির কাঁধে হাত রাখল সে। 'চলো তো, কাছে গিয়ে দেখি।'

জিনা আর রিকিকে প্রায় টানতে টানতে নিয়ে রাস্তা পেরোল সে। 'আসিতেছে' কিংবা 'আগামী আকর্ষণ' লেখা পোস্টারগুলো দেখতে দেখতে বলল, 'সব তো দেখা যাচ্ছে হরর ছবি।'

একটা অদ্ভুত ব্যাপার, ভূতপ্রেতকে ভয় পায় মুসা, অথচ ওসব ছবির প্রতিই

তার আকর্ষণ বেশি।

গুঙিয়ে উঠল জিনা। মুসার যতটা পছন্দ, এধরনের ছবি তার ততটাই অপছন্দ। মুসার হাত ধরে টানল সে, 'এসো তো। পচা জিনিস দেখতে ভাল্লাগছে না।...ওদিকে কি হচ্ছে দেখি।'

রাস্তার শেষ বাড়ি এই সিনেমা হলটা। শহরটাও যেন শেষ হয়ে গেছে এখানে। কংক্রীটে তৈরি ছোট আয়তাকার একটা জায়গাকে পার্কিং লট করা হয়েছে। তার ওপারে ঘাসে ঢাকা মাঠ। শহরের অধিবাসীদের পিকনিক স্পট, জনসমাবেশ আর অন্যান্য কর্মকাণ্ডেও ব্যবহার হয়। আজ রাতে অনেকগুলো উজ্জ্বল স্পটলাইটের আলোয় আলোকিত হয়ে আছে জায়গাটা। আলোর সীমানার বাইরে আবছা অন্ধকারে কয়েকটা ট্রাক আর ভ্যানগাড়ির কালো অবয়ব চোখে পড়ে।

এগিয়ে গেল তিনজনে। কার্নিভলের প্রস্তুতি চলছে। শ্রমিকদের হাঁকডাক, করাতের খড়খড় আর হাতুড়ির ঠুকুর-ঠাকুর শোনা যাচ্ছে অনবরত।

কেমন যেন! বাস্তব লাগছে না পরিবেশটা। স্পটলাইটগুলো আকাশের দিকে তুলে দেয়া হয়েছে। নিচে তাই আলোর চেয়ে ছায়াই ছড়াচ্ছে বেশি। ব্যস্ত হয়ে এদিক ওদিক ছোটাছুটি করছে শ্রমিকরা। কালো, নীরব একটা দৈত্যের মত অন্ধকারে মাথা তুলে রেখেছে একটা নাগরদোলা। খুঁটি থেকে ঝুলছে রঙিন আলো। খাবার আর খেলার স্টলগুলো খাড়া করে ফেলা হচ্ছে অবিশ্বাস্য দ্রুততায়। ছোট একটা রোলার-কোস্টার বসাতে গলদঘর্ম হচ্ছে কয়েকজন লোক।

মাঠের কিনারে পাশাপাশি দাঁড়িয়ে দেখতে লাগল মুসা, জিনা আর রিকি।

'গ্রেভিট্রন আছে নাকি ওদের কে জানে!' আচমকা যেন ঘোরের মধ্যে কথা বলে উঠল রিকি।

'কি ট্রন?' বুঝতে পারল না মুসা।

'গ্রেভি। গ্রেভ থেকে গ্রেভি। গ্রেভ মানে জানো না? কবর।'

'ও। তো সেটা দিয়ে কি হয়? কবরে ঢোকায় নাকি?'

'অনেকটা ওরকমই। বনবন করে ঘুরতে থাকে। হঠাৎ মেঝেটা সরে যায়। সময়মত লাফ দিয়ে যদি দেয়ালের কাছে সরে যেতে পারো, বাঁচলে, নইলে পড়তে হবে নিচের অন্ধকার গর্তে।'

'বাহ্, দারুণ খেলা তো,' রোমাঞ্চকর মনে হলো জিনার।

অবাক হয়ে রিকির দিকে তাকিয়ে আছে মুসা। 'এই খেলা তোমার পছন্দ?'

'না না,' তাড়াতাড়ি হাত নাড়ল রিকি। 'ওটা কোন খেলা হলো নাকি? এত ভয় পেতে কে চায়? বিপদও কম না!'

'নাগরদোলাও আমার ভাল লাগে,' অন্ধকার মাঠের দৈত্যটার দিকে তাকিয়ে আছে জিনা।

'ওসব পোলাপানের খেলা,' মুসা বলল। 'এর মধ্যে উত্তেজনার কি আছে?'

'সব কিছুতেই উত্তেজনা দরকার হয় নাকি? খেলা খেলাই। মজা পাওয়াটা

আসল কথা।'

জিনার হাত ধরে টানল মুসা, 'দেখা তো হলো। চলো, সৈকতে। এখানে বিরক্ত লাগছে আমার।'

পরিষ্কার রাতের আকাশ। উজ্জ্বল। মেঘমুক্ত। জ্যোৎস্নায় বালির সৈকতটাকে লাগছে চওড়া, রূপালী ফিতের মত।

পানির কিনার দিয়ে হাত ধরাধরি করে খালি পায়ে হেঁটে যাচ্ছে নারী-পুরুষ। গোড়ালিতে মৃদু বাড়ি খাচ্ছে ঢেউ। পাউডারের মত মিহি বালিতে চাদর বিছিয়ে বসে হাসাহাসি করছে, গান গাইছে, চেঁচিয়ে কথা বলছে ছেলেমেয়েরা। কেউ বাজাচ্ছে টেপ। ড্রামের ভারী গুমগুম শব্দ তুলে বাজছে রক মিউজিক। তার সঙ্গে পাল্লা দিচ্ছে রেডিওর গান। ঢেকে দিচ্ছে সৈকতে ক্রমাগত আছড়ে পড়া ঢেউয়ের ছলাৎ-ছল শব্দকে।

বালিয়াড়ির গোড়ায় আগুন জ্বেলে বসেছে কয়েকটা ছেলেমেয়ে। বালির ওপর দিয়ে ওদের দিকে খালি পায়ে হাঁটতে গিয়ে কয়েকজনকে চিনতে পারল মুসা আর জিনা। স্যান্ডি হোলোরই বাসিন্দা ওরা। আগের বার বেড়াতে এসে পরিচয় হয়েছে।

'হাই, টনি,' ডাক দিল মুসা।

ফিরে তাকাল টনি হাওয়াই। আগুনের আলো আর ছায়া নাচছে ছেলেটার চোখেমুখে। বেশ ম্বা। খাটো করে ছাঁটা কালো চুলের গোড়া ঝাড়ুর শলার মত খাড়া খাড়া। মুসাকে দেখে উজ্জ্বল হলো মুখ: 'আরি, মুসা? কেমন আছ? এখনও ভূতের ভয়ে কাবু?'

'তুমিও কি এখনও সেই বোকাই রয়ে গেছ?' বলেই এক থাপ্পড় কষাল ওর পিঠে মুসা।

গুঙিয়ে উঠল টনি। 'উফ্, বাপরে! গায়ের জোর কমেনি একটুও!'

হেসে উঠল দুজনেই।

পরিচিত সবগুলো ছেলেমেয়ে স্বাগত জানাল জিনা আর মুসাকে। সরে গিয়ে বসার জায়গা করে দিল। পরিচয় করিয়ে দিল অপরিচিতদের সঙ্গে। কড়কড়, ফুটফাট, নানা রকম বিচিত্র শব্দ করছে আগুন। আরামদায়ক উষ্ণতা। গা ঘেঁষাঘেঁষি করে বসে একসঙ্গে কথা শুরু করল সবাই।

রিকির কথা মনে পড়তে ডাক দিল মুসা, 'আই, রিকি, বসো।'

এত মানুষ দেখে আড়ষ্ট হয়ে গেছে রিকি। দুই হাত প্যান্টের পকেটে। ছায়া থেকে বেরিয়ে এসে আস্তে করে বসে পড়ল মুসার পাশে। দ্বিধা যাচ্ছে না কোনমতে। সবার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিল মুসা, 'ও আমার বন্ধু, রিকি শর।'

'কিশোর আর রবিন এল না এবার?' জানতে চাইল টনি।

'নাহ্,' ফোঁস করে নিঃশ্বাস ফেলে বলল মুসা, 'রবিন আবার পা ভেঙেছে। কিশোর ইয়ার্ডের কাজে ব্যস্ত। তবে বলেছে, সারতে পারলে, দু'চারদিনের জন্যে হলেও চলে আসবে।'

'কিশোর নেই,' বলল মুনা নামে একটা মেয়ে, 'তারমানে কোন রহস্য আর পাচ্ছ না তোমরা এবার।'

'পেলেই বা কি? নাকের সামনে পড়ে থাকলেও হয়তো দেখতে পাব না।'

'হুঁ, তা ঠিক। জিনা, কেমন আছ?'

'ভাল।'

'নতুন আর্কেডটা দেখেছ নাকি?' মুসাকে জিজ্ঞেস করল টনি। 'সাংঘাতিক!'

'দেখেছি। কিন্তু পয়সা আনিনি।'

'আমার কাছে আছে,' হাঁটুতে ভর দিয়ে উঠে দাঁড়াতে গেল টনি। 'চলো। খেলে আসি।'

উঠে দাঁড়াতে গিয়েও দ্বিধা করতে লাগল মুসা। জিনার দিকে তাকাল। একসঙ্গে বেড়াতে বেড়িয়ে ওকে ফেলে চলে যাওয়াটা ঠিক হবে না। মাথা নাড়ল, 'নাহ্, আজ আর যাব না। এইমাত্র এলাম ওখান থেকে। দেখা যাক, কাল।'

'কাল তাহলে বেশি করে পয়সা নিয়ে এসো,' হাসল টনি। বসে পড়ল আবার। চুটিয়ে আড্ডা দিতে শুরু করল সবাই মিলে। রিকি বাদে। চুপ করে বসে আছে। চাদরের কিনারে জড়সড় হয়ে বসে তাকিয়ে আছে আগুনের দিকে। কথা শুনছে। হাতের তালুতে আনমনে অনবরত ঘোরাচ্ছে নীল লাইটারটা।

ও যে অস্বস্তি বোধ করছে, বুঝতে পারল জিনা। বলল, 'রিকি, বসে থাকতে তোমার ভাল না লাগলে হেঁটে আসতে পারো ওদিক থেকে। আমরা আছি এখানে।'

হাঁপ ছেড়ে বাঁচল রিকি। সঙ্গে সঙ্গে উঠে পড়ল লাফ দিয়ে।

তিন

গোল ছায়ায় বসে থাকা ছোট ছোট বিন্দুগুলোকে চিনতে সময় লাগল রিকির। সাগরের মাছখেকো পাখি। টার্ন। ছোট, মসৃণ একটা পাথরের টিলায় উঠে দাঁড়িয়েছে সে।

চলতে শুরু করল বিন্দুগুলো। এগিয়ে চলল পানির দিকে। অন্ধকার গ্রাস করে নিল ওগুলোকে।

রিকির দুই হাত পকেটে ঢোকানো। পানির দিক থেকে ঘুরল। ফিরে তাকাল পাথরের পাহাড়ের দিকে। চূড়াটা একখানে সমতল একটা টেবিলের রূপ নিয়েছে। বাদুড় উড়ছে ওটার ওপরে। কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে থেকে আবার সাগরের দিকে ঘুরল সে। প্রায় অস্পষ্ট ছোট একটা দ্বীপের কালো অবয়ব চোখে পড়ছে, বাতাস নিতে ভেসে ওঠা সাবমেরিনের পিঠের মত। বাদুড়গুলো বোধহয় ওই দ্বীপ থেকেই আসে, মনে হলো তার।

এত বাদুড় এখানকার সৈকতে! মুখ তুলে বেগুনী আকাশের দিকে তাকাল

সে। একটু আগেও মাথার ওপর উড়ছিল দুটো বাদুড়। এখন নেই।

সৈকতের এই অংশটুকু নৌকা রাখার ডকটা থেকে দক্ষিণে। এখানে দাঁড়ালে গাছপালায় ছাওয়া নির্জন দ্বীপটা ভালমত দেখা যায়, দিনের বেলায়ই দেখেছে। দূর থেকেই দ্বীপটা পছন্দ হয়ে গেছে তার। এর কারণ বোধহয় নির্জনতা। মানুষজন বিশেষ পছন্দ করে না সে। একা থাকতে ভাল লাগে। মসৃণ, শীতল পাথরের দেয়ালে ঠেস দিয়ে অপলক চোখে দ্বীপটার দিকে তাকিয়ে রইল।

কতক্ষণ এভাবে ছিল বলতে পারবে না। হুঁশ হলো, যখন অস্পষ্ট হয়ে এল দ্বীপটা। তাকিয়ে দেখল, নিচে নেমে আসছে মেঘ। চাঁদ ঢেকে দিয়েছে। কিছুক্ষণ আগের রূপালী সৈকতটাকে লাগছে লম্বা, ধূসর একটা ছায়ার মত। বিচিত্র। অদ্ভুত। ধোঁয়ার কুণ্ডলীর মত পাক খেয়ে খেয়ে সাগরের দিক থেকে উড়ে আসতে শুরু করেছে কুয়াশা। বাতাস ভেজা, ঠাণ্ডা, ভারী।

মুসারা কি চলে গেছে? না বোধহয়। ওকে ফেলে যাবে না।

সুন্দর জায়গা। চমৎকার পরিবেশ। সবাই কেমন আনন্দ করে কাটাচ্ছে। কিন্তু ও পারে না। নিজের ওপর রাগ হলো রিকির। কেন মিশতে পারে না মানুষের সঙ্গে? মেশার চেষ্টা করতে হবে এখন থেকে। কিন্তু নিজের কথায় নিজেরই আস্থা নেই। বহুবার এরকম কথা দিয়েছে নিজেকে, চেষ্টাও করেনি তা নয়, কিন্তু পারেনি। এইবার পারতে হবে, পারতেই হবে—নিজেকে বুঝিয়ে পাথর থেকে নামতে যাবে, এই সময় ফড়ফড় শব্দ হলো মাথার ওপর।

মুখ তুলে দেখল, অনেকগুলো বাদুড় উড়ে এসেছে পাহাড়ের দিক থেকে। বিচিত্র ভঙ্গিতে ডানা ঝাপটে রওনা হয়েছে যেন মেঘের মধ্যে হারিয়ে যাওয়ার উদ্দেশ্যে।

বাদুড়েরা খুব ভাল প্রাণী, নিজেকে বোঝাল সে। ওরা পোকামাকড় খায়। খেয়ে মানুষের উপকার করে।

কিন্তু বাদুড়ের ডানা ঝাপটানোর শব্দ আর তীক্ষ্ণ চিৎকার এখন ভাল লাগল না তার কাছে। মেরুদণ্ডে শিহরণ তুলল।

আর দাঁড়িয়ে থাকার সাহস হলো না। তাড়াহুড়ো করে নেমে এল নিচের কুয়াশা পড়া ভেজা বালিতে। নেমেই থমকে দাঁড়াল।

সে একা নয়। আরও কেউ আছে।

ওর পেছনে। পাথরের চাঙড়ের আড়ালে।

দেখার চেষ্টা করেও দেখতে পেল না। কিন্তু মন বলছে, আছে।

মাথার ওপর ডানা ঝাপটানোর শব্দ বাড়ছে। ঝাঁকে ঝাঁকে বাদুড় উড়ে আসছে এখন পাহাড়ের দিক থেকে। অনেক নিচ দিয়ে উড়ছে। চলে যাচ্ছে সাগরের ওপরে নেমে আসা মেঘের দিকে। ওর গায়ে এসে ঝাপটা মারছে নোনা পানির কণা মেশানো ঝোড়ো বাতাস।

চোখের কোণ দিয়ে নড়াচড়া লক্ষ করে ঝট করে পাশে ঘুরে গেল রিকি। দেখতে পেল মেয়েটাকে। ওর দিকেই তাকিয়ে আছে। কয়েক ফুট দূরে একটা পাথরের ওপর দাঁড়ানো। খালি পা।

ওকে তাকাতে দেখে নড়ে উঠল মেয়েটা। নিঃশব্দে পাথর থেকে নেমে এগিয়ে আসতে শুরু করল।

সুন্দরী। খুব সুন্দরী মেয়েটা। মেঘে ঢাকা চাঁদের আবছা আলোতেও ওর রূপ যেন ঝলমল করছে। রিকিরই বয়েসী হবে। কিংবা দু'এক বছরের বড়।

'হাই,' মোলায়েম, মধুঝরা মিষ্টি কণ্ঠে ডাক দিল মেয়েটা। ডাগর কালো চোখ মেলে তাকাল ওর দিকে। বড় বড় ফুল ছাপা কাপড়ে তৈরি সারং স্কার্ট পরনে, তার সঙ্গে ম্যাচ করা বিকিনি টপ। ঝাঁকি দিয়ে কাঁধে সরিয়ে দিল মুখে এসে পড়া লম্বা লাল চুল। হাসল রিকির দিকে তাকিয়ে।

'হাই!' বুকের মধ্যে কাঁপুনি শুরু হয়ে গেছে রিকির। সবার সঙ্গে মেশার চেষ্টা করবে–খানিক আগে নিজেকে দেয়া এই কথাটা বেমালুম ভুলে গেল। মানুষ! অপরিচিত! তার ওপর মেয়েমানুষ! ইস্, বালি ফাঁক হয়ে যদি গর্ত হয়ে যেত এখন, তার মধ্যে ঢুকে গিয়ে রেহাই পেত সে।

'আমি পথ হারিয়েছি,' কাছে এসে দাঁড়াল মেয়েটা। পারফিউমের গন্ধ লাগল রিকির নাকে। লাইলাক ফুলের মিষ্টি সুবাস।

'আঁ! কি হারিয়েছেন?'

'পথ। আপনি আপনি করছ কেন? আমি তোমার বয়েসীই হব।'

'প-প-প্পথ হারিয়েছেন···মানে, হা-হা-হারিয়েছ···' ঢোক গিলল রিকি। গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে।

'হ্যাঁ, বেড়াতে এসেছি আমরা। বাবা কটেজ ভাড়া নিয়েছে। হাঁটতে হাঁটতে চলে গেছিলাম ওইই পাহাড়ের দিকে,' হাত তুলে দেখাল মেয়েটা। হাতির দাঁতের মত ফ্যাকাসে সাদা চামড়া। 'এখন আর বুঝতে পারছি না কোনদিকে গেলে বাসাটা পাওয়া যাবে।'

'আমি···মানে···' কথা বলার জন্যে কাশি দিয়ে গলা পরিষ্কার করল রিকি। মনে মনে ধমক লাগাল নিজেকে–এই ব্যাটা, স্বাভাবিক হ! কথা বল ঠিকমত! এবং ধমকের চোটেই যেন হড়হড় করে শব্দগুলো বেরিয়ে এল মুখ থেকে, 'বেশির ভাগ সামার হাউসই ওই ওদিকটাতে।'

'ওদিকে?' ফিরে তাকাল মেয়েটা। দ্বিধা করছে।

'যাবে আমার সঙ্গে? ওদিকেই যাব।'

'থ্যাংকস,' বলে রিকিকে অবাক করে দিয়ে আন্তরিকতা দেখানোর জন্যে ওর একটা হাত ধরে টান দিল মেয়েটা। 'চলো।'

এক ঝলক কড়া মিষ্টি গন্ধ এসে নাকে ঢুকল। বোঁ করে মাথাটা চক্কর দিয়ে উঠল রিকির। অবশ হয়ে আসছে হাত-পা। জোর করে ছাড়িয়ে নেয়ার সাহস, শক্তি, কোনটাই পেল না। অদ্ভুত অনুভূতি। তাকে বাদ দিয়েই যেন পা দুটো চলতে শুরু করল মেয়েটার সঙ্গে।

'এদিকে এই প্রথম এলাম। সুন্দর জায়গা। ছুটিটা এবার খুব ভাল কাটবে,' মেয়েটা বলল।

'অ্যা!···হ্যাঁ। খুব ভাল।'

ফিরে তাকাল মেয়েটা। 'আড়ষ্ট হয়ে যাচ্ছ কেন এমন? কথা জড়িয়ে যাচ্ছে

কেন? শরীর খারাপ নাকি তোমার?'

মেয়েটার কুঁচকানো ভুরু আর তীক্ষ্ণ দৃষ্টির দিকে তাকানোর সাহস হলো না রিকির। আরেকদিকে তাকিয়ে তাড়াতাড়ি বলল, 'কই, না তো! অনেকক্ষণ ধরে দাঁড়িয়ে আছি তো, বোধহয় ঠাণ্ডা লেগেছে।'

'হ্যাঁ, তা লাগতে পারে। ঠাণ্ডা পড়তে আরম্ভ করেছে খুব। কুয়াশাও কি রকম করে ছুটে আসছে। অবাক কাণ্ডই। সন্ধ্যায় যখন বেরিয়েছি, রীতিমত গরম ছিল।'

'ওই পাহাড়ে গিয়েছিলে কি করতে? একা একা তোমার ভয় করে না?'

'না। তোমার করে?'

'না। একা থাকতেই আমার বরং ভাল লাগে।'

'আমারও।'

এই একটা কথাতেই আড়ষ্টতা অনেকখানি কেটে গেল রিকির। হয়তো নিজের সঙ্গে মেয়েটার মিল খুঁজে পেয়েই। ভেবে নিল, মেয়েটাও লাজুক, সে-ও লাজুক। যদিও আড়ষ্টতার ছিটেফোঁটাও নেই মেয়েটার মধ্যে।

রিকির কব্জিতে চেপে বসল মেয়েটার আঙুল। মৃদু হাসল। 'তাহলে তো আমরা বন্ধু হতে পারি।'

'তা পারি,' মনে মনে বলল রিকি। মুখ দিয়ে বের করতে পারল না।

'কোন শহর থেকে এসেছ তুমি?' জিজ্ঞেস করল মেয়েটা।

'রকি বীচ।'

পাশাপাশি হাঁটছে দুজনে। বালিয়াড়ির পাশ থেকে সরে যাচ্ছে ক্রমশ। কথা বলতে বলতে পানির দিকে টেনে নিয়ে চলেছে ওকে মেয়েটা। তবে টানটা দিচ্ছে বড়ই আস্তে, হাঁটছে ধীরে ধীরে।

পানির কিনারে কুণ্ডলী পাকানো কুয়াশা।

লাইলাক ফুলের গন্ধ থেকে থেকেই নাকে ঢুকছে রিকির।

'ওই দেখো, কেমন সুন্দর কুয়াশা,' ঘন একটা কুণ্ডলীর দিকে হাত তুলে বলল মেয়েটা। 'ঢুকে দেখবে নাকি কুয়াশার মধ্যে কেমন লাগে?'

রিকির ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় সজাগ করছে: যেয়ো না, যেয়ো না! কিন্তু বাধা দিয়ে নিজেকে রুখতে পারল না রিকি। এড়াতে পারল না মেয়েটার হাতের টান। আস্তে আস্তে ঢুকে গেল ঘন কুয়াশার মধ্যে। এতই ঘন, দুই হাত দূরের জিনিসও চোখে পড়ে না। এরই মধ্যে একটা ঝিলিমিলি ছায়ার মত মেয়েটাকে দেখতে পাচ্ছে সে।

নাকের কাছে দুলে উঠল কি যেন। বুঝতে পারল না রিকি। লাইলাকের মিষ্টি গন্ধটা তীব্রতর হলো। তার সঙ্গে মিশে গেছে ঝাঁঝাল আরেকটা কি রকম গন্ধ।

বোঁ করে আবার চক্কর দিল মাথাটা। এবার আর গেল না অদ্ভুত অনুভূতিটা। এরই মধ্যে টের পেল গলায় নরম ঠোঁটের ছোঁয়া। পরক্ষণে কুট করে চামড়ায় তীক্ষ্ণ সুচ বেঁধার মত যন্ত্রণা।

একটা মুহূর্ত মাথার ভেতরে-বাইরে সমানে পাক খেতে থাকল যেন ভেজা

কুয়াশা। তারপর অন্ধকার। গাঢ় অন্ধকার।

চার

কোথায় ও?

আর্কেডের ভেতরের সরু গলি ধরে এগিয়ে চলল জিনা। গিজগিজে ভিড়। বোমা বিস্ফোরণ, স্বয়ংক্রিয় আগ্নেয়াস্ত্রের গুলি, মহাকাশ যুদ্ধ আর রেসিং কার ছুটে চলার শব্দে ছোট্ট, স্বল্পালোকিত ঘরটায় কান পাতা দায়।

এখানে নেই।

কোথায়?

আর্কেডের পেছনে পিনবল মেশিন নিয়ে যেখানে খেলা চলছে সেখানেও নেই।

রাস্তায় বেরিয়ে এল জিনা। খোলা বাতাসে বেরিয়ে হাঁপ ছেড়ে বাঁচল। অত বদ্ধ জায়গায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কোন্ মজা যে পায় ওই ছেলেগুলো! ভিডিও গেম খেলার নেশাটা আগে ছিল না মুসার, ইদানীং ধরেছে। কিশোর আর রবিনের কথা ভেবে আরেকবার আফসোস করল জিনা। ওরা থাকলে এই একাকিত্বে ভুগতে হত না। মুসাও নিশ্চয় খেলা নিয়ে মেতে উঠত না এতটা।

মুসাকে দোষ দিল না সে। মেয়েমানুষের সঙ্গে সারাক্ষণ যদি থাকতে না চায়, কিছু বলার নেই। আর তার নিজের মুশকিল হলো, সে নিজে মেয়ে হয়েও মেয়েদের সঙ্গ তেমন পছন্দ করে না।

দূর! কাজ নেই, কর্ম নেই, কথা বলার মানুষ নেই; এই বেড়ানোর কোন মানে হয় নাকি? রকি বীচে ফিরে যাবে কিনা ভাবতে শুরু করল সে।

সাগর থেকে ভেসে আসছে কুয়াশার কুণ্ডলী। অদ্ভুত সব আকৃতি নিয়ে উড়ে বেড়াচ্ছে পথের ওপর। রাস্তার আলোর আশেপাশে বিচিত্র ছায়া তৈরি করছে। মেইন রোডের পাশের দোকান আর রেস্তোরাঁগুলোর দিকে তাকাল জিনা। প্রচুর ভিড়। কুয়াশার মধ্যে মানুষগুলোকে মনে হচ্ছে দল বেঁধে উড়ছে।

ঘন হচ্ছে কুয়াশা। মনে হচ্ছে আর কিছুক্ষণের মধ্যে ঢেকে ফেলবে সব কিছু। 'প্রিন্সেস' শপিং মলের পাশে আইসক্রীম পারলারটার দিকে এগোল সে।

পেল না এখানেও। আশ্চর্য! মুসারও দেখা নেই, রিকিরও কোন খবর নেই। গেল কোথায় ওরা? আশেপাশেই তো থাকার কথা। এ সময় বাসায় ঘরে বসে আছে, এটাও বিশ্বাস করতে পারল না। ভুল করেছে। মুসাদের কটেজটা হয়ে এলে পারত।

'হাই, জিনা!'

চরকির মত পাক খেয়ে ঘুরে দাঁড়াল জিনা।

না, মুসা নয়। আগের রাতে সৈকতে আগুনের ধারে পরিচয় হওয়া একটা ছেলে। সঙ্গে আরেকজন। দুজনেই ওর দিকে হাত নেড়ে চলে গেল সামনের

দিকে। হারিয়ে গেল ঘন কুয়াশায়।

বাড়ি থেকে বেরোতে বোধহয় দেরি করে ফেলেছে মুসা। চলে আসবে এখুনি, ভেবে, একটা স্ট্রীটল্যাম্পের নিচে গিয়ে দাঁড়াল জিনা। হঠাৎ বিচিত্র এক অনুভূতি হলো-কেউ নজর রাখছে ওর ওপর।

ফিরে তাকাতে দেখল, ঠিক। ছায়া থেকে বেরিয়ে এল একটা ছেলে। ওর চেয়ে বছর দু'তিনের বড় হবে। তরুণই বলা চলে। হালকা-পাতলা শরীর, তবে রোগা বলা যাবে না। গায়ে কালো সোয়েটশার্ট, পরনে গাঢ় রঙের মোটা সূতী কাপড়ের প্যান্ট। ব্যাকব্রাশ করা কালো চুল। কাছে এসে দাঁড়াল। অপূর্ব সুন্দর কৌতূহলী দুটো কালো চোখের দৃষ্টিতে দীর্ঘ একটা মুহূর্ত দেখল জিনাকে। সিনেমার নায়ক কিংবা দামী মডেল হবার উপযুক্ত চেহারা। হেসে জিজ্ঞেস করল, 'কারও জন্যে অপেক্ষা করছ বুঝি?'

এক পা পিছিয়ে গেল জিনা।

'ও। সরি। বিরক্ত করলাম,' তাড়াতাড়ি বলল ছেলেটা। এ শহরের বাসিন্দা নয় ও, চামড়াই বলে দিচ্ছে। ফ্যাকাসে সাদা। এখানকার মানুষের চামড়া রোদে পুড়ে পুড়ে সব তামাটে হয়ে গেছে।

'না না, ঠিক আছে,' তাড়াতাড়ি বলল জিনা। এই কুয়াশার মধ্যে একা দাঁড়িয়ে থাকতে ভাল লাগছে না। সঙ্গী পেলে মন্দ হয় না। আটকাতে চাইল ছেলেটাকে, 'আপনি এখানে এই প্রথম এলেন?'

'তুমি করেই বলো। আপনি শুনতে ভাল্লাগে না।' মাথা নাড়ল, 'না, আরও বহুবার এসেছি।...দেখো, কি কুয়াশা! এ রকম আর কখনও দেখিনি এখানে।'

'আমিও না,' হাত বাড়িয়ে দিল জিনা, 'আমি জরজিনা পারকার। জিনা বললেই চলবে।'

'জন গুডওয়াকার,' জিনার হাত চেপে ধরে ছোট্ট একটা ঝাঁকি দিয়েই ছেড়ে দিল ছেলেটা।

এতই ঠাণ্ডা, জিনার মনে হলো বরফের ছোঁয়া লেগেছে ওর হাতে। 'অনেক পুরানো নাম। তোমার পোশাকও খুব পুরানো আমলের।'

মাথা ঝাঁকাল জন, 'হ্যাঁ। পুরানো আমলই আমার পছন্দ। এখনকার কোন কিছু ভাল লাগে না।'

দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কথা বলতে লাগল দুজনে।

ঘড়ি দেখল জিনা। পনেরো মিনিট ধরে দাঁড়িয়ে আছে।

'তোমার বন্ধু আসবে তো?' জিজ্ঞেস করল জন। 'এখানেই দেখা করার কথা?'

মাথা ঝাঁকাল জিনা, 'হ্যাঁ, আর্কেডের সামনেই থাকতে বলেছে। শহরে কিছুক্ষণ ঘোরাঘুরি করে সৈকতে যাওয়ার কথা আমাদের। কি হলো ওর বুঝতে পারছি না!'

'দেখোগে, দেরি করে বাড়ি থেকে বেরিয়ে এখানে তোমাকে পাবে না ভেবে সরাসরি সৈকতেই চলে গেছে।'

তাই তো! একথাটা তো ভাবেনি এতক্ষণ।

'আজ রাতে বেশি ভিড় থাকবে না সৈকতে,' আবার বলল জন। 'অনেকেই কুয়াশা পছন্দ করে না। ওকে খুঁজে বের করতে সময় লাগবে না।'

'তা ঠিক,' জিনার কণ্ঠে অনিশ্চয়তা। 'কিন্তু যা অন্ধকার...'

'চলো, আমি যাচ্ছি তোমার সঙ্গে। আমার কোন কাজ নেই। ঘুরতেই বেরিয়েছিলাম...'

'কিন্তু...'

'আরে, চলো। এই এলাকা আমার মুখস্থ। দশ মিনিটও লাগবে না ওকে খুঁজে বের করতে।'

কোন রকম প্রতিবাদের সুযোগ না দিয়ে জিনার হাত ধরে টেনে নিয়ে চলল জন।

পথের মোড় ঘুরে ডিউন লেনে পড়ল ওরা। সোজা এগোল সাগরের দিকে। অবাক লাগল জিনার, যতই সৈকতের কাছাকাছি হচ্ছে, পাতলা হচ্ছে কুয়াশা।

জিনার মনের কথা বুঝতে পেরেই যেন জবাব দিল জন, 'স্যান্ডি হোলো শহরটা অনেক নিচুতে, অনেকটা গিরিখাতের মত জায়গায়। এতে হয় কি, সাগর থেকে কুয়াশা এসে একবার চড়াও হলে বদ্ধ জায়গায় আটকে যায়, আর সরতে চায় না।'

'তুমি কি ভূগোলের ছাত্র?'

'নাহ্। ব্যাপারটা জানি আর কি।'

সৈকতের কিনার থেকে সাগরের বেশ খানিকটা ভেতর পর্যন্ত আকাশে ভারী, ধূসর মেঘ। কিন্তু কুয়াশা প্রায় নেই। বড় বড় ঢেউ আছড়ে ভাঙছে তীরে। অন্ধকারেও ঢেউয়ের মাথার সাদা ফেনা চোখে পড়ছে।

পানির কিনারে হাঁটছে কয়েক জোড়া দম্পতি। খানিক দূরে পানির বেশ কিছুটা ওপরে অগ্নিকুণ্ড জ্বেলে বসে আড্ডা দিচ্ছে কতগুলো ছেলেমেয়ে। উঁচুস্বরে টেপ আর রেডিও বাজছে।

কাছে গিয়ে দেখল জিনা। মুসাও নেই, রিকিও না।

তাতে হতাশ হলো না দেখে নিজেই অবাক হয়ে গেল জিনা। তারমানে জনের সঙ্গ তার খারাপ লাগছে না। পানির কিনার ধরে পাশাপাশি হেঁটে চলল দুজনে। খুব সুন্দর করে গুছিয়ে কথা বলতে পারে জন। অনেক কিছু জানে। একটা তিমির গল্প বলল। পথ হারিয়ে বসন্তের শুরুতে নাকি তীরের একটা অল্প পানির খাঁড়িতে এসে আটকে গিয়েছিল। ওটার বন্দি চেহারার নিখুঁত বর্ণনা দিয়ে ছবিটা দেখিয়ে দিল জিনাকে। শহরের লোকে বহু কষ্টে খোলা সাগরে বের করে দিয়েছিল আবার তিমিটাকে।

কথা বলতে বলতে কখন যে ওরা দক্ষিণের পাহাড়ের দিকে ঘুরে গেছে, বলতে পারবে না। হঠাৎ লক্ষ করল জিনা, পানির ধার থেকে তীরের অনেক ভেতরে চলে এসেছে। সামনেই পাথরের পাহাড়।

একপাশে বেশ খানিকটা দূরে বোট ডক। ঢেউয়ের গর্জন বেড়েছে। অস্বস্তি বোধ করতে লাগল জিনা। এত নির্জনতা তার পছন্দ হচ্ছে না।

'কই, সমস্ত সৈকতই তো চষে ফেললাম,' যেন তার মনের কথা পড়তে পেরেই সহজ কণ্ঠে বলল জন। 'তোমার বন্ধুকে তো পাওয়া গেল না। বেরোয়ইনি হয়তো বাড়ি থেকে।'

'চলো, ফিরে যাই,' পা বাড়াতে গেল জিনা।

'দাঁড়াও না, ভালই তো লাগছে। থাকি আরেকটু।'

'নাহ্, আমার ভাল লাগছে না।'

সামনে এসে দাঁড়াল জন। মুখোমুখি হলো। হাতটা চলে এল জিনার নাকের কাছে।

অদ্ভুত একটা মিষ্টি গন্ধ নাকে ঢুকল জিনার। বডি স্প্রে'র নয়। আফটার শেভ লোশন? হবে হয়তো কোন্ ব্র্যান্ডের লোশন ব্যবহার করে জন, জিজ্ঞেস করতে যাচ্ছিল জিনা, এই সময় চোখ চলে গেল ওপর দিকে। মেঘের নিচ দিয়ে উড়ে যেতে দেখল কয়েকটা বাদুড়কে।

'এখানে অতিরিক্ত বাদুড়!'

'বাদুড়কে ভয় পাও নাকি?'

মুখ নামাল জিনা। 'ভয় পাব কেন?'

'না, এমনি। বাদুড়ের সঙ্গে ভ্যাম্পায়ারের সম্পর্ক আছে কিনা। স্যান্ডি হোলোতে কিন্তু ভ্যাম্পায়ারের গুজব আছে। মানুষকে আক্রমণ করার কথাও শোনা যায়।'

'দূর, ওসব ফালতু কিচ্ছা। আমি বিশ্বাস করি না।'

'যখন পড়বে ওদের কবলে, তখন বুঝবে মজা,' রহস্যময় কণ্ঠে বলে হাসতে লাগল জন। আবার হাত বাড়াল জিনার নাকের কাছে।

মিষ্টি গন্ধ পেল জিনা। কিসের গন্ধ জিজ্ঞেস করতে গিয়ে এবারও জিজ্ঞেস করা হলো না। কথা শোনা গেল। বাঁকের আড়াল থেকে বেশ জোরেই কথা বলতে বলতে বেরিয়ে এল একজোড়া দম্পতি। ওদের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় মুখ ফিরিয়ে তাকাল। জিনা আর জনের উদ্দেশে হাত নাড়ল মহিলা।

জিনাও হাত নেড়ে জবাব দিল। জনের হাত ধরে টানল, 'এসো। এখানে আর ভাল লাগছে না আমার।'

মনে হলো, দম্পতিরা আসাতে নিরাশ হয়েছে জন। অনিচ্ছাসত্ত্বেও মাথা ঝাঁকিয়ে বলল, 'হ্যাঁ, চলো।'

পাঁচ

'সাগরের কি অবস্থা?' জানতে চাইলেন মিস্টার আমান। পরনে বেদিং স্যুট। রান্নাঘরের কাউন্টারে দাঁড়িয়ে কাপে কফি ঢালছেন। চোখে এখনও ঘুম।

সকাল সকাল ঘুম থেকে উঠে পড়েছিল মুসা। বাবা-মা তখনও ঘুমে। নিঃশব্দে বেরিয়ে গিয়েছিল ঘর থেকে। সৈকতে গিয়ে দৌড়াদৌড়ি সেরে সবে

ফিরেছে।

'সাংঘাতিক,' বলে, টান দিয়ে ফ্রিজের ডালা খুলল মুসা। কমলার রসের প্যাকেট বের করল।

কফির কাপে চুমুক দিলেন মিস্টার আমান। 'সাংঘাতিক মানে?' খোলা জানালা দিয়ে বাইরে তাকালেন। পরিষ্কার আকাশ। ঝলমলে রোদ। 'ঝড়ের তো কোন লক্ষণ দেখছি না।'

'ঝড়ের কথা বলিনি। বড় বড় ঢেউ। বিশাল একেকটা।' প্যাকেটের কোণা দাঁত দিয়ে কেটে ফুটো করে মুখে লাগাল মুসা। এক চুমুকে অর্ধেকটা খতম করে ফেলে হাতের উল্টো পিঠ দিয়ে ঠোঁট মুছে তাকাল। 'বাবা, কখন উঠেছ?'

দেয়ালের ঘড়ির দিকে তাকালেন মিস্টার আমান। সাড়ে ন'টা বাজে। 'এই বিশ মিনিট। কেন?'

'রিকি ফোন করেছিল?'

'না,' হাই তুললেন মিস্টার আমান। 'টেনিস খেলতে যাবে নাকি?'

'না। সাঁতার। বডিসার্ফিং। যা ঢেউ একেকখান, খুব মজা হবে।' ওয়ালফোনের কাছে এসে রিসিভার তুলে কানে ঠেকাল মুসা। নম্বর টিপতে যাবে, এই সময় জানালা দিয়ে তাকিয়ে চিৎকার করে উঠলেন আমান, 'দেখো দেখো, একটা হামিংবার্ড!'

রিসিভার রেখে লাফ দিয়ে এগিয়ে এল মুসা। 'কই? কোথায়?'

'ওই তো, ওই ফুলটার কাছে ছিল। মিস করলে।'

'কত্তবড়?'

'মৌমাছির সমান।'

'এখানে সবই মৌমাছির সমান নাকি? কাল রাতে আমার ঘরে কতগুলো নীল মাছি ঢুকেছিল। মৌমাছির সমান। এত্তবড় মাছি আর দেখিনি।'

'এত্ত ছোট পাখিও আর দেখিনি,' ফুলগাছগুলোর দিকে তাকিয়ে আছেন আমান। পাখিটাকে খুঁজছে তাঁর চোখ।

মুসাও তাকিয়ে আছে।

কফি শেষ করে কাপটা কাউন্টারে রেখে ফিরে তাকালেন আমান, 'রিকিকে ফোন করছিলে নাকি?'

'হ্যাঁ।'

'এত সকালে? এখানে এত তাড়াতাড়ি তো কেউ ওঠে না।'

'রিকি আমার চেয়েও সকালে ওঠে।'

আবার গিয়ে রিসিভার কানে ঠেকাল মুসা।

অনেকক্ষণ রিঙ হওয়ার পর ধরলেন রিকির আম্মা।

'আন্টি, আমি মুসা। রিকি কোথায়?'

'অ, তুমি। বাগান থেকে রিঙ হচ্ছে শুনলাম। এসে ধরতে দেরি হয়ে গেল।...রিকি তো এখনও ওঠেনি। কাল রাতে দেরি করে ফিরেছে। দাঁড়াও, দেখে আসি।'

'আলসেমি রোগে ধরল নাকি ওকে!' আনমনে বলল মুসা। ঘড়ির দিকে তাকাল। সব সময় ভোরে ওঠা রিকির অভ্যেস। পৌনে দশটা পর্যন্ত কখনও বিছানায় থাকে না।

রিসিভার ধরেই আছে মুসা। অনেকক্ষণ পর পায়ের শব্দ শুনল। খুটখাট শব্দ। ভেসে এল রিকির ঘুমজড়ানো, খসখসে ভারী কণ্ঠ, 'হালো!'

'রিকি? ঘুম থেকে উঠে এলে নাকি?'

নীরবতা। 'হ্যাঁ।' হাই তোলার শব্দ।

'কাল রাতে কোথায় ছিলে?'

গলা পরিষ্কার করে নিল রিকি, 'একটা মেয়ের সঙ্গে বেড়াতে গিয়েছিলাম।'

'খাইছে! কি বললে?' বিস্ময় চাপা দিতে পারল না মুসা।

'মেয়েটা অদ্ভুত, বুঝলে। ওর সঙ্গে হাঁটতে, কথা বলতে, একটুও সঙ্কোচ হচ্ছিল না আমার।'

'তোমাদের হলো কি! তুমি গেলে একটা অপরিচিত মেয়ের সঙ্গে, জিনা গেল একটা ছেলের সঙ্গে···হ্যাঁ, তারপর?'

ঘুমজড়িত কণ্ঠে গুঙিয়ে উঠল রিকি।

'আই রিকি, শুনতে পাচ্ছ?'

'হ্যাঁ। কি জানি হয়েছে আমার! কিছুতেই চোখ টেনে খুলে রাখতে পারছি না। ঘুম যাচ্ছেই না।'

'জাহান্নামে যাক তোমার ঘুম। মেয়েটা কে?'

'লীলা। খুব ভাল মেয়ে। না দেখলে বুঝবে না। আমার সঙ্গে এত ভাল আচরণ করল। আমাকে ব্যঙ্গ করল না, ইয়ার্কি মারল না। ওর সঙ্গে কথা বলতে কোন অসুবিধেই হয়নি আমার।'

'ভাল। তা-ও যে আড়ষ্টতাটা দূর হচ্ছে তোমার···সৈকতে যাবে না?'

'নাহ। পারব না। শরীরটা কেমন ম্যাজম্যাজ করছে। দুর্বলও লাগছে খুব। রাতে কুয়াশার মধ্যে ঘোরাঘুরি করেছি অনেক। জ্বরটর আসবে নাকি বুঝতে পারছি না। এলে বিপদে পড়ে যাব।'

'কিসের বিপদ?'

'লীলাকে কথা দিয়েছি, আজ রাতে ওকে নিয়ে শহরে ঘুরতে বেরোব। তুমি আর জিনাও চলে এসো।'

'আসব। তোমার শরীর কি খুবই খারাপ? যা দারুণ ঢেউ দেখে এলাম না। সার্ফিঙে না গেলে মিস করবে।'

'পারছি না, ভাই। সত্যি খুব দুর্বল লাগছে। এত ঘুম আমার জীবনেও পায়নি। রিসিভার ধরে রাখতে পারছি না। রাখি, অ্যাঁ? রাতে দেখা হবে।'

মুসা জবাব দেয়ার আগেই লাইন কেটে গেল।

রিসিভার রেখে ভাবতে লাগল মুসা, কার সঙ্গে সার্ফিঙে যাওয়া যায়? টনির কথা মনে পড়ল।

ফোন করল। কিন্তু বহুক্ষণ চেষ্টা করেও পেল না ওকে। ফোন ধরল না

কেউ টনিদের বাড়িতে।

তারপর করল জিনাকে। জিনার আম্মা ধরলেন। জানালেন, জিনা বাথরুমে। দিনের বেলা কোথাও বেরোতে পারবে বলে মনে হয় না। ঘরের কাজ আছে। এত বেশি জঞ্জাল, সাফ করতে করতেই বেলা গড়াবে।

হতাশ হয়ে শেষে জানালার কাছে এসে দাঁড়াল সে। বাবা বাগানে ফুলগাছগুলোর কাছে ঘোরাঘুরি করছেন। হামিংবার্ডটাকে আবার দেখার আশা ছাড়তে পারেননি এখনও। মনেপ্রাণে তিনি একজন নেচারালিস্ট। জন্তু-জানোয়ার ধরতে তিন গোয়েন্দার সঙ্গে কত জায়গায় যে গিয়েছেন। আমাজানের জঙ্গলেও গিয়েছিলেন একবার।

বাইরে বেরোল মুসা। আর কোন উপায় না দেখে বাবাকেই পাকড়াও করল। 'বাবা, সাঁতার কাটতে যাবে না? এক মিনিট দাঁড়াও। আমি স্যুটটা পরে আসি।'

ভুরু কুঁচকে ছেলের দিকে তাকালেন মিস্টার আমান। ধীরে ধীরে হাসি ছড়িয়ে পড়ল মুখে, 'কেন, কাউকে জোগাড় করতে পারলে না। সাগরে যখন ঢেউ বেশি, সাঁতার কাটতে না-ই বা গেলাম আজ। বরং এক কাজ করি চলো। হামিংবার্ড আর প্রজাপতির ছবি তুলেই কাটাই। একটা দুর্লভ প্রজাতির প্রজাপতিও দেখলাম ওদিকের ঝোপটায়। ধরতে পারলে মন্দ হয় না।'

ছয়

রাত আটটার সামান্য পরে জিনাকে নিয়ে পিজ্জা কোভে ঢুকল মুসা। একটা টেবিলে বসে থাকতে দেখল রিকি আর লীলাকে।

'রিকিকে অমন লাগছে কেন?' মুসার কানের কাছে ফিসফিস করে বলল জিনা।

'কেমন?'

'বুঝতে পারছ না?'

'না।'

'ঠিক বোঝাতে পারব না। মোটকথা, অন্য রকম।'

পিজ্জা হাউসটায় খুব ভিড়। প্রায় সবই ওদের বয়েসী ছেলেমেয়ে। গুঁতোগুঁতি করে টেবিলে জায়গা করে নিচ্ছে। হই-হল্লা করছে।

মুসাদের দেখেই আড়ষ্ট হয়ে গেল রিকি। বোধহয় আগেই লীলাকে কিছু বলে রেখেছে, লীলাই ওদের সঙ্গে পরিচয় করে নিল, 'হাই, আমি লাইলাক। রিকির নতুন বন্ধু। অতএব তোমাদেরও। লীলা বলে ডাকবে।'

কিন্তু 'নতুন বন্ধু'টিকে পছন্দ করতে পারল না জিনা। লীলার বাড়িয়ে দেয়া হাতে হাত মিলিয়ে শুকনো গলায় বলল, 'হাই।'

মুসার দিকে তাকিয়ে হেসে বলল রিকি, 'পিজ্জার অর্ডার দিয়ে রেখেছি।'

'তোমরাও কি রকি বীচ থেকে?' লীলা জানতে চাইল।
'হ্যাঁ,' জবাব দিল মুসা।
জিনা তাকিয়ে আছে লীলার নখের দিকে। লম্বা, নিখুঁত। সুন্দর করে নেল পালিশ লাগানো। লিপস্টিকের মত একই রঙের। রিকির দিকে কাত হয়ে বসেছে সে।
রিকির এই পরিবর্তনে অবাক হয়ে গেছে জিনা। মেয়েটার বেহায়াপনা সহ্য করছে কি করে রিকি?
ধাতব ট্রে'তে করে গরম গরম পিজ্জা এল। ধোঁয়া উড়ছে। কেটে নিয়ে আসা হয়েছে। হাত বাড়িয়ে একটা করে টুকরো তুলে নিল মুসা, জিনা আর রিকি।
লীলা নিল না। তাকালই না প্লেটের দিকে। কৈফিয়ত দিল, 'পেট ভরে ডিনার খেয়ে এসেছি। একটা কণাও আর ঢোকানোর জায়গা নেই।'
'আরে একটু নাও না,' অনুরোধ করল রিকি।
'উঁহু, পারব না। খাও তোমরা।'
খাবার দেখে হঠাৎ যেন কেমন হয়ে গেছে লীলা, লক্ষ করল মুসা। চোখে ক্ষুধার্ত মানুষের দৃষ্টি। তাহলে নিচ্ছে না কেন?
জিনাও তাকিয়ে আছে লীলার চোখের দিকে। দরজার দিকে তাকিয়ে বড় বড় হয়ে যেতে দেখল ওর বাদামী চোখ।
ফিরে তাকাল জিনা। জনকে ঢুকতে দেখে তার চোখও স্থির হয়ে গেল ওর ওপর।
চোখে চোখ পড়তে হাসল জন।
মুসার গায়ে কনুই দিয়ে গুঁতো দিল জিনা। 'ওর সঙ্গেই কাল রাতে দেখা হয়েছিল আমার।'
মুখ ভর্তি পিজ্জা চিবাতে চিবাতে ফিরে তাকাল মুসা। 'ও।' একনজর দেখল জনকে। তারপর আবার খাবারে মন দিল।
ওদের দিকে এগিয়ে এল জন।
পরিচয় করিয়ে দিল জিনা, 'ও জন গুডওয়াকার। কাল রাতে পরিচয়।...জন, ও আমার বন্ধু মুসা। ও রিকি। আর ও লীলা, রিকির নতুন বন্ধু।'
হাত মেলাল জন। একটা চেয়ারে বসল।
ট্রেটা ওর দিকে ঠেলে দিল মুসা, 'পিজ্জা নাও।'
'নো, থ্যাংকস,' চেয়ারে হেলান দিল জন। 'এইমাত্র খেয়ে এলাম।' তাকালই না খাবারের দিকে। জিনাকে জিজ্ঞেস করল, 'সৈকতের ধারে হাঁটতে যাবে না আজ?'
জনের দিকে তাকাল জিনা। আটকে রইল চোখ। কেমন সম্মোহনী দৃষ্টি জনের চোখে। জোর করে নজর সরাতে হলো জিনাকে। মুসার দিকে তাকাল, 'মুসা, কি করবে?'
'আমি?' সিদ্ধান্ত নিতে পারছে না যেন মুসা। 'তোমার কি ইচ্ছে?'

'হাঁটতে যেতেই ইচ্ছে করছে।'

'আমারও,' লীলা বলল। 'রিকির সঙ্গে!' রিকির বাহুতে হাত রাখল লীলা, 'রিকি, কি বলো?'

ঘাড় কাত করল রিকি, 'ভালই হয়।'

'ভিডিও গেম খেলতে যাবে না?'

'বদ্ধ জায়গায় ঢুকতে ইচ্ছে করছে না আর আমার। হট্টগোল, মনিটরের স্ক্রীনের আলো···নাহ্! তারচেয়ে সৈকতের খোলা হাওয়া, অন্ধকারে হেঁটে বেড়ানো অনেক ভাল।''

জিনার দিকে তাকাল মুসা।

মাথা নাড়ল জিনা, 'উঁহু, আমিও যাচ্ছি না ওই আর্কেডে। সিনেমাও ভাল লাগবে না। তারচেয়ে সাগরের খোলা হাওয়াই ভাল।'

হঠাৎই আবিষ্কার করল মুসা, এখানে বড় একা হয়ে গেছে সে। ধীরে ধীরে বলল, 'ঠিক আছে, যাও তোমরা। দেখি, আমি বরং টনিকে খুঁজে বের করিগে। ভিডিও-গেম খেলব। ওকে না পেলে সিনেমা দেখতে যাব। একাই যাব।'

দ্রুত খাওয়া শেষ করল রিকি। বেরোনোর জন্যে যেন আর তর সইছে না।. ওর অস্থিরতার কারণ বুঝতে পারল না মুসা। তবে বদলে যে গেছে, এ ব্যাপারে জিনার সঙ্গে এখন সে-ও একমত।

প্রায় অপরিচিত একটা ছেলের সঙ্গে জিনার যাওয়াটা পছন্দ হচ্ছে না তার। কিন্তু কি করবে? যার সঙ্গে খুশি বেরোতে পারে জিনা, তাকে বাধা দেয়ার কোন অধিকার তার নেই। বাধা দিলে জিনাই বা শুনবে কেন?

খাওয়া শেষ করে উঠে দাঁড়াল রিকি। মুসার দিকে তাকিয়ে বলল, 'বিল আমি দিয়ে যাচ্ছি। তুমি শেষ করেই বেরোও।' জিনার দিকে ফিরল, 'তোমার হয়েছে?'

'হ্যাঁ, চলো।' পেপার ন্যাপকিনে মুখ মুছে উঠে দাঁড়াল জিনা।

বেরিয়ে গেল চারজনে।

দরজার দিকে তাকিয়ে থেকে চিন্তিত ভঙ্গিতে পিজ্জা চিবাতে লাগল মুসা। কিশোর আর রবিনের অভাবটা তীব্রভাবে বোধ করল আরেকবার। দূর, একা একা কোথাও বেড়াতে বেরিয়ে আনন্দ নেই। স্যান্ডি হোলোর মত এত চমৎকার জায়গাতেও না। একমাত্র ভরসা এখন টনি। ওকে খুঁজে বের করতে না পারলে সন্ধ্যাটাই মাটি হবে।

সাত

দুদিন পর। সকালবেলা ঘুম থেকে জেগে, হাই তুলতে তুলতে আড়মোড়া ভাঙল মুসা। উঠে এসে দাঁড়াল বেডরুমের জানালার সামনে। বাইরের উজ্জ্বল

আলোর দিকে তাকিয়ে চোখ মিটমিট করতে লাগল। পরিষ্কার আকাশ। গাছের মাথার ওপরে উঠে গেছে সূর্য। ঘরটা গরম, আঠা আঠা লাগছে।

আবার হাই তুলতে তুলতে ড্রেসারের দিকে এগোল সে। ড্রেসারের গায়ে ধাক্কা লাগল। ঘুম যায়নি এখনও। ড্রয়ার ঘেঁটে বের করল বেদিং স্যুট। টেনেটুনে পরে নিল কোনমতে।

দুপদাপ করে নেমে এল রান্নাঘরে। কাউন্টারে রাখা চাপা দেয়া এক টুকরো কাগজ দেখতে পেল। বাবা লিখে রেখে গেছেন। মাকে নিয়ে চলে গেছেন এক বন্ধুর বাড়িতে। দূরে কোথাও মাছ ধরতে যাবেন সকলে মিলে। ইস্, আফসোস করতে লাগল মুসা। জানলে সে-ও যেতে পারত সঙ্গে। এখানে আর কোন আকর্ষণ বোধ করছে না। রিকি যেন কেমন হয়ে গেছে। জিনার সঙ্গেও জমছে না।

গতরাতে কখন ফিরেছিল? মনে করতে পারল না মুসা। বাড়ি ঢুকে ঘড়ি দেখেনি। সিনেমা দেখে, টনি আর আরও কয়েকজন বন্ধুর সঙ্গে গিয়েছিল কার্নিভলে। কিন্তু বন্ধ হয়ে গেছে তখন। মাঠ অন্ধকার।

মাঝরাতের পরই হবে, এটা ঠিক। কারণ নাইট শো দেখেছে। তার সঙ্গে জিনা আর রিকিকে না দেখে প্রশ্ন চেপে রাখতে পারেনি টনি। 'জিনার কি হয়েছে, বলো তো?'

'কি জানি! কেন?' জানতে চেয়েছে মুসা।

'অন্য একটা ছেলের সঙ্গে ঘুরে বেড়ায়। লম্বা। আমাদের চেয়ে বয়েস বেশি। এ শহরের লোক নয়। আর রিকি ঘোরে একটা মেয়ের সঙ্গে। তাকেও এ শহরের ছেলেমেয়েরা কেউ কখনও দেখেনি। ঘটনাটা কি, বলো তো?'

'কি জানি! যার যেখানে ইচ্ছে ঘুরুক। আমি কি ওদের গার্জেন নাকি?'

'না, তা বলছি না। তবু...'

'দেখো, এ শহরের লোক নয় বলেই সন্দেহ করতে হবে, এমন কোন কথা নেই। আমিও তো এখানকার লোক নই। ট্যুরিস্ট সীজন। অপরিচিত লোক আসবেই।'

আলোচনাটা আর এগোতে দেয়নি মুসা। ওখানেই চাপা দিয়েছে।

জিনার কথা ভাবতেই মনে হলো ফোন করে। দিনের বেলায়ও কি জনের সঙ্গে বেরোবে ও? কে জানে। ঘড়ি দেখল। সাড়ে দশটা বাজে। ঢকঢক করে গিলে ফেলল এক গ্লাস কমলার রস। তাড়াহুড়ো করতে গিয়ে গলায় আটকে গেল। ব্যথা লাগল। শুকিয়ে আছে কণ্ঠনালী।

জিনাদের নম্বরে ডায়াল করল সে।

তিন-চার বার রিঙ হওয়ার পর তুলে নিলেন জিনার আম্মা। 'হালো?'

'আন্টি? আমি মুসা। জিনা কোথায়?'

'ঘুমোচ্ছে।'

'এত বেলায়? ও তো সকাল সকালই উঠে পড়ে।'

'কি জানি, বুঝলাম না। ঘণ্টাখানেক গিয়ে অনেক ডাকাডাকি করে এসেছি। ঘুমই ভাঙে না। বলল, শরীর খারাপ লাগছে। উঠতে ইচ্ছে করছে

না। এ রকম তো কখনও হয় না!'

'হুঁ!' কাল রাতে কখন ফিরেছে, জনের সঙ্গে কতক্ষণ ছিল জিজ্ঞেস করতে ইচ্ছে করল মুসার। করল না। বলল, 'ঘুম ভাঙলে বলবেন সৈকতে যেতে। আমি সাঁতার কাটতে যাচ্ছি।'

লাইন কেটে দিল সে। ঘাড়ের পেছনটা চুলকাল। রান্নাঘরের মধ্যে আরও গরম। ভারী, ভেজা ভেজা বাতাস।

বেজায় গরম তো আজকে। ঘরে কিংবা বাগানে না থেকে সৈকতে যাওয়াই ভাল।

রিকিকে ফোন করল। সবে উঠেছে সে। ওকে বলল সৈকতে চলে যেতে। 'সঙ্গে বুগি বোর্ড নিয়ো। সাগরের অবস্থা জানি না এখনও। ঢেউ থাকলে সার্ফিং জমবে আজ।'

সৈকতে এসে দেখল ইতিমধ্যেই ভিড় জমিয়েছে সকালের সাঁতারুরা। ডোবাডুবি করছে, নীলচে সবুজ ছোট ঢেউ কেটে সাঁতরে যাচ্ছে এদিক ওদিক। হলুদ আর সাদা ডোরাকাটা একটা বড় ছাতার নিচে তোয়ালে বিছিয়ে শুয়ে আছে রিকি।

'আই, রিকি,' বলে এগিয়ে গেল মুসা।

'কি খবর?' ঘুমজড়িত কণ্ঠে জানতে চাইল রিকি।

'বুগি বোর্ড আনোনি?'

আস্তে মাথা তুলে তাকাল রিকি, 'ভুলে গেছি।'

অধৈর্য ভঙ্গিতে নিজের বোর্ডটা হাত থেকে ছেড়ে দিল মুসা। বসে পড়ল বালিতে। পিঠে রোদ লাগছে। 'কাল রাতে কি করেছ? মেয়েটার সঙ্গে দেখা হয়েছে?'

'হ্যাঁ,' হাই তুলল রিকি। 'লীলার সঙ্গে শহরে ঘুরতে বেরিয়েছিলাম। ঘোরার পর সৈকতেও যেতে চেয়েছিল। কিন্তু রাজি হইনি। এত ক্লান্ত লাগছিল, সোজা বাড়ি গিয়ে শুয়ে পড়েছি।'

'ওঠো, সাঁতার কাটলেই শরীরের জড়তা চলে যাবে।'

সাড়া দিল না রিকি।

'অ্যাই, রিকি, চুপ করে আছ কেন?'

নীরবতা।

'রিকি?'

মুখের ওপর ঝুঁকে ভালমত দেখে মুসা বুঝল, রিকি ঘুমিয়ে পড়েছে।

হয়েছে কি ওর? অবাক হলো মুসা। সারারাত ঘুমিয়ে সকালে সৈকতে আসতে না আসতে ঘুমিয়ে পড়ল আবার, এই হট্টগোল আর রোদের মধ্যে!

ঘুমের মধ্যেই দীর্ঘশ্বাস ফেলল রিকি। গড়িয়ে গিয়ে চিত হলো।

আরও একটা ব্যাপার অবাক লাগল মুসার। কোন্ ধরনের সানট্যান ব্যবহার করে রিকি? রোদে পুড়ে চামড়া তো বাদামী হবার কথা। তা না হয়ে হচ্ছে ফ্যাকাসে, রক্তশূন্য।

✡

সেদিন অন্ধকার যতই ঘনিয়ে আসতে লাগল, উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়তে লাগল লীলার দেহে। সৈকতে এসেছে খাবারের নেশায়। পেটে প্রচণ্ড ক্ষিধে। কিন্তু কোন হোটেলে গিয়ে কিছু খেতে পারবে না। একটা জিনিস দিয়েই খিদে মেটাতে হবে।

রক্ত!

মানুষের রক্ত!

শুরু যখন করেছে, শেষ না করে উপায় নেই।

অন্যান্য রাতের মত আজও সেই উদ্দেশ্যেই বেরিয়েছে। শিকার ঠিকই করা আছে। গত কয় রাত তার রক্ত পান করেই কাটিয়েছে। আজও করবে। তবে আজ শেষ। এক শিকারে বেশিদিন চালানো যায় না। বড় জোর তিন কি চারবার রক্ত পান করা যায়। এর বেশি করতে গেলে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে শিকার। মেরে ফেললে পুলিশ আসবে। তদন্ত হবে। ঘাবড়ে যাবে লোকে। রাতে আর সৈকতে বেরোতে চাইবে না। শিকার পাওয়া কঠিন হয়ে পড়বে। তাই রিকিকে একেবারে মেরে ফেলতে চায় না সে। শেষবারের মত তার রক্ত খাবে আজ।

রিকির আসার অপেক্ষাই করছে লীলা।

আসতে দেখা গেল ওকে। হাত নেড়ে ডাকল লীলা।

ক্লান্ত ভঙ্গিতে অনেকটা বুড়ো মানুষের মত ঝুঁকে পা টেনে টেনে এগিয়ে আসতে লাগল রিকি।

হাঁটতে শুরু করল লীলা। ধীরে ধীরে এগিয়ে চলল নৌকা রাখার ডকটার দিকে। ছায়ায় দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করতে লাগল। পেছনের পানিতে ঢেউয়ে দোল খাচ্ছে তিনটা নৌকা। গায়ে গায়ে ঘষা খেয়ে মৃদু শব্দ তুলছে।

'লীলা, কোথায় তুমি?' ক্লান্তস্বরে ডাকল রিকি।

'এই যে এখানে। এসো।'

রিকি আরও কাছে আসতে হাত ধরে তাকে ছায়ায় টেনে নিল লীলা। গলার শিরাটার দিকে তাকাল। দপদপ করে লাফাচ্ছে। ওটার ভেতরে বয়ে যাওয়া ঘন তরল পদার্থ চুমুক দিয়ে পান করার ইচ্ছেটা পাগল করে তুলল ওকে। প্রথম প্রথম ভাল লাগত না। ঘেন্না লাগত। ধীরে ধীরে অভ্যেস হয়ে গেছে। এখন তো বরং ভালই লাগে। নেশা হয়ে গেছে। বাঘের যেমন হয়ে যায়। আফ্রিকার মাসাইদের যেমন হয়। জ্যান্ত গরুর শিরা ফুটো করে চুমুক দিয়ে রক্ত পান করে ওরা।

স্থির দৃষ্টিতে রিকির শিরাটার দিকে তাকিয়ে থেকে জিজ্ঞেস করল লীলা, 'রিকি, আজ কি করতে চাও?'

'সৈকতেই বসে থাকব। শহর ঘোরার কিংবা সাঁতার কাটার শক্তি নেই। কেন যেন বল পাচ্ছি না শরীরে। মাথাটাও থেকে থেকে ঘুরছে।'

ধপ করে বসে পড়ল রিকি।

ওর পাশে বসল লীলা। কাঁধে হাত রাখল।

মুখ তুলে তাকাল রিকি। মলিন হাসি হাসল।

জবাবে লীলাও হাসল।

মাথার ওপর কিঁচকিঁচ করে উঠল একটা বাদুড়।

তাকাল না রিকি। চেয়ে আছে লীলার মুখের দিকে।

ঠোঁট দুটো ফাঁক হলো লীলার। ঝকঝক করছে সাদা দাঁত। দুই কোণের দুটো দাঁত অস্বাভাবিক বড়। শ্বদন্ত। নেকড়ের দাঁতের মত।

এই প্রথম ব্যাপারটা লক্ষ করল রিকি। শিউরে উঠল নিজের অজান্তেই।

কিন্তু কিছু করার নেই তার। গায়ে বল নেই। উঠে দৌড় দেয়ার ক্ষমতা নেই। সম্মোহিতের মত তাকিয়ে আছে লীলার মুখের দিকে।

ধীরে ধীরে এগিয়ে আসতে লাগল মুখটা। চেপে বসল রিকির গলার শিরাটার ওপর।

কুট করে সুচ ফোটার ব্যথা অনুভব করল রিকি।

শেষ মুহূর্তে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিতে চাইল লীলার মুখটাকে।

পারল না। অসহায়ের মত আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হলো।

চোখের সামনে দুলে উঠল আঁধারের পর্দা।

পেটের খিদেয় পাগলের মত চুষেই চলল লীলা। তার গায়ের ওপর ঢলে পড়ল রিকি। তারপরেও ছাড়ল না লীলা। টনক নড়ল, যখন আর রক্ত বেরোল না। শিরা দিয়ে বেরিয়ে এল শুধু পানির মত রস।

মুখ সরাল লীলা।

রিকির দিকে তাকিয়ে আঁতকে উঠল। চাপা গোঙানি বেরোল হাঁ হয়ে যাওয়া মুখ দিয়ে। এক ফোঁটা রক্ত রাখেনি রিকির শরীরে। খেতে খেতে মেরেই ফেলেছে।

খুন!

✡

ছোট্ট দ্বীপ। গাছের মাথায় ডানা ঝাপটাচ্ছে অসংখ্য বাদুড়। ছাই রঙ আকাশে বিচিত্র ছায়া সৃষ্টি করে ইতিউতি উড়ে বেড়াচ্ছে। নিচে খুদে সৈকতের ধারে কাঠের তৈরি কতগুলো পরিত্যক্ত কুঁড়ে। মানুষ বাসের নিদর্শন। তবে এখন আর থাকে না কেউ চলে গেছে। নৌকা ছাড়া যাতায়াতের আর কোন উপায় নেই। হয়তো এ বাধ্যবাধকতার কারণেই দ্বীপটা ছেড়ে গেছে মানুষ। তারপর থেকেই এটা বাদুড়ের দখলে।

জঙ্গলের মধ্যে দ্বীপের অন্ধকার একটা ঘরে অপেক্ষা করছে জন। পুব দিকের দেয়াল ঘেঁষে রাখা একটা কফিন। জানালার চৌকাঠে ভর দিয়ে চন্দ্রালোকিত আকাশে বাদুড়ের ওড়া দেখছে।

শব্দ করে নিঃশ্বাস ফেলল সে। মুখে মৃদু হাসি। উড়ে বেড়ানো বাদুড়ের আনন্দ যেন তার মধ্যেও সঞ্চারিত হয়েছে।

আবহাওয়া বেশ গরম। দুঃখের বিষয়, এ রকম থাকে না সব সময়। গ্রীষ্মকালটা যেন চোখের পলকে শেষ হয়ে যায় এই অঞ্চলে। আরও দীর্ঘ হলে সুবিধে হত। শিকার পাওয়া যেত অনেক বেশি। আরও দ্রুত কাজ শেষ হয়ে

যেত ওদের।

সাগরের দিক থেকে আসতে দেখা গেল লীলাকে। ঘরে ঢুকল। ঠোঁটে রক্ত শুকিয়ে আছে। মলিন মুখে, ক্লান্ত ভঙ্গিতে ঘরে ঢুকল।

'কি ব্যাপার, লীলা?' জানতে চাইল জন।

'খবর ভাল না, জন,' ধপ করে কফিনটার ওপর বসে পড়ল লীলা।

'কি হয়েছে?'

'রিকিকে খুন করে ফেলেছি।'

চমকে গেল জন। 'বলো কি!'

'হ্যাঁ। রক্ত খেতে গিয়ে হুঁশ ছিল না। এমন খাওয়াই খেয়েছি, শুষে ছিবড়ে বানিয়ে দিয়েছি ওকে।...আর আমারই বা কি দোষ বলো? পেটে এত খিদে থাকলে করবটা কি?'

'সর্বনাশ করেছ! পুলিশ আসবে। তদন্ত হবে। কোনমতে আমাদের কথা জেনে গেলে আর রক্ষা নেই, ধাওয়া করে আসবে দ্বীপে।'

'জানবে কি করে আমরা এখানে আছি?'

ভেবে দেখল জন। 'তা অবশ্য ঠিক। কিন্তু...'

'তা ছাড়া আমিই যে খুন করেছি, তার কোন প্রমাণ নেই। লাশটাকে সাগরে ফেলে দিয়ে এসেছি। ওরা ভাববে ডুবে মারা গেছে রিকি। ময়না তদন্ত করে মৃত্যুর কারণ বুঝতে পারবে না। গলার ফুটো দুটো দেখে বড়জোর অবাক হবে, কিসের চিহ্ন বুঝতেই পারবে না।'

'আমি ভাবছি অন্য কথা। সৈকতে রহস্যময় খুন হতে দেখে রাতের বেলা যদি আসাই ছেড়ে দেয় লোকে, আমরা বাঁচব কি খেয়ে?'

'যা করার তো করে ফেলেছি। আগে থেকেই অত ভেবে লাভ নেই। বসে থাকি। দেখি, কি হয়।'

আট

খুব ভোরে ঘুম ভেঙে গেল মুসার। ঘামে ভেজা চাদরটা গায়ের ওপর থেকে টান মেরে সরিয়ে ফেলে উঠে বসল। নেমে এসে দাঁড়াল জানালার কাছে। পাখি ডাকছে। পুবের আকাশে ধূসর আলোর আভাস। ভোর হচ্ছে।

'কটা বাজল?' জোরে জোরেই নিজেকে প্রশ্ন করল সে।

চোখ ফেরাল ঘড়ির দিকে।

সাড়ে পাঁচটা—নীরবে ঘোষণা করল যেন ঘড়িটা।

ঘুম ভাল হয়নি। সারারাত ছটফট করেছে। এপাশ ওপাশ করেছে। মনের মধ্যে কি জানি কেন একটা অশান্তি।

রিকির কথা ভেবে। জিনার কথা ভেবে। দুজনের আচরণই বিস্ময়কর রকম বদলে গেছে।

সন্ধ্যায় সৈকত থেকে ফিরে জিনাকে ফোন করেছিল সে। খুব ব্যস্ত ছিল লাইনটা। সারাক্ষণ এনগেজ টোন। ডিনারের পর আবার করেছে। ধরেছেন জিনার আম্মা।

জিনা ঘরে নেই। বেরিয়েছে। নিশ্চয় জনের সঙ্গে, শঙ্কিত হয়ে ভেবেছে মুসা। আশঙ্কাটা কিসের, বুঝতে পারছে না।

জিনার সঙ্গে ভালমত কথা বলতে হবে—ঠিক করেছে সে। গলদটা কোনখানে জানা দরকার।

ওর চোখের সামনেই ফর্সা হতে থাকল আকাশ। পাখির কলরব বাড়ছে।

এখন বিছানায় ফিরে যাওয়ার কোন মানে হয় না। ঘুম আর আসবে না। তারচেয়ে সৈকতে গিয়ে কিছুক্ষণ দৌড়াদৌড়ি করে এলে অস্থির মনটা শান্ত হতে পারে।

আলমারি খুলে একটা কালো রঙের স্প্যানডেক্স বাইসাইকেল শর্টস বের করে পরল। পায়ে ঢোকাল রানিং শূ। দক্ষ হাতে কয়েক টানে বেঁধে নিল ফিতে দুটো।

বাইরে বেরিয়ে নিঃশব্দে টেনে দিল দরজাটা। ভোরের শীতল বাতাস শিশিরে ভেজা। একসারি কটেজের পাশ দিয়ে দৌড়াতে শুরু করল। সাগরের দিক থেকে আসছে নোনা শুঁটকির গন্ধ।

সৈকতের কিনারে এসে পানিকে একপাশে রেখে গতি বাড়িয়ে দিল সে। কালচে-ধূসর আকাশের ছায়া পড়েছে পানিতে। কালির মত কালো লাগছে পানি। ওকে এগোতে দেখে চারদিকে দৌড়ে সরে যাচ্ছে সী গাল। বেশি কাছাকাছি হলে তীক্ষ্ণ চিৎকার দিয়ে আকাশে উঠে পড়ছে।

নির্জন সৈকত। কেউ বেরোয়নি এত ভোরে। শরীর চর্চা যারা করে, অথবা বহুমূত্র কিংবা রক্তচাপের রোগী, তারাও নয়। সে একা।

ক্রমশ উজ্জ্বল হতে থাকা দিগন্তরেখার কাছে একটা জাহাজের কালো অবয়ব চোখে পড়ছে। কোন ধরনের বার্জ হবে। এই আলোয় কেমন বিকৃত হয়ে গেছে আকৃতিটা, ছায়ার মত কাঁপছে। বাস্তব লাগছে না। মনে হচ্ছে ভূতুড়ে জাহাজ।

গতি কমিয়ে দিল মুসা। তবে দৌড়ানো বন্ধ করার কোন ইচ্ছে নেই। এগিয়ে চলল দৃঢ়পায়ে। একটা অগ্নিকুণ্ডের পাশ কাটিয়ে এল। পুরোপুরি নেভেনি ওটা। কালো ছাইয়ের ভেতরে এখনও ধিকিধিকি আগুন। পোড়া একটা কাঠ ছুঁড়ে দেয়া হয়েছিল সাগরে, ঢেউ আবার সেটা ফিরিয়ে এনে ফেলে রেখেছে সৈকতে। বালিতে মরে পড়ে আছে দুটো স্টারফিশ।

নোনা পানির কণা এনে চোখেমুখে ফেলছে বাতাস। ভেজা বালিতে মচমচ শব্দ তুলছে ওর জুতো। ধূসর রঙকে হালকা পর্দার মত সরিয়ে দিয়ে উঁকি দিতে আরম্ভ করেছে ভোরের রক্তলাল আকাশ। সেই রঙ প্রতিফলিত হচ্ছে সাগরেও।

দারুণ সুন্দর। দৌড়াতে দৌড়াতে ভাবছে মুসা। ঠাণ্ডা বাতাসের মধ্যেও বিন্দু বিন্দু ঘাম জমছে কপালে। চোখ তুলে তাকালেই সামনে দেখা যাচ্ছে

বালিয়াড়ির ওপারে কালচে পাহাড়ের চূড়াটা।

যতই এগোচ্ছে সেদিকে, পায়ের নিচে নুড়ির পরিমাণ বাড়ছে। বালি কম। মাটি শক্ত। পাহাড়ের ছায়া থেকে ঠেলে বেরিয়ে থাকা ডকটাও চোখে পড়ছে এখন।

আরও এগোতে ডকের কাছে পানিতে কি যেন একটা ভাসতে দেখা গেল।

কোন ধরনের ছোট নৌকা? দূর থেকে ভালমত বোঝা যাচ্ছে না।

পানিতে লাল রোদের ঝিলিমিলি। স্পষ্ট হচ্ছে জিনিসটা। একটা নৌকার পাশে ডুবছে, ভাসছে।

তিমির বাচ্চা নাকি? তীরের কাছে এসে অল্প পানিতে আটকা পড়েছে? নাকি মরে যাওয়া বড় কোন মাছ?

ডকের কাছে এসে দাঁড়িয়ে গেল। দৌড়ে আসার কারণে হাঁপাচ্ছে। হাত দিয়ে কপালের ঘাম মুছে জিনিসটা কি দেখার জন্যে এগিয়ে গেল।

কয়েক পা গিয়েই যেন হোঁচট খেয়ে দাঁড়িয়ে গেল। গলার কাছে আটকে আসতে লাগল দম।

পানিতে উপুড় হয়ে পড়ে আছে একজন মানুষ। দুই হাত দুই পাশে ছড়ানো। ভঙ্গিটা মোটেও স্বাভাবিক না।

কোন চিন্তাভাবনা না করেই পানিতে নেমে পড়ল মুসা। গোড়ালি ডুবে গেল ঠাণ্ডা পানিতে। উত্তেজনায় জুতো খোলার কথাও মনে ছিল না। ভিজে গেছে। এখন আর খুলেও লাভ নেই। মানুষটার কোমর ধরে টান দিল। বেশ ভারী। মুখের দিকে না তাকিয়েই কাঁধে তুলে নিল। বয়ে নিয়ে এল তীরে। শুইয়ে দিল বালিতে।

প্রায় নগ্ন দেহটা কাটাকুটিতে ভরা। ডকের কাছের ধারাল পাথরে ক্রমাগত বাড়ি খেয়ে খেয়ে এই অবস্থা হয়েছে। একটা কাটা থেকেও রক্ত বেরোচ্ছে না।

মুখ দেখার জন্যে চিত করে শুইয়েই চিৎকার করে উঠল মুসা।

রিকি!

দ্রুত একবার পরীক্ষা করেই নিশ্চিত হয়ে গেল, মারা গেছে রিকি।

ডুবল কি করে? সাঁতার তো ভালই জানত। নাকি ভাটার সময় নেমেছিল পানিতে, স্রোতে টেনে নিয়ে গেছে? জোয়ারের সময় আবার ফেলে গেছে সৈকতে?

রিকি মৃত! নিজের অজান্তেই হাঁটু ভাঁজ হয়ে গেল মুসার। পা ছড়িয়ে বসে পড়ল বালিতে। বুজে এল চোখ।

ওর চেয়ে কোন অংশেই খারাপ সাঁতারু ছিল না রিকি। ডোবার কথা নয়, যদি তীব্র ভাটার সময় না নেমে থাকে। কিন্তু রাতের বেলা নামতে গেল কেন সে?

'কেন, রিকি, কেন নামলে?' চোখ খুলে আচমকা চিৎকার করে উঠল মুসা। চোখে লাগছে কমলা রঙের রোদ। আবার মুদে ফেলল চোখ।

কতক্ষণ একভাবে বসে ছিল সে, বলতে পারবে না। মানুষের কথা শুনে

দ্বিতীয়বার চোখ মেলল। এগিয়ে আসতে দেখল দুজন জেলেকে।

নয়

চার রাত পর। আবার ঘুম আসছে না মুসার। বিছানায় গড়াগড়ি করছে। ছটফট করছে। চাদরটা এলোমেলো। বালিশগুলো মেঝেতে। অনেক চেষ্টায় তন্দ্রামত যা-ও বা এল, দুঃস্বপ্ন দেখতে লাগল।

রিকিকে দেখল সে।

অনেক বড় একটা সৈকত। ঝলমলে রোদে বালিকে লাগছে সোনালি। বড় বড় ঢেউ মাথা উঁচু করে রাজকীয় ভঙ্গিতে হেলেদুলে এসে আছড়ে পড়ছে সৈকতে। ভেঙে ছড়িয়ে পড়ছে মাথায় করে বয়ে আনা সাদা মুকুট।

খালিপায়ে দৌড়াতে দৌড়াতে এসে হাজির হলো রিকি। পরনে কালো রঙের সাঁতারের পোশাক। পানির কিনার ধরে দ্রুতপায়ে দৌড়াচ্ছে। কোন শব্দ হচ্ছে না। নিঃশব্দে উড়ে চলেছে যেন বালির ওপর দিয়ে।

তাকে ধরার জন্যে দৌড় দিল মুসা। ফিরে তাকাল না রিকি। মুসাকে কাছে যেতে দিল না। মুসা এগোলে সে-ও গতি বাড়িয়ে দিয়ে সরে যায়।

রোদে আলোকিত সৈকতেও রিকির মুখটা স্পষ্ট নয়। ছায়ায় ঢেকে রয়েছে যেন।

'প্লীজ, রিকি,' সামনে ঝুঁকে দৌড়াতে দৌড়াতে ভাবছে মুসা, 'একটু দাঁড়াও। তোমার চেহারাটা দেখতে দাও।'

তার অনুরোধেই যেন ফিরে তাকাল রিকি।

চমকে গেল মুসা।

আতঙ্কে বিকৃত হয়ে গেছে রিকির মুখ। ঠেলে বেরোনো চোখ। মুখটা হাঁ হয়ে আছে চিৎকারের ভঙ্গিতে।

হঠাৎ কালো হয়ে এল আকাশ। বিশাল ছায়া পড়ল সৈকতে।

ছায়াটা অনুসরণ করে চলল রিকিকে। এত জোরে ছুটেও কিছুতেই ওটার সঙ্গে পেরে উঠছে না সে।

এখনও রোদের মধ্যেই রয়েছে রিকি, তবে দ্রুত দূরত্ব কমিয়ে আনছে ছায়াটা। যেন ওকে গ্রাস করার জন্যে ছুটে আসছে।

দৃষ্টি স্বচ্ছ হয়ে আসছে মুসার। বুঝতে পারল, ছায়াটা মেঘের নয়, হাজার হাজার কালো প্রাণী সূর্যকে ঢেকে দিয়ে এই অবস্থা করেছে।

কালচে বেগুনী পাখা দুলিয়ে উড়ছে ওগুলো। ওড়ার তালে তালে ওঠানামা করছে মাথাগুলো। তীক্ষ্ণ চিৎকারে কান ঝালাপালা করছে।

বাদুড়ের ঝাঁক তাড়া করেছে রিকিকে।

হাজার হাজার বাদুড় ডানা ঝাপটে, প্রায় গা ঘেঁষাঘেঁষি করে, কালো চাদর তৈরি করে সূর্যকে ঢেকে দিয়েছে। ছায়ায় ঢাকা পড়েছে সৈকত। ওদের তীক্ষ্ণ

চিৎকার ঢেউয়ের গর্জনকেও ঢেকে দিয়েছে।

গাল বেয়ে ঘাম গড়িয়ে পড়ছে রিকির। চোখ বুজে ফেলল সে। কিন্তু মুখটা খোলাই রইল আতঙ্কে।

'থেমো না, রিকি!' মুসা বলল। 'দৌড়াতে থাকো!'

কিন্তু কুলাতে পারল না রিকি। ধরে ফেলল ওকে বাদুড়েরা। হুমড়ি খেয়ে বালিতে পড়ে গেল সে। রাতের অন্ধকারের মত ছেঁকে ধরল ওকে বাদুড়গুলো।

তারপর সব কালো।

ঝটকা দিয়ে বিছানায় উঠে বসল মুসা। নিজের ঘরে রয়েছে দেখে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল। জানালা দিয়ে ভোরের ধূসর আলো ঢুকছে।

বিছানা থেকে যখন নেমে দাঁড়াল সে তখনও ঘুম পুরোপুরি কাটেনি। চোখে লেগে রয়েছে দুঃস্বপ্নের রেশ।

অনিশ্চিত ভঙ্গিতে জানালার দিকে এগোল সে। কানে বাজছে যেন বাদুড়ের তীক্ষ্ণ চিৎকার। চোখের সামনে দেখছে বাদুড়ের মেঘ! বাদুড়ের ঝাঁক! সৈকতের বালিতে হুমড়ি খেয়ে পড়া রিকিকে কালো চাদরের মত ঢেকে দিয়েছে!

জানালার চৌকাঠে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে যেন ভয়ঙ্কর সেই দুঃস্বপ্নের অত্যাচার থেকে রেহাই পাওয়ার চেষ্টা চালাল সে।

কিন্তু বাদুড় দেখল কেন?

স্বপ্ন বিশ্বাস করে না সে। ঘুমের মধ্যে তাহলে কি তার মগজ কোন জরুরী মেসেজ দিতে চেয়েছে? এত প্রাণী থাকতে নইলে বাদুড় কেন?

তবে কি ভ্যা···একটু দ্বিধা করে জোরে জোরে উচ্চারণই করে ফেলল সে: ভ্যাম্পায়ার!

না, ভূতের কথা ভাবছে না সে। ভ্যাম্পায়ার ব্যাটের কথা ভাবছে। ছোট্ট দ্বীপটা থেকে রাতের বেলা ঝাঁকে ঝাঁকে বাদুড় উড়ে আসতে দেখেছে। বেশির ভাগই নিরীহ ফলখেকো বাদুড়। তবে বড় বাদুড়ের সঙ্গে ছোট আকারের ভ্যাম্পায়ার ব্যাট বাস করাও অসম্ভব নয় ওই নির্জন দ্বীপে।

রক্তচোষা ওই ভয়ঙ্কর বাদুড়গুলোই কি হত্যা করেছে রিকিকে? অসম্ভব নয়। রাতের বেলা সৈকতের নির্জন জায়গায় চলে যেত রিকি। নিজের অজান্তেই ভ্যাম্পায়ারের শিকার হত। চুপচাপ এসে তার শরীর থেকে রক্ত খেয়ে চলে যেত ওগুলো। সেজন্যে দুর্বল বোধ করত, সকালে ঘুম থেকে উঠতে ইচ্ছে করত না। আমাজানের জঙ্গলে জন্তু-জানোয়ার ধরতে গিয়ে ওই বাদুড় সম্পর্কে বিরাট অভিজ্ঞতা হয়েছে মুসার। জানে, কি রকম নিঃশব্দে এসে গায়ে বসে ভ্যাম্পায়ার ব্যাট। রক্ত খেয়ে চলে যায়। জানা না থাকলে, আর সজাগ এবং ওগুলোর ব্যাপারে পুরোপুরি সতর্ক না থাকলে কিছু টেরই পাওয়া যায় না।

যতই ভাবল, রিকির রহস্যময় মৃত্যুর আর কোন কারণই খুঁজে পেল না মুসা। সব খুনেরই মোটিভ বা উদ্দেশ্য থাকে। এ খুনের কোন মোটিভ পায়নি

পুলিশ। তারমানে ভ্যাম্পায়ার। রক্ত খেয়ে খেয়ে শেষ করে দিয়েছে রিকিকে। এটাই মোটিভ। এবং জোরাল মোটিভ।

স্বপ্ন একটা বিরাট উপকার করেছে তার। সূত্রটা ধরিয়ে দিয়েছে।

পুরোপুরি সজাগ হয়ে গেছে মুসা। ঘুমের লেশমাত্র নেই আর চোখে। কুঁচকানো টেনিস শর্টসটা তাড়াতাড়ি পরে নিল। মাথায় গলিয়ে গায়ে টেনে দিল আগের দিনের ব্যবহার করা টি-শার্ট। রওনা দিল দরজার দিকে। দাঁত ব্রাশ করার কিংবা মুখ ধোয়ারও প্রয়োজন মনে করল না।

রান্নাঘর দিয়ে ছুটে বেরোনোর সময় নাস্তার টেবিল থেকে ডাক দিলেন তার বাবা, 'এই...'

কিন্তু ততক্ষণে স্ক্রীনডোরের বাইরে চলে এসেছে সে। 'পরে কথা বলব,' বলে ছেড়ে দিল পাল্লাটা। লাফ দিয়ে সিঁড়ি থেকে নেমে দৌড়াতে শুরু করল জিনাদের বাড়ির দিকে।

ধূসর রঙ আকাশের। বাতাস ভেজা ভেজা, কনকনে ঠাণ্ডা। বালি ভেজা। তারমানে আগের রাতে বৃষ্টি হয়েছিল।

বৃষ্টির শব্দ শুনতে পায়নি সে। বাইরের কোন শব্দই তার কানে ঢুকতে দেয়নি ভয়াবহ ওই দুঃস্বপ্ন। প্রথমে সাগরের ঢেউয়ের গর্জন। তারপর বাদুড়ের বাঁশির মত তীক্ষ্ণ চিৎকার।

ভ্যাম্পায়ার ব্যাট!

জিনাকে গিয়ে বলতে হবে। বলবে, সত্যটা জেনে গেছে সে।

ঝলমলে রোদ ছিল, আকাশটা নীলও ছিল; তারপরেও রিকির মৃত্যুর পর গত চারটা দিন কেমন যেন ধূসর, বিষণ্ণ কুয়াশায় ঢেকে দিয়েছিল সব কিছু। মনটা ভীষণ খারাপ ছিল বলেই মুসার কাছে দিনগুলো এ রকম লেগেছে।

ঘটনার ছবিগুলো অস্পষ্ট হয়ে আসছে তার মনে, কেবল চিৎকার আর শব্দগুলো গেঁথে রয়েছে স্পষ্ট—রিকির বাবা-মায়ের বুকভাঙা কান্না, পুলিশের ভারী ও চাপা কণ্ঠ, সৈকতে বেড়াতে আসা ছেলেমেয়েদের চমকে চমকে ওঠা, ভীত কথাবার্তা।

গত চারদিনে জিনার সঙ্গে মাত্র একবার দেখা হয়েছে তার। জিনা অস্বাভাবিক আচরণ করেছে তার সঙ্গে। রিকির মৃত্যু রহস্য নিয়ে আলোচনাটা মোটেও জমেনি।

গত কয়েকদিনে বার বার কিশোর আর রবিনের অভাব অনুভব করেছে মুসা, বিশেষ করে কিশোরের। এখন ওর এখানে থাকার বড় দরকার ছিল। টেলিফোনে যোগাযোগের চেষ্টা করেছে। রবিনকে পাওয়া গেছে। ব্যান্ডেজ খোলা হয়েছে। তবে ঠিকমত হাঁটাচলা করতে সময় লাগবে। আরও কিছুদিন বিশ্রাম নিতে বলেছেন ডাক্তার। ইয়ার্ডে পাওয়া যায়নি কিশোরকে। দুই ব্যাভারিয়ান ভাইয়ের একজন বোরিস জানিয়েছে, রাশেদ পাশার সঙ্গে বাইরে গেছে সে, পুরানো মাল আনতে, কখন ফিরবে কোন ঠিক নেই। হতাশ হয়ে লাইন কেটে দিয়েছে মুসা।

জিনার সঙ্গে আলোচনা জমাতে না পেরে সরে চলে এসেছিল মুসা। ভেবে

অবাক হচ্ছিল, কি হয়েছিল রিকির? এত রাতে সাগরে নেমেছিল কেন? মারা গেল কেন? ওই অবেলায় শুধু শুধু সাঁতার কাটতে নেমেছিল রিকি, এটা বিশ্বাস করতে পারছিল না মুসা।

টাউন করোনার এটাকে 'দুর্ঘটনায় মৃত্যু' রায় দিয়েই খালাস। কিন্তু মুসা এত সহজভাবে মেনে নিতে পারছিল না ব্যাপারটা। বুঝতেও পারছিল না কিভাবে মারা গেছে রিকি।

তবে এখন জানে। স্বপ্ন তার প্রশ্নের জবাব দিয়ে দিয়েছে।

সেই জবাবটা জিনাকেও জানাতে চলেছে সে।

গ্রীষ্মাবাসগুলোর পেছন দিয়ে এগোচ্ছে। সাদা সাদা কটেজগুলোর আঙিনায় চওড়া সানডেক। ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে চেয়ার। একটা করে বড় ছাতা আর তার নিচে টেবিল রয়েছে প্রতিটি আঙিনায়। রান্নাঘরের জানালা দিয়ে জিনাকে চোখে পড়ল।

লাফ দিয়ে ডেকে উঠল মুসা। জিনার নাম ধরে ডাকতে ডাকতে চলে এল পেছনের দরজার কাছে।

অবাক হয়ে মুখ তুলে তাকাল টেবিলে বসা জিনা। কেরিআন্টি এঁটো থালা-বাসন পরিষ্কার করছেন।

দৌড়ে আসার পরিশ্রমে হাঁপাচ্ছে মুসা।

'নাস্তা করেছ?' জানতে চাইলেন কেরিআন্টি। টেবিলে রাখা প্যানকেকের থালাটা দেখালেন তিনি।

কিন্তু তাঁকে অবাক করে দিয়ে খাবারের দিকে এগোল না মুসা। জিনাকে দেখছে। জানালার কাচের ভেতর দিয়ে আসা ধূসর আলোয় ফ্যাকাসে লাগছে ওর মুখ। 'জিনা, তোমার সঙ্গে কথা আছে।'

নীরবে উঠে দাঁড়াল জিনা। এগিয়ে গেল দরজার দিকে।

ওর পিছু পিছু ডেকে বেরিয়ে এল মুসা। কথাটা জানানোর জন্যে অস্থির। সাগর থেকে বয়ে আসছে ঠাণ্ডা বাতাস। আকাশের ভারী মেঘ অনেক নিচে নেমে এসেছে।

ডেকের রেলিঙে হেলান দিয়ে গাছপালার দিকে তাকিয়ে রইল জিনা। ওর পাশে এসে দাঁড়াল মুসা। শার্টের নিচের অংশটা ওপরে টেনে তুলে সেটা দিয়ে কপালের ঘাম মুছল।

গন্ধ হয়ে গেছে শার্টটায়। নাক কুঁচকাল। তাড়াহুড়ায় আলমারি থেকে ধোয়া শার্ট বের করে পরার কথা মনে ছিল না, আগের দিনেরটাই পরে চলে এসেছে। এ নিয়ে মাথা ঘামাল না।

'কেমন কাটছে তোমার?' মেঘলা আকাশের নিচে গাছপালার কালো মাথার দিকে তাকিয়ে কিছুটা লজ্জিত স্বরেই যেন জিজ্ঞেস করল জিনা।

'ভাল না।'

'আমারও না।'

'তোমাকে কয়েকটা জরুরী কথা বলতে এসেছি, জিনা,' ভূমিকা শুরু করল মুসা। অস্বস্তি বোধ করছে। ও যা বলবে, সেটা যদি বিশ্বাস না করে জিনা?

হাসাহাসি করে?

'আমার ঘুম পাচ্ছে। তাজা বাতাসেই বোধহয়।'

'জিনা, আমি কি বলছি, শুনছ? রিকি কিভাবে মারা গেছে, জেনে ফেলেছি।'

চোখের পাতা সরু করে ফেলল জিনা। রক্ত সরে গিয়ে আরও ফ্যাকাসে হয়ে গেল মুখটা। 'কিভাবে মারা গেছে, সেটা আমিও জানি, মুসা। পানিতে ডুবে।'

'জিনা, শোনো, প্লীজ,' অধৈর্য ভঙ্গিতে নিজের শার্টের ঝুল ধরে একটানে প্রায় হাঁটুর কাছে নামিয়ে দিল মুসা। 'প্লীজ, জিনা!'

জবাব দিল না জিনা। মুসার চোখের দিকে তাকিয়ে রইল।

'জবাবটা স্বপ্নের মধ্যে পেয়েছি আমি,' গলা কাঁপছে মুসার। 'কিন্তু আমি জানি, এটাই সত্যি।'

এবারও কোন কথা বলল না জিনা। তাকিয়ে রয়েছে ওর দিকে।

'ভ্যাম্পায়ারে খুন করেছে রিকিকে।'

'তাই!' এক পা পিছিয়ে গেল জিনা। এমন করে দু'হাত তুলে ধরল, যেন মুসার কথার অস্ত্র থেকে আত্মরক্ষা করতে চায়।

'ভ্যাম্পায়ার!' জোর দিয়ে বলল মুসা। 'সৈকতের ওপর দিয়ে হাজার হাজার বাদুড় উড়ে যেতে দেখি রোজ। বেশির ভাগই ফলখেকো বাদুড়। আমার বিশ্বাস, ফলখেকোগুলো যেখান থেকে আসে, সেখানে ভ্যাম্পায়ার ব্যাটও আছে। রিকিকে...'

'মুসা, থামো। এ সব রসিকতা এখন ভাল্লাগছে না আমার,' ঝাঁঝাল কণ্ঠে বলল জিনা। দুই হাত আড়াআড়ি করে রাখল বুকের ওপর।

জিনাকে বোঝাতে গিয়ে ওর গলার দিকে চোখ পড়তে থমকে গেল মুসা। 'খাইছে' বলে অস্ফুট একটা শব্দ বেরিয়ে এল মুখ থেকে। হাঁ করে তাকিয়ে রইল।

নানা রকম ভাবনা খেলে যেতে শুরু করল মাথায়। অদ্ভুত সব ভাবনা। সেগুলো বলতে গেলে পাগল বলবে লোকে।

উল্টোপাল্টা দেখছি নাকি আমি?—ভাবল সে। ওগুলো মশার কামড়?

জনের কথা মনে পড়ল তার। জন! এমন কি হতে পারে ভ্যাম্পায়ার ব্যাট নয়, আসল ভ্যাম্পায়ারের কবলেই পড়েছে জিনা? জন কি ড্রাকুলার মত মানুষরূপী সত্যিকারের রক্তচোষা ভূত?

মাথাটা গরম হয়ে যাচ্ছে! আমি বোধহয় পাগল হয়ে যাচ্ছি! ভাবতে লাগল মুসা।

'স্বপ্নে কি দেখেছি আমি, শোনো,' আবার যেন দুঃস্বপ্নের ঘোরেই কথা বলতে লাগল মুসা। মগজে ঘুরপাক খাচ্ছে চিন্তাগুলো। 'বাদুড়ের তাড়া খেয়ে দৌড়ে পালাচ্ছিল রিকি, আর বাদুড়গুলো...'

'থামো, মুসা!' ফেটে পড়ল জিনা। 'বললাম তো, ভাল্লাগছে না আমার!'

'কিন্তু আমি যা বলছি, ঠিকই বলছি!' জিনার রাগের পরোয়া করল না

মুসা। 'বোঝার চেষ্টা করো, জিনা। ওই বাদুড়গুলোই যত নষ্টের মূল। রিকি…ওর গলায় এত বেশি কাটাকুটি ছিল, তার মধ্যেও…'

'আহ্, থামো না!' রাগে শক্ত হয়ে গেছে জিনার শরীর। 'দয়া করে তোমার বকবকানি থামাও।'

'কিন্তু, জিনা…'

'থামো!' গর্জে উঠল জিনা।

থমকে গেল মুসা। ভুলটা কি বলল সে? ওর কথা কেন শুনতে চাইছে না জিনা? বিশ্বাস করুক বা না করুক, কথা তো শুনবে!

'মুসা, তোমার বয়েস বেড়েছে। আগের ছোট্ট খোকাটি আর নেই তুমি যে সব সময় ভূতের ভয়ে কাবু হয়ে থাকবে। এখন আর ওসব মানায় না,' তামাটে চোখে রাগে যেন আগুন জ্বলছে জিনার। মুসার কাছে ওর এই আচরণ রীতিমত অস্বাভাবিক লাগল। 'বড় হও,' জিনা বলছে। 'তোমার এত ঘনিষ্ঠ একজন বন্ধু মারা গেল, আর তুমি বসে বসে হরর ছবির গল্প তৈরি করছ!'

'না, তা করছি না…' চিৎকার করে উঠল মুসাও।

কিন্তু তাকে কথা শেষ করতে দিল না জিনা। 'দেখো, জীবনটা কাহিনী নয়, বাস্তব।'

আশ্চর্য! কবে এত বড় হয়ে গেল জিনা? রকি বীচ থেকে আসার সময়ও তো এরকম ছিল না। স্যান্ডি হোলোতে এসে মাত্র ক'দিনে…

'জীবনটা যে কাহিনী নয়, আমি জানি,' তর্ক করতে গেল মুসা, 'কিন্তু…'

'রিকি আমাদের বন্ধু ছিল,' চোখের কোণে পানি এসে গেছে জিনার। 'ওর মৃত্যুতে তোমার যেমন কষ্ট হচ্ছে, আমারও হচ্ছে। মেনে নেয়া কঠিন। কিন্তু এটাই বাস্তব।' চোখের পানি গোপন করার চেষ্টা করল না জিনা। অতিরিক্ত আবেগপ্রবণ হয়ে পড়েছে। 'কিভাবে মারা গেছে ও, ঠিক করে বলতে পারছে না কেউ। পানিতে ডুবে মরেছে, এ কথাটা মানতে না চাইলে না মানো, তাই বলে ভ্যাম্পায়ারের গল্প! ওই ছেলেমানুষী গল্প দয়া করে আমাকে শোনানোর চেষ্টা কোরো না আর।'

'লেকচার তো একখান ভালই দিয়ে দিলে। কিন্তু, জিনা…' থেমে গেল মুসা। আর কি বলবে? তাকিয়ে আছে জিনার গলার দাগ দুটোর দিকে।

'জন একটা ভ্যাম্পায়ার!' বিড়বিড় করে বলে ফেলল নিজেকেই। জিনাকে শোনানোর জন্যে বলেনি।

কিন্তু শুনে ফেলল জিনা। হাত দিয়ে চোখের পানি মুছে জ্বলন্ত চোখে তাকাল। 'কি বললে? পাগল হয়ে গেছ তুমি। যাও এখান থেকে। আমার সামনে থেকে সরো। তোমাকে সহ্য করতে পারছি না।'

ঝটকা দিয়ে ঘুরে দাঁড়াল জিনা। গটমট করে রওনা হলো ঘরে ঢোকার জন্যে।

মুসাও ঢুকতে গেল। দরজার কাছ থেকে তাকে ঠেলা দিয়ে সরিয়ে দিল জিনা। 'না, আসার দরকার নেই। যাও! আর কোনদিন আসবে না এখানে। তোমার মুখও দেখতে চাই না।'

ভেতরে ঢুকে গেল জিনা। কেরিআন্টি বোধহয় নেই এখন ওঘরে, কিংবা ওদের কথা শুনতে পাননি, তাই কোন রকম প্রশ্নের মুখোমুখি হতে হলো না। ফোঁস করে একটা নিঃশ্বাস ফেলে ঘুরে দাঁড়াল মুসা। নেমে এল ডেক থেকে। ক্লান্ত, চিন্তিত ভঙ্গিতে ফিরে চলল। সামনে দিয়ে দৌড়ে পার হয়ে গেল দুটো খরগোশ। দেখলই না যেন সে।

বৃষ্টি শুরু হলো। প্রথমে বড় বড় ফোঁটায়। কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই অঝোরে ঝরতে শুরু করল।

মাথা নিচু করে ধীরে ধীরে হাঁটছে মুসা। বৃষ্টিতে কোন প্রতিক্রিয়া হলো না। দুশ্চিন্তায় বৃষ্টির চেয়ে অনেক ভারী হয়ে আছে যেন মগজ।

পানি আর কাদায় জুতো পড়ে ছপছপ শব্দ তুলছে। ওর তারের মত চুলগুলোকে নরম করতে পারছে না পানি, লেপ্টে দিতে পারছে না। তবে শার্টটা ভিজে চুপচুপে হয়ে লেগে গেছে গায়ের সঙ্গে।

ভাবতে ভাবতে চলেছে সে। জিনা ঠিকই বলেছে, ছেলেমানুষী, উদ্ভট চিন্তা। ভ্যাম্পায়ারের কথা কি করে ভাবতে পারল? কিশোর হলে এরকম ভূতুড়ে ভাবনা কক্ষনো ভাবত না। ভ্যাম্পায়ারের কথা না ভেবে বাস্তব কিছু আবিষ্কার করত।

কিন্তু ভ্যাম্পায়ার ভূত অবাস্তব হলেও ভ্যাম্পায়ার বাদুড় তো বাস্তব। ওরা রক্ত খেয়ে রিকিকে···

তাহলে জিনার গলায় দাগ কেন? ভ্যাম্পায়ার ব্যাট রক্ত খেলে ওরকম দাগ রেখে যায় না।

মাথাটা আবার গরম হয়ে যাচ্ছে। একপাশের গাছগুলোর দিকে মুঠো তুলে ঝাঁকাল সে, যেন শাসাল ওগুলোকে। বৃষ্টি আর বাতাসে নুয়ে নুয়ে যাচ্ছে গাছের মাথা।

ঘাড় বেয়ে বৃষ্টির পানি অঝোরে ঝরে পুরো ভিজিয়ে দিয়েছে পিঠ। শীত লাগল ওর। গায়ে কাঁটা দিল।

আবার ভাবতে লাগল ভ্যাম্পায়ারের ভাবনা। জিনার গলার দাগ দুটো নিয়ে ভাবল। কাকে সন্দেহ করবে? জনকে? না ভ্যাম্পায়ার ব্যাটকে?

দশ

নীলচে আলোর বিকেলে গভীর ঘুম থেকে ধীরে ধীরে জেগে উঠল জন। কফিনের ভেতরে হাত নাড়ানোর জায়গা নেই, তার মধ্যেই আড়মোড়া ভাঙল কোনমতে। ডালার বড় বড় ফুটোগুলো দিয়ে আলো আসছে। তবে এত কম, বোঝা যায় বাইরে দিনের আলো শেষ।

বড় করে হাই তুলে ডালায় ঠেলা দিল সে। ক্যাঁচকোঁচ আওয়াজ তুলে ওপরে উঠে গেল ডালাটা। উঠে বসে চারপাশে তাকাল। তারপর বেরিয়ে এল

কফিন থেকে।

হালকা স্যান্ডেলের শব্দে ফিরে তাকাল সে। ওপাশের ঘর থেকে দরজা দিয়ে এ ঘরে ঢুকল লীলা। 'কি খবর? ঘুম তাহলে ভাঙল।'

'তুমি এত আগে জেগেছ কেন?'

'খিদে। বড্ড খিদে। সহ্য করতে পারছি না। পেটে খিদে নিয়ে কি ঘুম আসে?'

'কি আর করা। সহ্য করতেই হবে। আগেই তো বলা হয়েছে আমাদের, এ রকমই ঘটবে...'

'তা হয়েছে। নাম লিখিয়েছি পিশাচের খাতায়। এখন যে বাঁচি না!'

'আর কোন উপায় নেই, চালিয়ে যেতেই হবে। একবার যখন ফাঁদে পা দিয়েছি, আর মুক্তি নেই। এখন বেরোতে গেলে কাউন্ট ড্রাকুলার বিশ্বাস হারাব। আর তার বিশ্বাস হারালে কি যে ঘটে, সে তো নিজের চোখেই দেখেছ। বেশি ভাবনাচিন্তা না করে তৈরি হয়ে নাও। বেরোতে হবে। শিকার তো একটাকে দিয়েছ শেষ করে। আজ কি করবে?'

'দেখি, নতুন কাউকে ধরার চেষ্টা করতে হবে।'

'কাকে? পরিচিত কাউকে?'

'ঠিক করিনি এখনও। ভেবে দেখতে হবে।'

✡

'সারাটা দিন কি করে কাটালে?' উঁচু ঘাসের মধ্যে দিয়ে বালিয়াড়ির দিকে হাঁটতে হাঁটতে জিজ্ঞেস করল টনি।

সারাদিন বৃষ্টি হয়েছে। ঘাসের ডগায় পানি লেগে আছে। হাঁটতে গেলে নাড়া লেগে পায়ে পড়ে পা ভেজে। মুসার মনে হলো, বোকামি হয়ে গেছে। শর্টস না পরে জিনস পরে আসা উচিত ছিল। বিড়বিড় করে বন্ধুর কথার জবাব দিল, 'কিছুই না।'

আসলেই কিছু করেনি সে। বেশির ভাগ সময় লিভিং রুমের জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে থেকেছে, পায়চারি করেছে, রিকির লাইটারটা বের করে হাতে নিয়ে দেখেছে, স্বপ্নের কথা ভেবেছে, জিনা ওর কথা না শুনে তাড়িয়ে দেয়ায় দুঃখ পেয়েছে।

লাইটারটা এখনও হাতেই আছে ওর। রাখতে ভাল লাগছে। বন্ধুর একমাত্র স্মৃতি।

'বালি শুকিয়ে যাচ্ছে দেখো, কত তাড়াতাড়ি,' স্যান্ডেলের ডগা দিয়ে খোঁচা দিল টনি. 'কি আশ্চর্য, তাই না? সারাটা দিন ধরে বৃষ্টি হলো, আর কত সহজেই না সেটা শুষে নিল বালি।'

সাগরের দিকে তাকাল মুসা। সন্ধ্যার শুরুতে মেঘগুলো ছাড়া ছাড়া হয়ে গেছে। রাতের আকাশ পরিষ্কার হয়ে গেছে। দিগন্তে ফ্যাকাসে চাঁদের চারপাশ ঘিরে পানির একটা নীলচে বৃত্ত তৈরি হয়েছে।

'কি ভাবছ এত?' মুসাকে জবাব দিতে না দেখে জিজ্ঞেস করল টনি।

টান দিয়ে একটা ঘাসের ডগা ছিঁড়ে নিয়ে দাঁতে কাটতে শুরু করল মুসা।

'কি, বলছ না যে? অ্যাই, মুসা?'
'কি বলব?'
'যা ভাবছ।'
'বললে বিশ্বাস করবে না। হয় হাসবে, নয়তো জিনার মত রেগে গিয়ে দর্শন শোনাতে শুরু করবে।'
'মানে?'
'স্বপ্ন দেখে একটা কথা মাথায় এসেছিল। জিনাকে বলতে গিয়েছিলাম। দূর দূর করে খেদিয়েছে আমাকে।'
'আমি ওরকম কিছু করব না। নিশ্চিন্তে বলে ফেলো।'
তা-ও দ্বিধা করতে লাগল মুসা। টনির চাপাচাপিতে শেষে বলতে বাধ্য হলো স্বপ্নের কথা, রিকি কিভাবে মারা গেছে, সেই সন্দেহের কথা। ভ্যাম্পায়ার ব্যাটের কথাই শুধু বলল সে। জনকে যে ভ্যাম্পায়ার ভাবছে এ কথা চেপে গেল।
নিজে হাসল না টনি, যেহেতু কথা দিয়েছে। তবে জিনার কথা বলল, 'হাসবেই তো। ছেলেমানুষের মত কথা বললে কে না হাসে।'
'তুমিও বললে ছেলেমানুষ! জানো, স্বপ্ন অনেক বড় বড় সমস্যার সমাধান করে দিয়েছে। অনেক আবিষ্কার, অনেক যুদ্ধ...'
'থামো, থামো,' হাত তুলল টনি, 'ওসব আমি জানি। ওগুলো ছিল সব বাস্তব...'
'এটা অবাস্তব, এই বলবে তো? কিন্তু টনি, ভুলে যেয়ো না, রিকির মৃত্যুটা বাস্তব।'
'কে ভুলে যাচ্ছে? রিকির মৃত্যুটা বাস্তব। আর বাস্তব কারণেই সেটা ঘটেছে, পানিতে ডুবে। তুমি কি ভেবেছ, জিনা আর আমি শুনলেই তোমার কথায় লাফিয়ে উঠব? ভ্যাম্পায়ারে রক্ত শুষে খেয়ে খেয়ে খতম করে দিয়েছে রিকিকে—দারুণ এই আবিষ্কারের জন্যে তোমাকে বাহবা দিতে থাকব, পিঠ চাপড়াব?'
টনির দিকে তাকিয়ে রইল মুসা। আহত স্বরে বলল, 'জিনাকে আমি বলতে গিয়ে বোকামি করে ফেলেছি, এটা ঠিক। সেই দুঃখ ভোলার জন্যে কারও ওপর নির্ভর করতে চেয়েছিলাম, সে তুমি। কিন্তু তুমিও যে এভাবে হাসাহাসি শুরু করবে...'
হাসি মুছে গেল টনির মুখ থেকে। তাড়াতাড়ি বলল, 'সরি। তোমাকে দুঃখ দেয়ার জন্যে বলিনি কিন্তু।'
মাথার ওপর ডানা ঝাপটানোর শব্দে মুখ তুলে তাকাল মুসা। দুটো বাদুড় উড়ে চলেছে বালিয়াড়ির দিকে।
'বিজ্ঞানের ক্লাসে স্যার বলেছেন, বাদুড় খুব ভাল প্রাণী,' ঘাসের ডগা চিবাচ্ছে টনি, কথা স্পষ্ট হলো না। 'পরিবেশগত ভারসাম্য রক্ষার জন্যে ওদের প্রয়োজন আছে। ক্ষতিকর পোকামাকড় খেয়ে ওরা আমাদের উপকার করে। বাদুড়ের মল দিয়েও ভাল সার হয়।'

'ওই সার তুমি গিয়ে জমিনে ফেলোগে!' তিক্তকণ্ঠে বলল মুসা। 'আর জাহান্নামে যাক তোমার বিজ্ঞানের ক্লাস।'

রাগ করল না টনি। 'তোমার মনের অবস্থা বুঝতে পারছি। রিকির কথাটাও মন থেকে সরাতে পারছি না। বেচারা! তা ছাড়া জিনার সঙ্গে ওই অপরিচিত লোকটার খাতির...'

'বাদ দাও ওসব কথা,' হাত নেড়ে বলল মুসা। নিজের কর্কশ স্বর শুনে নিজেই অবাক হয়ে গেল। 'ভাল্লাগছে না শুনতে!'

কোন কথা বলেই আর জমানো যাবে না বুঝতে পেরে টনি বলল, 'তারচেয়ে চলো প্রিন্সেসে চলে যাই। মন ভাল হবে। যাবে?'

মাথা নাড়ল মুসা, 'না। তুমি যাও। আমি বরং হাঁটাহাঁটি করে মগজটাকে সাফ করা যায় নাকি দেখি।'

হতাশ ভঙ্গিতে মাথা নাড়ল টনি। 'ঠিক আছে, মন ভাল করার চেষ্টা করতে থাকো তুমি। আমি গেলাম।'

জোরে জোরে হাঁটতে শুরু করল সে। কিছুদূর গিয়ে মুসার দিকে ফিরে হাত নাড়ল একবার।

বালিয়াড়ির দিকে হাঁটতে থাকল মুসা। চিন্তায় ভারী হয়ে আছে মন। সামনে কতগুলো ছেলেমেয়েকে জটলা করতে দেখে আর সেদিকে এগোল না। ঘুরে গেল পাহাড়টার দিকে। রাতের পরিষ্কার আকাশের পটভূমিতে বিশাল একটা স্তম্ভের মত লাগছে পাথরের কালো চূড়াটা।

জিনার কথা ভাবল। সকালে হয়তো ওর মেজাজ খারাপ ছিল। সেজন্যে কোন কথা শুনতে চায়নি। আবার কি যাবে ওকে বোঝাতে?

নাহ্, যাবে না। সঙ্গে সঙ্গে বাতিল করে দিল ভাবনাটা। গিয়ে কোন লাভ নেই। ওর কথা শুনবে না জিনা।

কিন্তু ওকে বোঝানোর চেষ্টা করতেই হবে। জন যে ভ্যাম্পায়ার এ বিশ্বাসটা মনে বদ্ধমূল হচ্ছে ক্রমেই। ওর খপ্পর থেকে জিনাকে সরিয়ে আনতে না পারলে সাংঘাতিক বিপদে পড়ে যাবে জিনা।

আনমনে ভাবতে ভাবতে পাহাড়টার দিকে এগিয়ে চলল সে। গভীর চিন্তায় ডুবে না থাকলে আরও আগে দেখতে পেত। চোখে পড়তেই থমকে দাঁড়াল। কাঁপুনি শুরু হয়ে গেল বুকের মধ্যে।

একটা উঁচু বালির ঢিবিতে পড়ে আছে কালোমত কি যেন। নিথর।

খাইছে! কি ওটা? আবার লাশ!

এগারো

আতঙ্কে স্তব্ধ হয়ে নিচু, ছায়ায় ঢাকা বালিয়াড়িটার দিকে তাকিয়ে আছে মুসা। ঘুরে দৌড় দিতে ইচ্ছে করছে। জিনিসটা কি দেখার কৌতূহলও দমন করতে

পারছে না।

ভয় আর কৌতূহলের লড়াই চলল দীর্ঘ একটা মুহূর্ত। কৌতূহলের জয় হলো। পায়ে পায়ে এগোতে শুরু করল সে। কাছে পৌঁছে দেখল মানুষই, তবে মূর্তি নয়। কালো আঁটসাঁট পোশাক পরা মেয়েটা বসে আছে বালিয়াড়ির ওপর, দুই পা জড় করে, হাঁটুতে থুতনি ঠেকিয়ে।

'লীলা!' ডাকল সে।

জবাব দিল না মেয়েটা।

'লীলা?' জোরে ডাক দিয়ে আরেক পা আগে বাড়ল মুসা। ভয় কাটেনি এখনও। পা কাঁপছে।

তবু সাড়া দিল না মেয়েটা।

বালিয়াড়ির একেবারে কাছে এসে আবার ডাক দিল মুসা, 'এই, লীলা!'

অবশেষে মুখ তুলল লীলা। আবছা অন্ধকারেও চকচক করছে তার গালের পানি। কাঁদছিল।

'সরি,' এক পা পিছিয়ে গেল মুসা। বিব্রতকর অবস্থা। কি করে সামাল দেবে বুঝতে পারছে না। আর কোন কথা খুঁজে না পেয়ে আবার বলল, 'সরি!'

ওর দিকে তাকিয়ে কয়েকবার চোখ মিটমিট করল লীলা। চিনতে অনেক সময় লাগল। দ্বিধান্বিত মনে হলো ওকে। যেন নিজের গভীর বেদনা, গভীর ভাবনায় হারিয়ে ছিল, বাইরের কারও সেখানে প্রবেশাধিকার নেই।

হাসল। জোর করে দুই হাত তুলে ডলে ডলে মুছল চোখের পানি। গালের পানি মুছল।

'ও, তুমি!...চিনতে পারিনি,' থেমে থেমে বলল নীলা। নিজের হাত দুটো তুলে রেখেছে মুসা। ওগুলোকে নিয়ে কি করবে, যেন দ্বিধায় পড়ে গেছে। অবশেষে দুই পাশে ঝুলিয়ে দিল। জিজ্ঞেস করল, 'তোমার কি হয়েছে?'

দীর্ঘশ্বাস ফেলল লীলা। 'জানি না। খালি কান্না পাচ্ছে।'

'রিকির জন্যে?' বলেই থমকে গেল। প্রশ্নটা বোকার মত হয়ে গেল না তো! 'মানে, আমি বলতে চাইছি...'

'রিকির জন্যেই,' লীলা বলল। 'সৈকতে, শহরে, যেখানেই যাই, মনে হয় এই বুঝি সামনে পড়ল রিকি। এই বুঝি ডেকে উঠল "হাই" করে। আমি বিশ্বাস করতে পারছি না ও নেই। ওর এ ধরনের কিছু ঘটবে দুঃস্বপ্নেও ভাবিনি। কাউকে এ ভাবে মরতে দেখিনি তো। লাশই দেখিনি কখনও।'

'বুঝতে পারছি,' লীলার দিক থেকে আস্তে করে পানির দিকে মুখ ফেরাল মুসা। 'আমিও বিশ্বাস করতে পারছি না। খুব খারাপ লাগছে আমারও। ও আমার বন্ধু ছিল।'

জবাব দিল না লীলা। বিষণ্ণ ভঙ্গিতে মাথা নাড়তে নাড়তে উঠে দাঁড়াল। কাপড়ে লেগে যাওয়া বালি ঝাড়ল। ধীর পায়ে নেমে এসে দাঁড়াল মুসার সামনে। এত কাছে, ওর নিঃশ্বাস পড়তে লাগল মুসার মুখে।

'বন্ধু হিসেবে ও যে কি ছিল তোমার কাছে, সে তো বুঝতেই পারছি। আমার সঙ্গে মাত্র কয়েক দিনের পরিচয়, তাতেই যে কষ্টটা লাগছে,' আবার

চোখ দিয়ে পানি বেরিয়ে এল লীলার। গাল বেয়ে গড়াতে লাগল। 'সহ্য করতে পারছি না।'

'হ্যাঁ, ও খুব ভাল মানুষ ছিল,' লীলার চোখ থেকে চোখ সরাতে পারছে না মুসা। সম্মোহন করে ফেলা হচ্ছে যেন তাকে।

চারপাশ থেকে ওদের ঘিরে বইছে সাগরের হাওয়া।

হাত তুলল লীলা। এলোমেলো চুল সরাল মুখের ওপর থেকে। একটু বেশিক্ষণই হাতটা উঠে রইল ওর আর মুসার মুখের মাঝখানে। একটা মিষ্টি গন্ধ ঢুকল মুসার নাকে। কিসের বুঝতে পারল না সে। পারফিউমের গন্ধই হবে হয়তো।

মাথাটা চক্কর দিয়ে উঠল মুসার। এমন লাগছে কেন? আগের রাতে ভাল ঘুম হয়নি। সারাদিনে অতিরিক্ত দুশ্চিন্তা করেছে। হয়তো সেজন্যেই খারাপ লাগছে।

'কাল রাতে কেন যে সাঁতার কাটতে নেমেছিল রিকি বুঝলাম না,' জোর করে লীলার চোখ থেকে চোখ সরাল মুসা।

'আমিও না।'

'ও কিন্তু খুব শান্তশিষ্ট ছিল,' মাথার ঘোর লাগা ভাবটা ঝাড়া দিয়ে সরানোর চেষ্টা করতে লাগল মুসা। 'রাত দুপুরে হঠাৎ এরকম একটা কাণ্ড করার মত স্বভাব ছিল না।'

'সেটা ওর সঙ্গে কয়েকদিনের পরিচয়েই বুঝেছিলাম,' মুসার মাথা ছাড়িয়ে বহুদূরে দৃষ্টি ছড়িয়ে দিল লীলা। নির্জন সৈকতটা দেখছে। 'অবাক লেগেছে সেজন্যেই। কাল রাতে আমাকে কটেজে পৌঁছে দিয়ে যখন বলল সে স্কিনডাইভ করতে যাচ্ছে, বিশ্বাস করতে পারিনি। আমি ভেবেছি বাড়ি ফিরে যাবে।'

'অবাক কাণ্ড!' মাথা ঘুরছে মুসার।

'সকালে যখন শুনলাম খবরটা...' কথা আটকে গেল লীলার। শব্দ করে কেঁদে উঠল।

সান্ত্বনা দেয়ার জন্যে ওর কাঁধে হাত রাখল মুসা। কেঁপে উঠল লীলা। কয়েকটা সেকেন্ড ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে মুখ তুলে তাকাল। জোর করে হাসি ফোটাল মুখে। 'সরি!...কি করব? কিছুতেই থামাতে পারছি না। ঘটনাটার পর তোমাকেই প্রথম পেলাম, যার সঙ্গে মন খুলে কথা বলতে পারছি।'

মুসার হাতটা ধরল সে। আরও এগিয়ে এল।

অস্বস্তি বোধ করছে মুসা।

ওর গলার দিকে তাকাচ্ছে লীলা। চোখে চোখ রাখল আবার।

মুসার অস্বস্তি বাড়ছে। সরে যাওয়ার কথা ভাবছে।

সেটা বুঝতে পারল বোধহয় লীলা। দীর্ঘ একটা মুহূর্ত ওর চোখে চোখে চেয়ে রইল। দ্বিধা করছে। কোন একটা ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিতে পারছে না যেন। আচমকা হাতটা ছেড়ে দিয়ে সরে গেল। কোন কথা না বলে ঘুরে লম্বা লম্বা পায়ে দৌড়াতে শুরু করল পাহাড়ের দিকে।

কি ভেবে মুসাও পিছু নিল তার।

বারো

সেরাতেও রিকিকে স্বপ্ন দেখল মুসা। তাকে সাবধান করে দিতে এসেছিল রিকি। কি করে মারা গেছে, ইনিয়ে-বিনিয়ে জানাল। রক্ত শুষে খেয়ে তাকে শেষ করে দিয়ে সাগরে ফেলে দিয়েছে। গলার ফুটো দুটো দেখাল। ভ্যাম্পায়ারের কাছ থেকে সাবধান থাকতে বলল।

রিকি মিলিয়ে যেতেই একদল ভ্যাম্পায়ারকে আসতে দেখল মুসা। তাড়া করল ওকে। দৌড়ে পালাতে গিয়ে আর কোন উপায় না দেখে শেষে সাগরে ঝাঁপ দিল সে। টান দিয়ে মাঝসাগরে ভাসিয়ে নিল ওকে স্রোত। প্রচণ্ড ঢেউ ঝাঁকাতে শুরু করল। বহুদূর থেকে ডাক শোনা যেতে লাগল, 'এই মুসা, মুসা!'

ঘুম ভেঙে গেল মুসার। দেখে ঢেউয়ে নয়, কাঁধ ধরে ঝাঁকি দিচ্ছেন তার বাবা। 'কি ব্যাপার? ওঠো। আজ এত দেরি কেন?'

'অনেক রাতে শুয়েছি,' চোখ ডলতে ডলতে জবাব দিল মুসা। জানালার দিকে তাকিয়ে দেখল পর্দা সরিয়ে দিয়েছেন বাবা। সোনালি রোদ এসে পড়েছে মেঝেতে।

'দশটা তো বাজে,' টেবিল-ঘড়িটার দিকে হাত তুললেন মিস্টার আমান। 'ওঠো! আমরা সব কাপড়-চোপড় পরে রেডি। জলদি উঠে কাপড় পরে নাও। পিয়ারে যাওয়ার সময় নাস্তা খেয়ে নিয়ো।'

'খাইছে!' ক্লান্ত ভঙ্গিতে উঠে বিছানার বাইরে মেঝেতে পা রাখল মুসা। চোখের পাতা আধবোজা করে বাবার দিকে তাকাল, এখনও পুরো খুলতে পারছে না। 'কোথায় যেন যাওয়ার কথা আমাদের?'

'ভুলে গেছ? সমুদ্রে ছিপ দিয়ে মাছ ধরতে যাওয়ার কথা না? ডক্টর বেনসনের বোটে করে?' ছেলের কাঁধ ধরে আবার ঝাঁকি দিলেন আমান। 'বসে আছ কেন? জলদি করো।'

কাঁধ ছেড়ে দিয়ে দরজার দিকে রওনা হলেন তিনি।

'আমি পারব না, বাবা,' বলেই ধপ করে আবার বালিশের ওপর পড়ল মুসা।

দরজার কাছে গিয়ে ঘুরে দাঁড়ালেন আমান। উদ্বেগ ফুটেছে চেহারায়। 'কি ব্যাপার? শরীর খারাপ?'

'হ্যাঁ,' বলেই তাড়াতাড়ি শুধরে নিল মুসা, 'না।...জানি না। বুঝতে পারছি না।'

'হয়েছে কি তোমার?' দু'পা এগিয়ে এলেন আমান। 'জ্বর-টর নাকি?'

'ভীষণ ক্লান্ত লাগছে,' বালিশ থেকে মাথা তুলল না মুসা। 'অসুস্থ হইনি

'এখনও। তবে মনে হয় হব। জীবাণু ঢুকে গেছে।'

'মুখটাও তো কেমন সাদা সাদা লাগছে। বোটে করে খোলা সাগরে ঘুরে এলে ঠিক হয়ে যাবে। চলো। ওঠো।'

'না বাবা, আমি পারব না। তোমরা যাও। আমি শুয়ে থাকি। ঘুমিয়ে নিলেই ঠিক হয়ে যাবে।'

চিন্তিত ভঙ্গিতে দীর্ঘ একটা মুহূর্ত ছেলের দিকে তাকিয়ে রইলেন আমান। ঘড়ির দিকে তাকালেন। 'দেরি হয়ে যাচ্ছে। সত্যি যাবে না?'

'না। ডক্টর বেনসনকে বোলো, আমার জন্যেই দেরি হয়ে গেছে তোমাদের। তিনি কিছু মনে করবেন না।'

আনমনে মাথা ঝাঁকালেন আমান। আরেকবার দ্বিধা করে বেরিয়ে যাওয়ার জন্যে আবার এগোলেন দরজার দিকে। দরজার কাছে গিয়ে আবার ঘুরলেন। 'এখনও ভেবে দেখো। পরে কিন্তু পস্তাবে। ছিপ দিয়ে বড় মাছ ধরার সুযোগ সব সময় আসে না।'

'পস্তালেও কিছু করার নেই, বাবা। আমি জোর পাচ্ছি না।'

মাথা ঝাঁকিয়ে কিছুটা হতাশ ভঙ্গিতেই যেন বেরিয়ে গেলেন আমান। কয়েক মিনিট পর সদর দরজা লাগানোর শব্দ কানে এল মুসার। আরও কয়েক মিনিট পর গাড়ির এঞ্জিন স্টার্ট নেয়ার শব্দ।

কিছুক্ষণ একভাবে পড়ে থাকার পর আস্তে মাথাটা সোজা করল মুসা। ভীষণ ভারী লাগছে। গতরাতের কথা মনে পড়ল। লীলার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে থাকার সময় একটা বিচিত্র গন্ধ ঢুকেছিল নাকে। বোঁ করে উঠেছিল মাথাটা। তারপর থেকে আর সুস্থ বোধ করেনি।

আরও মনে পড়ল, লীলা পাহাড়ের দিকে চলে গেলে সে-ও পেছন পেছন গিয়েছিল। ও কোথায় যায় দেখার জন্যে। কিন্তু কিছুদূর যাওয়ার পর এমনই মাথা ঘোরা শুরু হলো, হাঁটা তো দূরের কথা, দাঁড়িয়েই থাকতে পারছিল না আর। বসে পড়েছিল। তারপর আর মনে নেই। এক সময় দেখে, বালির ওপর চিত হয়ে পড়ে আছে। ওপরে খোলা আকাশ। আশেপাশে একদম নির্জন। লীলাও ছিল না। উঠে টলতে টলতে কোনমতে বাড়ি ফিরে এসেছে।

বিছানা থেকে নেমে বাথরুমে চলল। পা টলছে। পেটে মোচড় দিচ্ছে। আগের রাতের মত বেহুঁশ হয়ে যাবার ভয়ে আতঙ্কিত হয়ে পড়ল।

বাথরুমে ঢুকে সিঙ্কের ওপর মুখ নামাল। হড়হড় করে বেরিয়ে আসতে লাগল পেটে যা ছিল।

ওয়াক ওয়াক আর হেঁচকি দিতে দিতে পেট ব্যথা হয়ে গেল, গলা চিরে গেল। পেটে আর কিছুই অবশিষ্ট রইল না। মনে হচ্ছে নাড়ীভুঁড়ি সব গিট বেঁধে গেছে। বনবন করে মাথা ঘুরছে। কপালে ঠাণ্ডা ঘাম। বাথরুমের ঠাণ্ডা মেঝেতে বসে পড়ল সে।

কয়েক মিনিট পর গিট বাঁধা অবস্থাটা সামান্য কমল। চোখের সামনে বাথরুমের দেয়াল ঘোরাও বন্ধ হয়েছে।

সচকিত হলো সে। নষ্ট করার মত আর সময় নেই!

জিনাকে সাবধান করতে হবে। বোঝাতেই হবে ওকে কি মস্ত বিপদে পড়েছে সে। জনের কথা বলতে হবে।

হঠাৎ কি মনে হতে তাড়াতাড়ি উঠে বেসিনের আয়নার সামনে এসে দাঁড়াল। নিজের গলায় দেখল দাগ আছে কিনা।

নেই!

আহ্, বাঁচল! কিন্তু তাহলে মাথা ঘুরল কেন? বেহুঁশ হলো কেন? মিষ্টি গন্ধটার কথা মনে পড়ল। এরকম গন্ধ ছড়িয়েই কি মানুষকে মাতাল করে ভ্যাম্পায়ার ভূত? অবশ করে দেয় শরীর? যাতে নিরাপদে রক্ত পান করতে পারে?

তারমানে সে বেঁচে গেছে কোনভাবে। হয়তো চলে যাওয়ার পর কোন কারণে আর ফিরে আসেনি লীলা। রক্ত খায়নি। তাহলে গলায় দাঁতের দাগ থাকতই।

দাঁত ব্রাশ করল সে। চোখেমুখে ঠাণ্ডা পানির ছিটে দিল। একটা বেদিং স্যুট পরে নিল তাড়াতাড়ি। হাত-পা কাঁপছে এখনও। তবে ভ্যাম্পায়ারে রক্ত খেয়ে কাহিল করে রেখে যাওয়ার ভয়টা কেটেছে।

রান্নাঘরে নেমে এল সে। রিসিভার কানে ঠেকিয়ে জিনাদের নম্বরে ফোন করল। অধৈর্য হয়ে অপেক্ষা করতে লাগল। রিঙ হচ্ছে। একবার। দুবার।

রিঙ হয়েই চলেছে।

ধরল না। তারমানে কেউ বাড়ি নেই।

'জিনা, প্লীজ!' চিৎকার করে অনুরোধ করল সে। 'ধরো! কথা আছে তোমার সঙ্গে!'

কাউন্টারে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে মুসা। কানে রিসিভার ঠেকানো। ওপাশে বেজেই চলেছে ফোন।

'জিনা, প্লীজ!'

কিন্তু কেউ ধরল না তার অনুরোধে সাড়া দিয়ে।

তেরো

দ্রুত নাস্তা সেরে নিয়ে আবার জিনাদের বাড়িতে ফোন করল মুসা। জবাব পেল না।

অনেকটা শক্তি ফিরে পেয়েছে শরীরে। জিনাকে শহরে খুঁজতে চলল সে।

খুব গরম একটা দিন। নব্বইয়ের ঘরে তাপমাত্রা। এই অঞ্চলের জন্যে গরমটা বেশি। শহরে আসতে আসতেই ক্লান্ত হয়ে গেল মুসা। মেইন স্ট্রীটের আশপাশে সব জায়গায় খুঁজে কোথাও না পেয়ে সৈকতে রওনা হলো।

ওখানেও পাওয়া গেল না তাকে।

বাড়িতে ফিরে এসে সারাটা দিন কাটিয়ে দিল কাউচে শুয়ে। কয়েক মিনিট

পর পরই উঠে জিনাদের বাড়িতে ফোন করল। রিঙের পর রিঙ হতে থাকল, কিন্তু কারও কোন সাড়া পাওয়া গেল না। কেউ ধরল না ফোন।

বিকেলে আবার শহরে গেল সে। জিনাকে খোঁজার জন্যে।

'আই, মুসা,' সী-ব্রিজ রোড ধরে যাওয়ার সময় কানে এল একটা পরিচিত কণ্ঠ।

ফিরে তাকাল সে।

প্রায় দৌড়ে এল টনি। 'তারপর, কি খবর?'

'ভাল,' গতি না কমিয়েই জবাব দিল মুসা।

গাছের আড়ালে নেমে যাচ্ছে সূর্য। কিন্তু গরম এখনও বেশ। বাতাসের আর্দ্রতাও বেশি। চামড়া চুলকাচ্ছে মুসার। শরীরটা লাগছে বিশ মন ওজন।

'সৈকতে খুঁজে এলাম তোমাকে,' মুসার সঙ্গে তাল রাখতে হিমশিম খাচ্ছে টনি। 'যা গরম পড়েছে, ভাবলাম ওখানেই থাকবে। এখানে আশা করিনি।'

'তুমিও এখানে থাকবে ভাবিনি,' শুকনো গলায় মুসা বলল। 'আর্কেডের এয়ারকন্ডিশনের ঠাণ্ডা ফেলে সৈকতে গেলে কি বুঝে?'

'যেতাম না,' হাসতে হাসতে বলল টনি। 'কি যেন খারাপ হয়ে গেছে ওদের। মেরামত করছে।'

'টনি, আমার শরীরটা ভাল নেই,' আগের রাতের পুরো ঘটনাটা বলল না মুসা। বেশি কথা বলতে ইচ্ছে করছে না। সময় নষ্ট না করে জিনাকে খুঁজে বের করতে হবে। কি ঘোর বিপদে রয়েছে সে, বোঝানো দরকার। টনির সঙ্গে দেখা না হওয়াটাই এখন ভাল ছিল।

'হ্যাঁ, তোমাকে দেখে অসুস্থই লাগছে।'

'কি রকম?'

'মুখ শুকনো। বিধ্বস্ত।' আড়চোখে মুসার দিকে তাকিয়ে আড়ষ্ট হাসি হাসল, 'ভ্যাম্পায়ার নাকি?'

দাঁড়িয়ে গেল মুসা, 'কি বলতে চাও?'

'মানে, কাল যে বললে...আবার ভ্যাম্পায়ারের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়েছিল নাকি? কি যেন নাম, লীলা—তোমার রক্তও খেয়েছে নাকি?'

'না। এমনিতেই শরীর খারাপ। জ্বরটর হবে। ভাইরাস।'

হাসিটা মুছে গেল টনির মুখ থেকে। 'মিথ্যে বলছ কেন, মুসা? সত্যি সত্যি বলো তো, কি হয়েছে তোমার?'

জবাব না দিয়ে আবার হাঁটতে শুরু করল মুসা।

পিছে পিছে চলল টনি। শেষ হয়ে এল কটেজের সারি। সামনে ঘাসে ঢাকা মাঠ, যেটার ওপাশে শহর। দিনের আলো নিভে আসছে দ্রুত। যেন হ্যারিকেনের চাবির মত চাবি ঘুরিয়ে ক্রমে কমিয়ে দেয়া হচ্ছে আলোটা। দিগন্তে নেমে যাওয়া সূর্য বেগুনী আকাশে প্রচুর লাল রঙ গুলে দিয়েছে।

'রাতে কার্নিভলে যাবে?' জিজ্ঞেস করল টনি। 'আমার কয়েকজন বন্ধু প্রথমে যাবে আর্কেডে। অন্ধকার হয়ে গেলে তখন যাবে কার্নিভলে।'

'দেখি,' কোন আগ্রহ দেখাল না মুসা। জিনাকে চোখে পড়তে চিৎকার করে উঠল, 'আই, জিনা!'

কয়েক গজ সামনে মাথা নিচু করে হাঁটছে জিনা। যেন কোন জিনিস খুঁজতে খুঁজতে চলেছে রাস্তায়।

'জিনা!' গলা আরও চড়িয়ে দিয়ে ডাকল মুসা।

মুসার মনোযোগ এখন ওর দিকে নেই বুঝে, 'পরে দেখা হবে' বলে এগিয়ে গেল টনি। জিনার পাশ কাটানোর সময়, 'কেমন আছ, জিনা?' বলে জবাবের অপেক্ষা না করেই হেঁটে চলে গেল।

মুসাও দৌড়ে গেল জিনার দিকে। 'এই, জিনা, শোনো!'

থামল জিনা। মুখ তুলে তাকাল। হাসি নেই মুখে। গম্ভীর। 'অ। তুমি।'

বড়ই শীতল আচরণ। কেয়ারও করল না মুসা। ওসব দেখার সময় নেই এখন। জিনার সঙ্গে কথা বলতে হবে। বোঝাতে হবে কি ঘটছে।

অধৈর্য ভঙ্গিতে মুসার দিকে তাকিয়ে রইল জিনা। ম্লান আলোতেও ফ্যাকাসে লাগছে চেহারা। চোখে ক্লান্তির ছাপ। গলার দাগ দুটো দেখা যাচ্ছে।

'কথা আছে তোমার সঙ্গে,' হাঁপাতে হাঁপাতে বলল মুসা। 'আমি সকাল থেকেই...'

হাত নেড়ে মুসার কথা যেন ঝেড়ে ফেলে দিল জিনা। 'আমার সময় নেই। কয়েক মিনিটের মধ্যে জনের সঙ্গে দেখা করার কথা...'

'ওর ব্যাপারেই কথা বলতে চাই তোমার সঙ্গে,' প্রায় চিৎকার করে উঠল মুসা। 'নিজেকে দেখেছ আয়নায়? গলার দাগ দুটো দেখেছ?'

'দেখো, মুসা,' মুহূর্তে রাগ চড়ে গেল জিনার। 'আবার সেই এক প্যাচাল শুরু কোরো না,' মুখ ঘুরিয়ে নিল সে।

'এক মিনিট, জিনা,' অনুরোধের সুরে বলল মুসা। হাত রাখল জিনার কাঁধে। 'মাত্র একটা মিনিট ধৈর্য ধরে আমার কথা শোনো।'

দীর্ঘ একটা মুহূর্ত চিন্তা করল জিনা। 'বেশ, ঠিক এক মিনিট। কিন্তু ভ্যাম্পায়ারের কথা যদি বলতে চাও, শুনব না।'

'জিনা, আমি ভ্যাম্পায়ারের কথাই বলতে চাই,' মরিয়া হয়ে বলল মুসা। নিজের কণ্ঠস্বর স্বাভাবিক রাখার যথাসাধ্য চেষ্টা করছে। 'জন একটা ভ্যাম্পায়ার। আমি জেনে গেছি। লীলাও তাই। ওরা দুজনেই ভ্যাম্পায়ার।'

'গুড-বাই, মুসা,' শীতল কণ্ঠে বলল জিনা। চোখ ওপরে তুলে, দুই হাত নেড়ে মুসাকে বিদেয় হতে ইঙ্গিত করল।

'জিনা, শোনো! প্লীজ!'

'না! শুনব না!' চিৎকার করে উঠল জিনা। 'যাও তুমি!'

'কাল রাতে রিকি আমাকে বলেছে...'

ঝটকা দিয়ে মুসার দিকে মুখ ফেরাল জিনা, 'কি বললে!'

'কাল রাতে, রিকি আমাকে বলল...'

'কোথায় দেখা হলো ওর সঙ্গে!'

'স্বপ্নে।'

'মুসা, তোমার চিকিৎসা হওয়া দরকার,' অনেকটা মোলায়েম হয়ে গেল জিনার কণ্ঠ। সহানুভূতির সুর। 'রিকির জন্যে আমাদের সবারই কষ্ট…কিন্তু তোমার বেলায় বাড়াবাড়ি হয়ে গেছে…তোমার মগজে কিছু ঘটে গেছে। তোমার চিকিৎসা দরকার।'

'না, আমার কোন কিছুর দরকার নেই,' হতাশা চাপা দিতে পারল না মুসা। 'আমি জানি আমি ঠিক আছি, জিনা। আমার কথা শুনলে পাগলামিই মনে হবে…'

'হ্যাঁ, পাগলই হয়ে গেছ তুমি,' মুসার চোখে চোখ রেখে বলল জিনা। 'সেটা নিজে তুমি বুঝতে পারছ না।'

'আমি জানি আমি পাগল হইনি! দয়া করে আমার কথা কি একটু শুনবে?'

'এখন পারব না। আমি এখন একটা জিনিস খুঁজছি।'

'কি জিনিস খুঁজছ?'

মাথা নিচু করে আবার হাঁটতে শুরু করল জিনা। মনে হলো কিছু হারিয়েছে রাস্তায়। স্যান্ডেলের ঘষায় খসখস শব্দ হচ্ছে। চঞ্চল হয়ে খোঁজাখুঁজি করছে চোখ জোড়া। মুসার দিকে না তাকিয়ে জবাব দিল, 'একটা রূপার ক্রুশ। কাল রাতে জনের সঙ্গে বেরিয়েছিলাম। তখন কোনভাবে গলা থেকে পড়ে গেছে ওটা।'

'ক্রুশ! তোমার গলায় ক্রুশ!' তাজ্জব হয়ে গেল মুসা। 'তুমি আবার ধর্ম পালন শুরু করলে কবে থেকে? গির্জায় যাও?'

'ধর্ম পালন না করলে কি ক্রুশ গলায় পরা যায় না? গত জন্মদিনে আমার এক নানা দিয়েছিলেন। আসলে ওটা একটা লকেট। ক্রুশের মত করে তৈরি। মাঝখানে একটা পাথর বসানো।'

'তোমার নানা কি পাদ্রী নাকি?'

'কি করে বুঝলে?'

'নাতনীকে ক্রুশের মত লকেট উপহার দেন যিনি, তিনি ওরকমই কিছু হবেন, এটা আন্দাজ করতে জ্যোতিষ হওয়া লাগে না। কিন্তু কাল পরতে গিয়েছিলে কেন?'

'মা সুটকেস থেকে জিনিসপত্র বের করছিল। ওটা দেখে হঠাৎ পরতে ইচ্ছে করল। নিয়ে নিলাম। হারিয়ে ফেলব কল্পনাই করিনি। খুঁজে এখন বের করতেই হবে। নইলে খুব কষ্ট পাবে মা। রেগে যাবে।'

রূপার ক্রুশ! অন্ধকারে যেন আশার আলো দেখতে পেল মুসা। শুনেছে, ভূতেরা নাকি ক্রুশকে ভয় করে। ভ্যাম্পায়ারেরা তো যমের মত ভয় করে।

'জন দেখেছে নাকি ওটা?' উত্তেজিত হয়ে উঠেছে মুসা। 'দেখে কি করল? তোমার গলায় দেখে সরে গেল না? ফেলে দিতে বলল না? কুঁকড়ে গিয়েছিল?'

জবাব দিল না জিনা।

ওর সামনে এসে দাঁড়াল মুসা। মুখ দেখে অনুমানের চেষ্টা করল, জন কি করেছিল।

'এ রকম পাগলের মত করছ কেন তুমি, বলো তো?' ভুরু কুঁচকে

ফেলেছে জিনা। 'সত্যি কথাটা শুনবে? ক্রুশটা ওকে দেখিয়েছি। ও পছন্দ করেছে।'

'চোখ অন্যদিকে সরিয়ে রাখার চেষ্টা করেনি?'

'না। মোটেও ভয় পায়নি। বরং চেনের হুক একবার খুলে গিয়েছিল। সে ওটা আটকে দিতে সাহায্য করেছে আমাকে।'

পরস্পরের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইল দুজনে। তারপর রুক্ষকণ্ঠে জিনা বলল, 'এতেই প্রমাণ হয়ে গেল তোমার ধারণা ভুল।'

'না, কিছুই প্রমাণ হলো না,' নাছোড়বান্দার মত জিনার পিছে পিছে হাঁটতে লাগল মুসা। ভিন্নভাবে জিনাকে বোঝানোর চেষ্টা চালাল, 'এখনও তোমার ক্লান্ত লাগে? সকালে ঘুম থেকে উঠতে কষ্ট হয়?'

'তোমার ওই বোকার মত প্রশ্নের কোন জবাব আর আমি দেব না,' মুসার দিকে ফিরেও তাকাল না জিনা।

হাল ছাড়ল না মুসা, 'দিনের বেলা কখনও দেখা হয়েছে জনের সঙ্গে? দেখা না করার ছুতো দেখায়নি—বলেনি দিনে জরুরী কাজ থাকে বলে আসতে পারে না? ও যেখানে কাজ করে সে-জায়গাটা চেনো? একবারও তোমার মনে হয়নি সেরাতে আমরা যখন পিজ্জা খাচ্ছিলাম, কেন সে মুখে তুলতেও রাজি হয়নি?'

রাগে ঝাঁকি দিয়ে ঘুরে দাঁড়াল জিনা। মুঠো হয়ে গেছে দুই হাত। 'মুসা, তোমার মাথা খারাপ হয়ে গেছে।'

'যা জিজ্ঞেস করছি, জবাব দাও, জিনা!'

'তুমি এখন বিদেয় হলে আমি খুশি হব।'

'না, বিদেয় হব না। যতক্ষণ না তুমি আমার কথা শুনছ, আমি যাব না।'

'মুসা, দোহাই লাগে তোমার!' চিৎকার করে উঠল জিনা, 'যাও এখন! বিরক্ত কোরো না! আমার অসহ্য লাগছে!'

গেল না মুসা। বরং জিনাকে শান্ত করার জন্যে ওর কাঁধে হাত রাখতে গেল।

ঝটকা দিয়ে সরে গেল জিনা।

জনের আগমনটা টেরই পায়নি মুসা। যখন দেখল, নিজের অজান্তেই মুখ থেকে বেরিয়ে এল, 'খাইছে!'

জনের পরনে কালো জিনস, গায়ে লম্বা হাতাওয়ালা কালো পুলওভার। এত গরমের মধ্যে এই পোশাক পরে না সাধারণত কেউ।

'কি হয়েছে?' মুসার দিকে তেড়া দৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে জানতে চাইল সে।

ভয়ে বুকের মধ্যে কাঁপুনি শুরু হলো মুসার। পেটে খামচি দিয়ে ধরার মত অনুভূতি। ঠাণ্ডা হয়ে আসতে লাগল হাত-পা।

'না, কিছু হয়নি,' জিনা বলল।

এক পা পিছিয়ে এল মুসা। দুহাত ঝুলে পড়েছে দুই পাশে। জনের চোখের জ্বলন্ত দৃষ্টি যেন গরম লোহার চোখা শিকের মত ঢুকে যাচ্ছে তার মগজের মধ্যে।

'বললাম তো কিছু হয়নি,' জন যে রেগে যাচ্ছে বুঝতে পেরে তাড়াতাড়ি বলল জিনা। 'এমনি কথা বলছিলাম আমরা।'

জিনার দিকে ফিরল জন। মুহূর্তে বদলে গেল মুখের ভঙ্গি। হাসল। 'সেই "এমনি" কথাটা আমাকে নিয়েই হচ্ছিল মুসাকে আমার নাম বলতে শুনলাম।'

'হ্যাঁ, ভুল শোনোনি,' জনের হাত ধরল জিনা। টান দিল।

পাশাপাশি হাঁটতে শুরু করল দুজনে। চলে যাচ্ছে।

কিছুই করার নেই আর মুসার। স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে তাকিয়ে আছে দুজনের দিকে। জনের জ্বলন্ত দৃষ্টি যেন এখনও বিদ্ধ করছে ওকে।

চলতে চলতে একবার ফিরে তাকাল জিনা। মুসা এখনও পেছন পেছন আসছে কিনা দেখল বোধহয়। জন একটিবারের জন্যেও ফিরল না।

ঠিকই সন্দেহ করেছি আমি! নিজেকে বলল মুসা। আমার ধারণাই ঠিক! পথের মোড়ে দুজনকে হারিয়ে যেতে দেখল।

কিন্তু কি করে প্রমাণ করবে জিনার কাছে? কিশোরকে খবর দেবে? যদি ওকে না পাওয়া যায়? পাওয়া গেলেও আসতে যদি দেরি করে ফেলে? বাঁচানো যাবে না জিনাকে।

বাঁচাতে হলে তাড়াতাড়ি কিছু করা দরকার।

কি করবে? কি করে বোঝাবে ওকে?

উপায়টা বিদ্যুৎ চমকের মত ঝিলিক দিয়ে উঠল মাথার মধ্যে। হ্যাঁ, এটাই একমাত্র পথ! নিজের চোখে দেখলে বিশ্বাস করতে বাধ্য হবে জিনা।

চোদ্দ

'ক্যামেরা নিয়ে কোথায় যাচ্ছ?' লিভিং রুম থেকে ডেকে জিজ্ঞেস করলেন মিস্টার আমান।

দরজার কাছে দাঁড়িয়ে গেল মুসা। 'ওঁ, বাবা, তুমি। দেখিইনি।' খাপে ভরা ক্যামেরাটা কাঁধে ঝুলিয়ে ঘরের মধ্যে এগিয়ে এল আবার। 'কখন এলে?'

'এই তো। কিসের ছবি তুলতে যাচ্ছ?'

'রাতে সৈকতে অনেক পাখি পড়ে,' মিথ্যে কথা বলল মুসা। ভ্যাম্পায়ারের কথা বললে বাবাও হয়তো বিশ্বাস করবেন না। একশো একটা কথা বলা লাগবে বোঝানোর জন্যে। অত সময় নেই। 'দেখি, তোলা যায় নাকি?'

হাতের পত্রিকাটা কোলের ওপর নামিয়ে রাখলেন আমান। 'পাখি? রাতের বেলা? কি পাখি? সী-গাল ছাড়া আর তো কিছু দেখেছি বলে মনে পড়ে না।'

'ওগুলোই তুলব। নানা রকম কাণ্ড করে রাতের বেলা। এমন ভাবে তাড়া করে বেড়ায় একে অন্যকে...'

'কিন্তু তার জন্যে তো মুভি ক্যামেরা দরকার। স্টিল ফটোগ্রাফে কি আর

ধরা যাবে নাকি?'

'মুভি আর পাব কোথায় এখন। স্টিলই তুলব,' বাবার সঙ্গে মিথ্যে বলতে খারাপ লাগছে মুসার। কিন্তু সত্যি বলার আপাতত কোন পথও দেখতে পাচ্ছে না। জিনাকে বিশ্বাস করাতে পারেনি, টনিকে পারেনি, বাবাকেও পারবে বলে মনে হয় না। বিশ্বাস না করে যদি মাথায় গণ্ডগোল হয়েছে ভেবে ওকে আটকে দিতে চান, জিনার মহাসর্বনাশ ঘটে যাবে। এতবড় ঝুঁকি এখন কিছুতেই নিতে পারবে না সে।

'ঠিক আছে, যা পারো তোলোগে,' বললেন তিনি। 'কিন্তু এটা ব্যবহার করার কিছু নিয়ম আছে, নইলে ছবি ভাল ওঠে না। দাঁড়াও, দেখিয়ে দিচ্ছি,' পত্রিকা রেখে উঠে এলেন আমান। 'রাতের বেলা এটা দিয়ে ছবি তুলতে গেলে ফোকাসিঙের দিকে নজর রাখতে হয়। দেখি, দাও, ঠিক করে দিই।'

কার্নিভলে যাওয়ার জন্যে অস্থির হয়ে উঠেছে মুসা। কিন্তু বেশি তাড়াহুড়ো করলে সন্দেহ হবে বাবার। যা করতে চাইছে করুক। ধৈর্য ধরে দাঁড়িয়ে রইল সে।

খাপ থেকে ক্যামেরাটা খুলে নিলেন আমান। কিভাবে সবচেয়ে ভাল ফোকাসিং হবে দেখিয়ে দিলেন। চোখের সামনে কোনভাবে ধরে কিভাবে শাটার টিপতে হবে তা-ও বুঝিয়ে দিলেন।

বাবাকে ধন্যবাদ দিয়ে 'গুড-নাইট' বলে বেরিয়ে এল মুসা।

কার্নিভলে গিয়ে পুরো এক রোল ফিল্ম জিনা আর জনের ওপর খরচ করার ইচ্ছে ওর। ও শুনেছে, ভূতের ছবি ওঠে না। প্রতিটি ছবিতেই যখন জিনা দেখবে ওর একলার ছবি আছে, আশেপাশের সব কিছুর ছবি আছে, কেবল জনের নেই, তখন মুসার কথা বিশ্বাস করতে বাধ্য হবে। জনকে ভ্যাম্পায়ার প্রমাণ করার এটাই একমাত্র পথ।

অর্ধেক দৌড়ে অর্ধেক হেঁটে কার্নিভলে এসে পৌঁছল সে। শক্তিশালী স্পটলাইটের আলোর নিচে এসে দাঁড়াল। আশপাশের সমস্ত জায়গায় জিনা আর জনকে খুঁজতে লাগল ওর চোখ। চতুর্দিক থেকে কানে আসছে চিৎকার-চেঁচামেচি, হই-হট্টগোল, হাসির শব্দ। হঠাৎ মনে পড়ল লীলার কথা। ও কোথায় এখন? সৈকতে? নতুন কোন শিকারের সন্ধানে ঘোরাফেরা করছে?

লীলার কথা আপাতত মাথা থেকে ঝেড়ে ফেলে জিনাদের খুঁজতে লাগল সে। দুই হাতে ধরে রেখেছে ক্যামেরাটা। যেখানে যে অবস্থায় দেখবে ওদের, সেভাবেই তুলে ফেলবে। ফেরিস হুইলটার কাছে এল। জনতার ভিড়। ভিড়ের দিকে তাকিয়ে ওদের মধ্যে খুঁজল জিনা আর জনকে। হুইলে চড়ার জন্যে চিৎকার করতে করতে ছুটে এল একদল ছেলেমেয়ে। ধাক্কা মারল মুসার গায়ে।

কাত হয়ে পড়তে পড়তে এক হাতে ক্যামেরা ধরে রেখে আরেক হাতে একটা খুঁটি আঁকড়ে পতন ঠেকাল মুসা। অল্পের জন্যে মাটিতে পড়ল না ক্যামেরাটা। বিড়বিড় করে বলল, 'উফ্, পাগল হয়ে গেছে একেবারে!' ক্যামেরা এভাবে হাতে রাখার সাহস পেল না আর। যে রকম উত্তেজিত হয়ে

আছে ছেলেমেয়েগুলো, কখন কি ঘটিয়ে বসে ঠিক নেই। খাপে ভরল আবার। তবে ঢাকনাটা না লাগিয়ে খোলাই রাখল।

কয়েক মিনিটের মধ্যেই পেয়ে গেল জিনা আর জনকে। ফেরিস হুইলটা থেকে একটু দূরে হাত ধরাধরি করে হাঁটছে।

তাড়াতাড়ি ক্যামেরা খুলে আনতে গিয়ে খাপের ফিতে হাতে পেঁচিয়ে ফেলল মুসা। উত্তেজনায় কাঁপছে। পাশ থেকে খাপটা চলে এল পেটের ওপর। গলার ফিতেতে টান লাগল। কোনমতে বের করে আনল ক্যামেরাটা।

সবে শাটারে টিপ দিচ্ছে, ক্যামেরার চোখ আটকে দিয়ে সামনে চলে এল একটা মেয়ে। শেষ মুহূর্তে মুসার দিকে তাকিয়ে 'সরি' বলল। দেরি হয়ে গেছে ততক্ষণে। শাটার টিপে ফেলেছে মুসা। প্রথম ছবিটা নষ্ট হলো।

দ্বিতীয়বার সুযোগ নেয়ার আগেই কয়েক গজ দূরে সরে গেল জিনারা। একটা রিফ্রেশমেন্ট বূদের কাছে গিয়ে সুযোগ মিলল আবার। কয়েক ফুটের মধ্যে চলে এল মুসা। ক্যামেরা তুলে শাটার টিপল। তারপর টিপেই চলল, একের পর এক।

ফোকাস ঠিক করে আরও কাছে থেকে তোলার জন্যে এগিয়ে এল সে। আলো ঠিক আছে নাকি দেখল। তারপর আবার জিনা আর জনকে ফ্রেমে আটকে শাটার টিপতে লাগল।

মুখ তুলল জিনা।

ঝট করে বূদের আড়ালে সরে গিয়ে মাথা নিচু করে ফেলল মুসা।

দেখে ফেলল নাকি?

আস্তে করে মাথাটা আবার বাড়িয়ে দিয়ে দেয়ালের ওপরে তুলে সাবধানে উঁকি দিল।

না, দেখেনি। জনের দিকে ফিরেছে আবার জিনা। কথা বলছে।

আরও সতর্ক হয়ে গেল মুসা। কোনমতেই জনের চোখে পড়া চলবে না। জন দেখলে সঙ্গে সঙ্গে বুঝে যাবে মুসার উদ্দেশ্য। তারপর কি যে ঘটাবে খোদাই জানে! ভ্যাম্পায়ারদের ভয়াবহ ক্ষমতার কথা কল্পনা করে এত লোকজন আর আলোর মধ্যেও গায়ে কাঁটা দিল ওর।

দুজনের পেছনে লেগেই রইল সে। ছবি যা তোলা হয়েছে, তাতেই কাজ হয়ে যাবে, তবু আরও ভাল ছবি তোলার অপেক্ষায় রইল সে। পিছে পিছে ঘুরতে লাগল ওদের।

ফেরিস হুইলে চড়ল দুজনে। মেটাল কারে পাশাপাশি বসল, খুব কাছাকাছি, গা ঘেঁষাঘেঁষি করে।

জুম লেন্স অ্যাডজাস্ট করে ক্যামেরার চোখ দুজনের দিকে তুলে শাটার টিপে দিল মুসা।

নিশ্চয় ছবিটা ভাল উঠেছে। কিন্তু থামল না মুসা। পুরো একটা রোলই শেষ করবে। কোন খুঁত রাখতে চায় না। বেশি ছবি হলে জিনাকে বিশ্বাস করানো সহজ হবে।

ফেরিস হুইল থেকে নামার পরও ওদের পিছে লেগে রইল সে। গেম

বৃদগুলোর পাশ দিয়ে হাঁটছে দুজনে। চওড়া গলিপথের অন্যপাশে বৃদের আড়ালে থেকে ওদের অনুসরণ করে চলল সে। সুযোগ পেলেই ক্যামেরা তুলে শাটার টেপে।

ফিল্মে অল্প কয়েকটা শট বাকি থাকতে গলি থেকে বেরিয়ে এল।

ভিড়ের মধ্যে ঢুকতে গিয়ে হঠাৎ ফিরে তাকাল জিনা। মুসাকে দেখে ফেলল। না চেনার ভান করল। জনের একটা হাত তুলে নিয়ে চোখ ফেরাল অন্য দিকে।

জিনা কিছু বলল না দেখে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল মুসা। বলল না বলেই জনের চোখে পড়ল না।

বেশিক্ষণ আর থাকবে না দুজনের এই খাতির। জন ভ্যাম্পায়ার–এটা বোঝার পর কি প্রতিক্রিয়া হবে জিনার, কি করবে, কল্পনায় দৃশ্যটা দেখে মুচকি হাসি ফুটল ওর ঠোঁটে।

আর ওদের অলক্ষে ছবি তোলা যাবে না। দরকারও নেই। অনেক তুলেছে। ক্যামেরাটা খাপে ভরল মুসা।

আসল কাজ হয়ে গেছে। এখন যত তাড়াতাড়ি পারা যায় ছবিগুলো ডেভেলপ করতে হবে। জিনাকে দেখাতে হবে।

খাপটা পেটের সঙ্গে চেপে ধরে দৌড় দিল সে। না ধরলে বাড়ি লাগে। কার্নিভলের মাঠ থেকে বেরিয়ে আসতে যাচ্ছে, এই সময় ওর নাম ধরে ডাকল কে যেন। টনিই হবে।

কিন্তু থামল না মুসা। ফিরেও তাকাল না।

সারি সারি গাড়ির ফাঁক-ফোকর দিয়ে পার্কিং লটটা প্রায় দৌড়ে পেরোল সে। মেইন রোডে বেরিয়ে ছোটার গতি বাড়িয়ে দিল। ফিল্ম ডেভেলপ করার দোকানটা রয়েছে এক ব্লক দূরে, ডিউন লেনের মোড়ে: বড় বড় হরফে বিজ্ঞাপন করে রেখেছে ওরা: এক ঘন্টার মধ্যে ছবি দিয়ে দেয়া হয়।

ছবি পেতে এক ঘণ্টা! তারপর আর বড় জোর এক ঘণ্টা। ঘণ্টা দুয়েকের মধ্যেই জিনাকে বোঝাতে সক্ষম হবে সে, জন একটা ভ্যাম্পায়ার।

মেইন রোড পেরিয়ে অন্যপাশের ফুটপাথে উঠল মুসা। উত্তেজনায় ধাক্কা মেরে বসতে লাগল এর ওর গায়ে। পরোয়াই করল না। কনুইয়ের গুঁতোয় ভিড় সরিয়ে পথ করে নিয়ে ছুটে চলল। একটাই লক্ষ্য—ক্যামেরার দোকান

মাঝবয়েসী এক লোক কোন আইসক্রীম খাচ্ছিল। মুসার ধাক্কা লেগে হাত থেকে পড়ে গেল আইসক্রীম। ছুটতে ছুটতেই 'সরি' বলল মুসা। লোকটার জবাব শোনার অপেক্ষা করল না। ক্যাঙারুর মত লাফাতে লাফাতে চলেছে ডিউন লেনের দিকে।

কাছাকাছি পৌঁছে আবার রাস্তা পেরোতে হবে। ট্র্যাফিক লাইটের দিকে তাকাল না। দিল দৌড়। সামনে পড়ল নীল রঙের একটা স্টেশন ওয়াগন। ঘ্যাচ করে ব্রেক কষল ড্রাইভার। জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে কি যেন বলল।

ফিরেও তাকাল না মুসা।

ওর কানে বাজছে কেবল 'এক ঘণ্টা'। এক ঘণ্টার মধ্যে হাতে এসে যাবে

ছবিগুলো। জন যে ভ্যাম্পায়ার, তার জোরাল প্রমাণ।

দোকানটার সামনে এসে দাঁড়াল সে। কোনদিকে না তাকিয়ে দরজার নব চেপে ধরে টান দিল।

কিছুই ঘটল না। নব ঘুরল না। দরজাও খুলল না।

বন্ধ হয়ে গেছে দোকান। অন্ধকার। বুঝতে কয়েক সেকেন্ড সময় লাগল তার।

পনেরো

পরদিন সকাল আটটায় ঘড়ির অ্যালার্মের শব্দে ঘুম ভেঙে গেল মুসার। ভাঙার সঙ্গে সঙ্গে প্রথম কথাটাই মনে পড়ল—ফিল্ম।

ডেভেলপ করতে হবে। জিনাকে দেখাতে হবে। ভ্যাম্পায়ারের বিরুদ্ধে প্রমাণ।

জিনাকে বাঁচাতে হবে।

কাপড় পরে, ঢকঢক করে এক গ্লাস কমলার রস খেয়ে, বাবা-মা ঘুম থেকে ওঠার আগেই ঘর থেকে বেরিয়ে পড়ল সে। দৌড়ে চলল শহরের দিকে। একটা হাত প্যান্টের পকেটে ঢোকানো। শক্ত করে ধরে রেখেছে ফিল্ম ভরা প্লাস্টিকের কৌটাটা।

রাতের বেলা কোন এক সময় সাগর থেকে ভেসে এসেছে কুয়াশা। ছড়িয়ে পড়েছে ডাঙার ওপর। তার মধ্যে দিয়ে ছুটছে মুসা। শহরের কিনারে যখন পৌঁছল, সামান্য হালকা হলো কুয়াশা। কিছু কিছু জায়গা থেকে সরেও গেল। তবে আকাশে মেঘ আছে। ধূসর, থমথমে হয়ে আছে। বাতাস ঠাণ্ডা। বাড়িঘরগুলোর ফাঁকে ফাঁকে কুয়াশা যেন আটকে রয়েছে।

মেইন রোডে উঠল সে। এত সকালে লোকজন নেই। স্যান্ডি হোলোর অন্যান্য দোকানপাটের মতই ছবি ডেভেলপের দোকানটাও দশটার আগে খোলে না।

কি আর করবে। সময় কাটানোর জন্যে নির্জন রাস্তার এমাথা ওমাথায় পায়চারি শুরু করল সে। হাতটা এখনও পকেটে। আঙুলগুলো ধরে রেখেছে কৌটাটা। যেন ছাড়লেই পকেট থেকে পড়ে গিয়ে হারিয়ে যাবে মূল্যবান সূত্রগুলো।

হাঁটার সময় দু'একজন মানুষ দেখা গেল। প্রাতঃভ্রমণে বেরিয়েছে। উদ্‌ভ্রান্তের মত ওকে রাস্তায় হেঁটে বেড়াতে দেখে কৌতূহলী চোখে তাকাতে লাগল ওরা। ফিরেও তাকাল না সে। অন্য কোন দোকানের দিকে সামান্যতম আগ্রহ নেই। হাঁটছে আর কয়েক মিনিট পর পরই হাত চোখের সামনে তুলে এনে ঘড়ি দেখছে, দশটা বাজতে আর কত দেরি।

পায়চারি করার সময় বাড়িঘরের বেশি কাছে গেল না, বিশেষ করে

বিল্ডিঙের মাঝে মাঝে যেখানে কুয়াশা জমে রয়েছে। ভয় পাচ্ছে আবছা অন্ধকার থেকে বেরিয়ে এসে ওর দামী সূত্রগুলো কেড়ে নেবে জন। যদিও জানে, ভয়টা একেবারেই অমূলক। বোকার মত ভাবনা। দিনের বেলা কোন কারণেই বেরোয় না ভ্যাম্পায়ার। বেরোতে পারে না। ওদের সে-ক্ষমতাই নেই।

কয়েক যুগ পেরিয়ে গেছে যখন মনে হলো মুসার, ঘড়িতে দেখে তখনও মাত্র সাড়ে ন'টা। একটা দুটো করে খাবারের দোকান খুলতে আরম্ভ করেছে। অন্যান্য দোকানের চেয়ে খাবারের দোকানগুলো আগে খোলে। সী-ব্রিজ কফি শপের কাউন্টারের সামনে একটা টুলে এসে বসল সে। হালকা খাবার আর কফির অর্ডার দিল। পেট ভরানোর চেয়ে খাবার খেয়ে সময় কাটানোর দিকেই বেশি নজর তার। কেকের টুকরোটা চিবাতে গিয়ে করাতে কাটা কাঠের গুঁড়োর মত লাগল। কফিটা আরও বিস্বাদ। মগের কানায় কানায় পূর্ণ করে দিল দুধ দিয়ে। কয়েক চামচ চিনি মেশাল। তারপরেও কোন স্বাদ পেল না। উত্তেজনায় জিভই নষ্ট হয়ে আছে, ভাবল সে। নইলে এত বিস্বাদ লাগতে পারে না কোন খাবার।

কফির কাপে চুমুক দিচ্ছে আর বার বার চোখ যাচ্ছে কাউন্টারের পেছনে দেয়াল ঘড়িটার দিকে। অনড় হয়ে আছে যেন কাঁটাগুলো।

দশটা বাজার পাঁচ মিনিট আগে ছবি ডেভেলপের দোকানের সামনে এসে দাঁড়াল সে। দোকানের তরুণ ম্যানেজার তখন তালা খুলছে। স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল মুসা। তাকিয়ে থেকে ওর দোকান খোলা দেখতে দেখতে মনে মনে তাগাদা দিতে লাগল আরও তাড়াতাড়ি করার জন্যে। লোকটার লাল চুল শজারুর কাঁটার মত খাড়া। এক কানে পান্না বসানো একটা মাকড়ি।

দরজা খুলে লোকটা ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে ঢুকে পড়ল মুসা।

ভুরু কুঁচকে অবাক চোখে মুসাকে দেখতে দেখতে ম্যানেজার বলল, 'গুড মর্নিং। খুব তাড়া নাকি তোমার?'

পকেট থেকে কৌটাটা বের করে পুরু কাঁচ লাগানো কাউন্টারে রাখল মুসা। 'অতিরিক্ত তাড়া। এগুলো করে দিন।'

কিন্তু ম্যানেজারের মধ্যে কোন তাড়া দেখা গেল না। পেপার ব্যাগ থেকে কফির একটা পাত্র বের করে ধীরে সুস্থে প্লাস্টিকের ঢাকনা খুলল। মুসার দিকে তাকাল। 'মেশিন খুলে রান করতে কিছুটা সময় লাগবে,' হাই তুলতে লাগল সে।

'এক ঘণ্টার মধ্যে পাব না?' জানতে চাইল মুসা।

মাথা নাড়ল লোকটা, 'দেড় ঘণ্টা পর এসো, সাড়ে এগারোটার দিকে।' খাতা খুলে মুসার নাম-ঠিকানা আর টেলিফোন নম্বর লিখতে শুরু করল সে। 'এক সেটই করাবে? এ হপ্তায় স্পেশ্যাল বোনাসের ব্যবস্থা করেছি আমার। এর পর যত সেটই নাও, অর্ধেক দামে করে দেব।'

'থ্যাংক ইউ, লাগবে না,' মুসা বলল। 'এক সেটই যথেষ্ট। সাড়ে এগারোটায় আসব, না? হবে তো?'

মাথা ঝাঁকাল ম্যানেজার। 'নিশ্চয় খুব সাংঘাতিক জিনিস তুলে এনেছ,' মুসার দিকে ঝুঁকে চোখ টিপল সে। 'দাম পাওয়া যাবে, এমন কিছু? আমার নিজের জন্যেও এক সেট করে রাখতাম তাহলে। ভয় নেই, বিনে পয়সায় রাখব না, কমিশন পাবে।'

'রাখলে রাখুনগে। কোন লাভ হবে না আপনার। আমাকেও পয়সা দেয়া লাগবে না। দয়া করে আমার ছবিগুলো আমাকে সময়মত দিয়ে দিলেই আমি খুশি।'

আবার মেইন স্ট্রীটে ফিরে এল মুসা। জিনাকে ফোন করা দরকার। জিজ্ঞেস করে জেনে নিতে হবে সাড়ে এগারোটায় সে কি করছে।

পে ফোনের দিকে এগোতে গিয়েও দাঁড়িয়ে গেল। না. আগে থেকে কিছু বলে লাভ নেই। প্রমাণগুলো সব হাতে নিয়ে গিয়ে হাজির হবে। মুখ বন্ধ করে দেবে ওর। যাতে কোন তর্ক আর করতে না পারে।

তা ছাড়া, এখন ফোনে ওর সঙ্গে জিনা কথা বলবে কিনা, তাতেও যথেষ্ট সন্দেহ আছে।

আরও দেড়টি ঘণ্টা রাস্তায় হাঁটাহাঁটি করে বেড়ানো বড় কঠিন। সৈকতে রওনা হলো মুসা। কুয়াশা এখনও আছে। ধূসর রঙের ভারী মেঘ জমেছে আকাশে। ঝুলে রয়েছে সাগরের ওপর। সূর্য ঢেকে অন্ধকার করে দিয়েছে। সৈকত থেকে তাড়ানোর ব্যবস্থা করেছে সানবেদারদের।

বালিয়াড়ির ধার ধরে কিছুক্ষণ হাঁটল সে। সময়টাকে দ্রুত পার করার জন্যে।

এগারোটা বিশে ফিরে এল ডেভেলপিং স্টোরে। মাপ চাওয়ার ভঙ্গিতে হেসে স্বাগত জানাল ওকে ম্যানেজার, 'সরি!'

'কি হয়েছে?' বুঝতে পারল না মুসা। 'বেশি তাড়াতাড়ি চলে এসেছি? প্রিন্ট রেডি হয়নি?'

'না, হয়নি,' লাল চুলের মধ্যে আঙুল ঢুকিয়ে জোরে জোরে চুলকাতে লাগল ম্যানেজার।

'আরও সময় লাগবে?' তীক্ষ্ণ হয়ে উঠল মুসার কণ্ঠ। ঢিবঢিব বাড়ি মারতে আরম্ভ করেছে হৃৎপিণ্ডটা।

'আমার কিছু করার ছিল না,' হাত উল্টে হতাশ ভঙ্গি করল লোকটা। 'মেশিন নষ্ট হয়ে গেছে। গীয়ার। নিউটন'স কোভে আমাদের অন্য দোকানে ফোন করে দিয়েছি নতুন পার্টস দিয়ে যাওয়ার জন্যে।'

'কখন পাবেন?'

কাঁধ নাচিয়ে হতাশ ভঙ্গি করল ম্যানেজার, 'সন্ধ্যা সাড়ে সাতটা পর্যন্ত দোকান খোলা আছে। আধা ঘণ্টা আগেই এসো। পেয়ে যাবে।' পাশে রাখা একটা স্থানীয় খবরের কাগজ তুলে নিয়ে হেডলাইন পড়তে শুরু করল সে। মুসা দাঁড়িয়েই আছে দেখে মুখ তুলে বলল, 'ঠিক সাতটায় চলে এসো। চিন্তা নেই। হয়ে যাবে।'

ষোলো

কোনমতে দিনটা পার করে দিল মুসা। সারাদিনে একবারের জন্যেও সূর্যের মুখ দেখা যায়নি। বিকেলে সামান্য পরিষ্কার হলো আকাশ। সাদাটে উজ্জ্বল আভা ছড়িয়ে পড়ল পশ্চিম আকাশে। কিন্তু বাতাস সেই আগের মতই কনকনে।

দুপুরের পর কিছুক্ষণ ঘুমানোর চেষ্টা করেছিল সে। তন্দ্রামত এসেছিল। সেই সামান্য সময়েও দুঃস্বপ্ন দেখল। লীলা এসে রক্ত খাওয়ার চেষ্টা করল তার।

চমকে জেগে উঠল সে।

ঘুমের মধ্যেও ধস্তাধস্তি করেছে। কিছুতেই রক্ত খেতে দেয়নি লীলাকে।

দিনের চেয়ে বিকেলের আলো খুব একটা কমল না। অতি সামান্য। কালচে ধূসর মন খারাপ করে দেয়া আলো। কোন কিছুই ভাল লাগে না।

মুসারও লাগল না। বিছানা থেকে নেমে ভাল করে চোখে মুখে পানি দিয়ে এল। পরিষ্কার একটা শার্ট পরল। কেন করল এ সব জানে না। বোধহয় মন ভাল করার জন্যে। মানিব্যাগে দেখে নিল টাকা আছে কিনা, ছবির বিল দিতে পারবে কিনা। টাকা না পেলে আবার ছবিগুলো আটকে দিতে পারে ম্যানেজার।

বেকার একটা দিন গেল। মেজাজই খারাপ হয়ে গেল ছবির দোকানের লোকটার ওপর। আরও খারাপ হবে ছবিগুলো যে ভাবে চাইছে সে, সেভাবে না এলে। ছবিতে জনের ছবি না উঠলেই কেবল জিনাকে বোঝাতে পারবে তার সঙ্গে আর মেলামেশা না করার জন্যে।

সাতটা বাজার কয়েক মিনিট আগে দোকানে ঢুকল মুসা।

হাসিমুখে কাউন্টারের সামনে এসে দাঁড়াল ম্যানেজার। 'এই যে, এসে পড়েছ।'

কোন ভূমিকার মধ্যে গেল না মুসা। 'হয়েছে?'

মাথা ঝাঁকিয়ে ড্রয়ার থেকে একটা পেটমোটা খাম বের করে ধড়াস করে টেবিলে ফেলল ম্যানেজার। খামের মুখটা পাতলা টেপ দিয়ে আটকানো। 'সাংঘাতিক ক্যামেরা। স্পষ্ট ছবি। এত দামী জিনিস পেলে কোথায়?'

অহেতুক কথা বলার মেজাজ নেই মুসার। 'আমার বাবার। বিল কত হয়েছে?'

কয়েক সেকেন্ড পর খামটা প্যান্টের পেছনের পকেটে নিয়ে ঝড়ের গতিতে দোকান থেকে বেরিয়ে এল সে। কোনদিকে না তাকিয়ে সোজা আর্কেডে ছুটল জিনাকে ফোন করার জন্যে।

সাতটা বেজে কয়েক মিনিট। ভারী মেঘ থাকায় আকাশ অস্বাভাবিক অন্ধকার। জন নিশ্চয় কফিন ছেড়ে বেরিয়ে পড়েছে এতক্ষণে। ওর আগেই জিনার সঙ্গে দেখাটা করতে হবে তার। নইলে আজ রাতেও জিনাকে বের করে

নিয়ে যাবে জন। তারপর হয়তো দেখা যাবে জিনার লাশও রিকির মত সাগরের পানিতে ভাসছে।

পে ফোন থেকে জিনার সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করল মুসা। বার বার চেষ্টা করেও লাইন পেল না। জবাব দিল না কেউ।

জিনাদের বাড়িতে লোক নেই। জিনা কোথায়? শহরে এসেছে? এলে কোন্ কোন্ জায়গায় যেতে পারে ভাবল। খুঁজতে চলল তাকে। প্রথমে এল শহরের দক্ষিণ প্রান্তে মুভি থিয়েটারটায়। শো দেখার জন্যে লাইন দিয়ে থাকা মানুষগুলোর চেহারার দিকে তাকাতে লাগল। জিনা নেই এখানে। ডিউন লেন পার হয়ে প্রিন্সেসে এল এরপর। আইসক্রীম পারলার কিংবা আর্কেডের কোনখানেও নেই জিনা।

কোথায় গেল?

দোকানগুলোর ধার দিয়ে রাস্তার শেষ মাথার দিকে হেঁটে চলল মুসা। প্রতিটি রেস্টুরেন্ট, কাপড়ের দোকানে, কসমেটিক্সের দোকানে উঁকি দিল। জোড়ায় জোড়ায় হাঁটছে যে সব ছেলেমেয়ে, সবার কাছাকাছি এসে চেহারার দিকে তাকাল। কিন্তু নেই।

জিনা, কোথায় তুমি?

প্রায় একঘন্টা ধরে শহরের দোকানপাট, অলিগলি, সবখানে চষে বেড়াল মুসা। ঘড়ি দেখল। আটটা পনেরো।

পকেটে হাত দিয়ে খামটার অস্তিত্ব অনুভব করল একবার। আছে। সৈকতে রওনা হলো সে।

সী-ব্রিজ রোড ধরে প্রায় ছুটতে ছুটতে চলল। গালে লাগছে সাগরের বাতাস। উত্তেজনায় টান টান হয়ে গেছে স্নায়ু, শক্ত করে দিয়েছে শরীরের পেশিকে। থেকে থেকে পেটে খামচি ধরা একটা অনুভূতি তৈরি হচ্ছে। ঠাণ্ডা ঘামের ধারা বইছে গাল বেয়ে। কয়েক মন ওজন লাগছে পা দুটোকে।

লাগুক। জিনাকে খুঁজে বের না করে থামবে না। কি রকম বিপদে রয়েছে সে, বোঝাতেই হবে। কিশোর হলে যা করত। ওকে বিপদ থেকে মুক্ত না করা পর্যন্ত নিরস্ত হত না কিশোর। মুসাও হবে না।

মেঘে ঢাকা গোধূলির ঘনায়মান অন্ধকারে সৈকতের বালির রঙ হয়ে উঠেছে নীলচে রূপালী। ঢেউয়ের উচ্চতা নেই বললেই চলে। আলতো করে এসে ছুঁয়ে যাচ্ছে সৈকতের কিনারা। ডুবন্ত সূর্যকে দেখা যাচ্ছে না মেঘের আড়ালে থাকায়, তবে কালচে লাল করে তুলেছে পশ্চিমের মেঘপুঞ্জকে। সেই আলোর রেশ এসে লেগেছে সাগরের পানিতে। কিনারটা লালচে। গভীর যেখানে, সেখানকার রঙ সবুজ। তাতে কালো রঙ মেশানো। দূর থেকে সাগরের উল্টোদিকে বনের গাছগাছালির মাথাকেও একই রঙের লাগছে।

জিনা, দোহাই তোমার, দেখা দাও! কোথায় তুমি?

সৈকতে এখন অনেক লোক। সারাদিন যারা ঘরে বসে ছিল, তারাও বেরিয়েছে। সন্ধ্যাটা উপভোগ করার জন্যে।

বালিয়াড়ির ধার ঘেঁষে দৌড়াচ্ছে মুসা। এগিয়ে চলেছে পানির দিকে।

হঠাৎ করেই উধাও হয়ে গেল সূর্য। ডুবতে দেখা গেল না। মেঘের বুকে লাল রঙ মুছে যাওয়া দেখে অনুমান করা গেল ডুবেছে। মুহূর্তে শীতল হয়ে গেল বাতাস। ঝপ করে নামল অন্ধকার।

দুইবার অন্য মেয়েকে জিনা বলে ভুল করল সে। দুটো মেয়েরই চুল জিনার মত। দৌড়ে কাছে গিয়ে দেখে ভুল ভাঙল। ওর দিকে কৌতূহলী চোখে তাকাল মেয়েগুলো। মুচকি হাসল। বোকা ভেবেছে নিশ্চয়।

ভাবুকগে। মাথা ঘামাল না মুসা। জিনাকে খোঁজা চালিয়ে গেল।

দূর থেকে চোখে পড়ছে নৌকার ডকটা। সেদিকেই চলেছে সে, পাথরের পাহাড়ের একটা ধার যেখানে পানিকে ঠেলে সরিয়ে নেমে গেছে সাগরে, যার কাছে পাওয়া গিয়েছিল রিকির লাশ। দিনের আলো না থাকলেও সৈকতে এক ধরনের আলোর আভা থাকে প্রায় সব সময়। চোখে সয়ে এলে সেই আলোতে মোটামুটি অনেক কিছুই দেখা যায়। ডকের পানিতে তিনটে নৌকাকে ঢেউয়ে ডুবতে ভাসতে দেখা যাচ্ছে অস্পষ্টভাবে।

কয়েকজন মানুষ দেখা গেল তীরে। জিনা আছে বলে মনে হলো না। আর এগিয়ে লাভ নেই। ফেরা দরকার।

শহরেও নেই, সৈকতেও নেই। কোথায় গেল জিনা?

জোরে জোরে হাঁপাচ্ছে মুসা। নুড়ি মাড়িয়ে যাওয়ার সময় জোরাল মচমচ শব্দ তুলছে তার জুতো। সেই শব্দের জন্যেই প্রথমবার ডাকটা কানে এল না তার। দ্বিতীয়বারেও না। তৃতীয়বারে শুনতে পেল, 'মুসা! আই, মুসা!'

'লীলা!'

থেমে গেল মুসা। হাপরের মত ওঠানামা করছে বুক। শিসের শব্দ বেরোচ্ছে নাকের ফুটো দিয়ে। জিরানোর জন্যে বালিতে বসে পড়ে দম নিতে লাগল জোরে জোরে।

'মুসা, আমাকে খুঁজছ?'

দৌড়ে আসছে লীলা। বাতাসে উড়ছে চুল। চাঁদের আলো পড়ে ঝিক করে উঠছে চোখের মণি। মড়ার মত ফ্যাকাসে গায়ের চামড়া।

কাছে এসে ঠোঁট ছড়িয়ে হাসল লীলা। আবার করল একই প্রশ্ন, 'মুসা, আমাকে খুঁজছ? এসে পড়েছি।'

এতই মোলায়েম কণ্ঠস্বর, মনে হলো বাতাসের সঙ্গে কানাকানি করে কথা বলছে লীলা, মধুর ঝঙ্কার তুলে। 'কাল দেখা করোনি কেন?'

হাঁটু গেড়ে মুসার পাশে বসে পড়ল সে। চোখে চোখ পড়ল। সম্মোহনী দৃষ্টি। মোলায়েম কণ্ঠে আবার জিজ্ঞেস করল লীলা, 'কাল দেখা করোনি কেন? কোথায় ছিলে? তোমার জন্যে মন খারাপ লেগেছে।'

জবাব দিল না মুসা। মন খারাপ, না শরীর খারাপ? মনে মনে বলল সে। আমার রক্তে খিদে মেটাতে পারোনি বলে! পিশাচী কোথাকার!

আরও কাছ ঘেঁষে এল লীলা। চোখ দুটো স্থির মুসার গলার ওপর। কোন্‌দিকে তাকিয়ে আছে সে বুঝতে অসুবিধে হলো না মুসার। ওর গলার শিরাটার দিকে। শিউরে উঠল।

আবার মুসার চোখের দিকে নজর ফেরাল লীলা। সম্মোহনের চেষ্টা করতে লাগল।

কিন্তু সতর্ক রয়েছে মুসা। আজ আর কোনমতেই ওর সম্মোহনের ফাঁদে ধরা দিল না। তাকে সাহায্য করল আরেকটা জিনিস। লীলার চোখ থেকে চোখ সরাতেই তার কাঁধের ওপর দিয়ে দেখা গেল ডকটা। একটা নৌকায় উঠেছে একজন লোক। হাত ধরে আরেকজনকে উঠতে সাহায্য করছে। ঢেউয়ে নৌকাটা দুলতে থাকায়ই বোধহয় যাকে তুলছে তার উঠতে অসুবিধে হচ্ছে।

জিনা!

ছোট্ট নৌকাটায় জিনাকে তুলে নিচ্ছে জন।

'না!' নিজের অজান্তেই মুসার মুখ থেকে বেরিয়ে এল চিৎকার।

ওর দুই কাঁধ চেপে ধরল লীলা। মিষ্টি গন্ধ মুসার নাকে ঢুকতে আরম্ভ করল। দম আটকে ফেলল মুসা। সুগন্ধী মেশানো কোন ধরনের ওষুধ শুঁকিয়ে শিকারকে অবশ করে দেয় এখানকার ভ্যাম্পায়াররা, কিংবা ঘুম পাড়িয়ে ফেলে নিরাপদে রক্ত খাওয়ার জন্যে, এটা এখন বুঝে গেছে সে।

নৌকার দিকে তাকিয়ে আছে মুসা। জিনা নৌকায় উঠে পড়েছে। দাঁড় তুলে নিয়েছে জন।

'না!' আবার চিৎকার করে উঠল মুসা।

লীলা ভাবল তাকেই বাধা দিচ্ছে মুসা। কাঁধে হাতের চাপ বাড়িয়ে মুসাকে আরও কাছে টানতে শুরু করল।

এত কাছে থেকে ওষুধের প্রভাব পুরোপুরি কাটাতে পারল না মুসা। বোঁ করে উঠল মাথার ভেতর। লীলার হাতের কাছ থেকে যতটা সম্ভব দূরে সরিয়ে নিল নাকটা। ওর কাঁধের ওপর দিয়ে দেখছে নৌকাটা তীর থেকে আস্তে আস্তে সরে যাচ্ছে।

'সত্যি বলছি, মুসা, কাল তোমার জন্যে ভীষণ মন খারাপ লেগেছে আমার,' কানের কাছে প্রায় ফিসফিস করে বলল লীলা। কানের লতি ছুঁলো ঠোঁট।

ওর উদ্দেশ্য বুঝতে পারছে মুসা। মুখটা নামিয়ে নিতে চাইছে গলার শিরায়।

একবার দাঁত ছোঁয়াতে পারলে আর রক্ষা নেই। কুটুস করে ফুটিয়ে দেবে। রক্ত শুষে নিতে শুরু করবে।

মিষ্টি গন্ধ অবশ করে আনতে শুরু করেছে মুসার অনুভূতি।

অন্ধকারে হারিয়ে যাচ্ছে নৌকাটা। ছোট্ট দ্বীপটার দিকে চলেছে। যেটাতে লক্ষ বাদুড়ের বাস। যেটাতে ভ্যাম্পায়ারের বাস।

চলে যাচ্ছে জিনা। নিয়ে যাচ্ছে ওকে জন। দূরে। বহুদূরে। চিরকালের জন্যে।

কিছু করতে না পারলে মুসা নিজেও হারিয়ে যাবে চিরকালের জন্যে! এদিকেও ভ্যাম্পায়ার, ওদিকেও। মনে মনে আল্লাহ্‌কে ডাকতে আরম্ভ করল মুসা। বাঁচতে চাইলে এখনই কিছু করা দরকার। নইলে শেষ করে দেবে ওকে

লীলা।

ধাক্কা দিয়ে লীলাকে সরিয়ে দিল সে। ফাঁক হয়ে গেছে লীলার ঠোঁট। শ্বদন্ত দুটো চিকচিক করছে চাঁদের আলোয়। ধকধক করে জ্বলছে দুই চোখ। তাতে রাজ্যের লালসা।

অবাক লীলাকে আরেক ধাক্কায় বালিতে ফেলে লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াল মুসা।

'মুসা, শোনো! দাঁড়াও! মুসা!'

কিন্তু ততক্ষণে ডকের দিকে দৌড় দিয়েছে মুসা। সরে যাচ্ছে লীলার সম্মোহনী দৃষ্টির মায়াজাল থেকে, মারাত্মক সুগন্ধীর কাছ থেকে দূরে। বালিতে, নুড়িতে পিছলে যেতে লাগল জুতো। মচমচ শব্দ। যতই দৌড়াল কেটে যেতে লাগল মাথার ঘোলাটে ভাবটা। দেখতে পাচ্ছে বোট হাউসের কাছে বাঁধা নৌকা দুটো দোল খাচ্ছে ঢেউয়ে।

পেছনের পকেট থেকে খামটা পড়ে গেল বালিতে। ফিরেও তাকাল না মুসা। তোলার চেষ্টা করল না। ওগুলো এখন অর্থহীন। একাকী জিনার দেখা পাবেও না আর, ছবি দেখিয়ে তাকে বোঝানোরও সময় নেই। ভ্যাম্পায়ারে ধরে নিয়ে যাচ্ছে ওকে, ওদের ভয়ঙ্কর আস্তানায়। ঠেকানো দরকার।

ডকের কাছে আসার আগে গতি কমাল না মুসা। মুখের কাছে হাত জড় করে চেঁচিয়ে ডাকল 'জিনা! জিনা!' বলে।

তার ডাকে সাড়া দিল না জিনা। ফিরে তাকাল না।

সরে যাচ্ছে নৌকাটা। সাগরের পানিতে পড়া চাঁদের ঝিলমিলে ভূতুড়ে আলোতে এগিয়ে যাচ্ছে অন্ধকার দ্বীপটার দিকে। অস্পষ্ট হয়ে আসছে ক্রমে।

বনে ঢাকা দ্বীপ। বাদুড়ে বোঝাই দ্বীপ। ভ্যাম্পায়ারের দ্বীপ।

'ওহ্, খোদা!' ককিয়ে উঠল মুসা। 'বড্ড দেরি করে ফেললাম! অনেক দেরি!'

সমস্ত রাগ গিয়ে পড়ল লীলার ওপর। ওকে দেরি করিয়ে দেয়ার জন্যে সে-ই দায়ী।

প্রচণ্ড রাগে ভয়ডর সব গায়েব হয়ে গেছে মুসার। দাঁতে দাঁত চেপে বলল, 'তোমার ব্যবস্থা পরে করব আমি, শয়তানী! আগে ওই বদমাশটার একটা ব্যবস্থা করি!'

সতেরো

একটা নৌকার বাঁধন খুলতে কয়েক সেকেন্ডের বেশি লাগল না মুসার। দ্রুতহাতে গিঁট খুলে দড়িটা ছেড়ে দিয়ে লাফিয়ে নামল নৌকায়। দাঁড় তুলে নিল।

সময় বয়ে যাচ্ছে। মহামূল্যবান সেকেন্ডগুলোর টিক-টিক টিক-টিক

শব্দটাও যেন শুনতে পাচ্ছে সে।

লীলার ডাক কানে এল। তীরে দাঁড়িয়ে ডাকছে ওকে লীলা। ফিরে যেতে অনুরোধ করছে। ফিরে তাকিয়ে মুসা দেখল, বালির ওপর দিয়ে বোট হাউসের দিকে দৌড়ে আসছে লীলা। চাঁদের আলোয় মনে হচ্ছে যেন উড়ে আসছে। ওকে ধরতে আসছে নিশ্চয়।

ঝপাৎ করে পানিতে দাঁড় ফেলল মুসা। বাইতে শুরু করল। জনকে ধরতে হলে যত দ্রুত সম্ভব এগিয়ে যাওয়া দরকার।

বোট হাউসের কাছে এসে দাঁড়িয়ে গেল লীলা। বুঝতে পেরেছে, তার ডাকে সাড়া দেবে না মুসা। থামবে না। বাকি যে নৌকাটা আছে এখনও, সেটার দিকে ছুটল। শেষবার ফিরে তাকিয়ে মুসা দেখল, নৌকার কাছে ঝুঁকে আছে লীলা। নিশ্চয় দড়ির গিঁট খুলছে।

যতটা ভেবেছিল মুসা, স্রোতের বেগ তার চেয়ে অনেক বেশি। যতই শক্তি দিয়ে সামনে এগোতে চাইছে সে, স্রোত তাকে সরিয়ে দিচ্ছে। এক ফুট সামনে এগোলে দুই ফুট পিছাচ্ছে। কি করে যেন বার বার পিছলে এসে স্রোতের মধ্যে ঢুকে যাচ্ছে নৌকাটা। কাত হয়ে যাচ্ছে, দুলছে ভীষণ। অথচ ঢেউ ততটা নেই।

কাত হলেই পানি ঢুকছে। দেখতে দেখতে মুসার জুতো ভিজে গেল নৌকার তলায় জমা পানিতে। জুতো ভিজল, মোজা ভিজল, জুতোর মধ্যে ঢুকে গেল পানি। এ হারে উঠতে থাকলে নৌকা ডুবে যেতেও সময় লাগবে না। স্রোতের কারণে ঢেউগুলোও কেমন অশান্ত এখানে। নৌকার কিনারে বাড়ি লেগে পানির ছিটের ফোয়ারা সৃষ্টি হচ্ছে। চোখেমুখে এসে পড়ছে। চোখ বন্ধ করে ফেলতে বাধ্য করছে ওকে।

নাহ্, পারব না! হতাশা গ্রাস করতে চাইছে মুসাকে। অনেক দেরি করে ফেলেছি আমি।

কিন্তু হাল ছাড়ল না।

চোখ মেলে সামনের দিকে তাকাল। নৌকাটা কোথায়?

দ্বীপে পৌঁছে গেছে নিশ্চয়।

চোখের পাতা সরু করে, নোনা পানির ছিটে বাঁচিয়ে দ্বীপের দিকে তাকাল সে। মেঘে ঢাকা চাঁদের ভূতুড়ে আলোয় কালো সাগরের পটভূমিতে ভয়ঙ্কর অজানা জলদানবের মত লাগছে দ্বীপটাকে।

বিশাল সাগর যেন গিলে নিয়েছে জিনাদের নৌকাটা। চিহ্নও দেখা গেল না ওটার।

ডানা ঝাপটানোর শব্দে আকাশের দিকে মুখ তুলে তাকাল মুসা। খুব নিচু দিয়ে মূল ভূখণ্ডের দিকে উড়ে চলেছে শত শত বাদুড়। ফল খেতে যাচ্ছে। নাকি রক্ত! ওগুলোর মধ্যে কয়টা আছে ভ্যাম্পায়ার?

দ্বীপের আরও কাছে আসতে ওটার ওপরও ঝাঁকে ঝাঁকে বাদুড় উড়তে দেখা গেল। ডানার শব্দ আর কর্কশ, তীক্ষ্ণ চিৎকারে ঢেউয়ের শব্দও চাপা পড়ে যাচ্ছে। খোলা পেয়ে বাতাস বইছে হু-হু করে। দামাল বাতাসে ভর করে উড়ছে

শত শত, হাজার হাজার বাদুড়। উড়ছে, চিৎকার করছে, ডানা ঝাপটাচ্ছে, ডাইভ দিচ্ছে, ওপরে উঠছে, নিচে নামছে। দ্বীপের ওপরের আকাশটাকে ভরে দিয়েছে পঙ্গপালের মত। একসঙ্গে এত বাদুড় জীবনে দেখেনি মুসা। আমাজানের জঙ্গলেও না।

দ্বীপের কিনারে একটা ছোট বোট হাউস চোখে পড়ল ওর। পুরো দ্বীপটাকেই গিলে নিয়ে গাছপালা আর আগাছা এখন খুদে সৈকতটাকেও গ্রাস করতে চাইছে। ঢেউয়ে দুলতে দেখা গেল একটা বোট। নিশ্চয় ওটাই! জিনাকে নিয়ে আসা হয়েছে যেটাতে করে।

খালি নৌকা। দুজনের কাউকে দেখা গেল না ওতে।

ডকের কাছে এনে নৌকা থামাল মুসা। লাফ দিয়ে তীরে নেমে নৌকাটা টেনে তুলল বালিতে। চারপাশে তাকাল। সরু একটা পায়ে চলা পথ বাঁক নিয়ে ঢুকে গেছে জঙ্গলের মধ্যে।

খালিহাতে না গিয়ে অস্ত্র হিসেবে দাঁড়টা হাতে রেখে দিল সে। ভ্যাম্পায়ারের মত মহাক্ষমতাধর শত্রুর বিরুদ্ধে অতি সাধারণ একটা দাঁড়। তুচ্ছ! মনে মনে ডেকে বলল, 'আল্লাহ্, তুমিই এখন আমার সবচেয়ে বড় ভরসা!'

মনে জোর এনে, সাহস সঞ্চয় করে, একটা দাঁড় সম্বল করে দোয়া-দরূদ পড়তে পড়তে পা বাড়াল সে। এগিয়ে গেল পায়ে চলা পথটার দিকে। বুকের ভেতর ধড়াস ধড়াস করছে হৃৎপিণ্ড। মেরুদণ্ডে শীতল শিহরণ।

মাথার ওপর নেমে এসেছে গাছের ডাল। এড়ানোর জন্যে মাঝে মাঝেই মাথা নুইয়ে ফেলতে হচ্ছে। ডানা ঝাপটানোর শব্দের বিরাম নেই। কোন গাছ, কোন ডালই খালি নেই। সবগুলোতে বাদুড় আছে। ওকে দেখে চিৎকার করছে ওগুলো। দাঁড় দিয়ে বাড়ি মেরে ভর্তা বানিয়ে দেয়ার ইচ্ছেটা বহুকষ্টে রোধ করল সে। বাড়ি যদি মারতেই হয় ওগুলোর গুরুকে মারতে হবে, ভ্যাম্পায়ারকে। তাতে অবশ্য রক্তচোষা পিশাচের কিছু হবে কিনা সন্দেহ। ব্রাম স্টোকারের 'ড্রাকুলা' পড়েছে। ছবিও দেখেছে। জেনেছে, ভ্যাম্পায়ার মারতে হলে হৃৎপিণ্ডে কাঠের কীলক ঢুকিয়ে দিতে হয়।

কথাটা মনে পড়তেই আরেকটা বুদ্ধি মাথায় এল চট করে। হাতের দাঁড়টাও কাঠের। মাথাটা যদি চোখা করে নেয়া যায়...কিন্তু ছুরি পাবে কোথায়? হাত দিয়ে ছুঁয়ে দেখল, দাঁড়ের মাথা মোটামুটি চোখাই আছে। প্রচণ্ড শক্তিতে খোঁচা মারলে হয়তো বসিয়ে দেয়া যাবে পিশাচের বুকে। কিন্তু সেটা দিনের বেলায় সম্ভব। কফিনে যখন শুয়ে থাকে ওরা, আধো ঘুম আধো জাগরণের মধ্যে থাকে। এখন রাতে, পূর্ণ জাগরণের মধ্যে? অসম্ভব! মনকে হাত নেড়ে ভাবনাটা দূর করে দিল সে। এতসব যুক্তির কথা ভাবতে গেলে কোন কাজই হবে না। পিছিয়ে যেতে হবে। সব সময় এখন আল্লাহ্-রসুলের কথাই কেবল মনে রাখা দরকার। তাহলে কোন প্রেতেরই ক্ষমতা হবে না তার ধারে কাছে ঘেঁষে।

পথের শেষ মাথায় নিচু চালাওয়ালা কাঠের তৈরি একটা বীচ হাউস।

অন্ধকার। কাছে এসে দেখা গেল কোন জানালায় একটা কাঁচও নেই। চালার ওপর পাক খেয়ে খেয়ে উড়ছে বাদুড়ের ঝাঁক। একটা বাদুড় খোলা জানালা দিয়ে বেরিয়ে এসে মুসার গায়ে ধাক্কা খেতে খেতে শাঁই করে পাশ কেটে সরে গেল, তীক্ষ্ণ ডাক ছেড়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল ঝোপের মধ্যে।

দাঁড়টা দুহাতে শক্ত করে চেপে ধরে জানালা দিয়ে ভেতরে উঁকি দিল মুসা। ঘুটঘুটে অন্ধকার। কিছুই দেখা গেল না।

ওর মনে হলো, জিনাকে নিয়ে এর মধ্যেই ঢুকেছে জন। এই বাড়িটাই ভ্যাম্পায়ারের আস্তানা। দ্বিধা করল একবার। তারপর যা আছে কপালে, ভেবে, দাঁড়ের মাথায় ভর রেখে লাফ দিয়ে উঠে বসল জানালার চৌকাঠে। পা রাখল ভেতরে।

সব ক'টা জানালা খোলা থাকার পরেও ভেতরে ভাপসা গন্ধ। ছত্রাকের গন্ধে ভারী হয়ে আছে বাতাস। আরও একটা বোটকা গন্ধ আছে। বুনো জানোয়ারের? নাকি শুকনো হাড়গোড়! ভাবতে চাইল না আর। দম আটকে রেখে লাভ নেই। কতক্ষণ রাখবে? তারচেয়ে এই বিশ্রী গন্ধযুক্ত বাতাসেই দম নিয়ে পরিস্থিতির সঙ্গে মানিয়ে নেয়া ভাল। তাতে চলাফেরা সহজ হবে।

অন্ধকার চোখে সওয়ানোর জন্যে দাঁড়িয়ে রইল সে। স্থির। কানে আসছে বাইরের একটানা ডানা ঝাপটানোর শব্দ।

ধীরে ধীরে চোখের সামনে ফুটে উঠছে ঘরটার অবয়ব। লম্বা, সরু একটা ঘর। বেডরুম। কিন্তু খাট বা বিছানা নেই।

কোন কিছুই স্পষ্ট নয়। আলো না হলে দেখা যাবে না।

হঠাৎ মনে পড়ল রিকির লাইটারটার কথা। পকেটে হাত দিয়ে দেখল, আছে। বের করে আনল তাড়াতাড়ি

কাঁপা আলোয় দেখতে পেল জিনাকে

এক দিকের দেয়ালের ধার ঘেঁষে বসানো বড় একটা আর্ম চেয়ারে নেতিয়ে আছে। গদি মোড়া একটা বিরাট হাতলে মাথাটা পড়ে আছে।

মরে গেছে ও! মুসার প্রথম ভাবনাই হলো এটা। মেরে ফেলা হয়েছে ওকে!

ভালমত দেখার জন্যে এগিয়ে গেল সে। জিনার হাতে হাত রাখল। গরম। ঠাণ্ডা হয়নি এখনও। নাকের কাছে হাত নিয়ে গেল। না, মরেনি! নিঃশ্বাস পড়ছে!

জানালার কাছে দাপাদাপি শুরু করল কয়েকটা বাদুড়। আরও আসতে লাগল। প্রায় ঢেকে দিল জানালাটাকে। কয়েকটা ঢুকে পড়ল ঘরের মধ্যে। আলোর পরোয়া করল না। যেন এই আলোর সঙ্গে পরিচয় আছে ওদের অবাক কাণ্ড, বন্ধ ঘরে উড়তে গিয়ে ছাতের সঙ্গে কিংবা দেয়ালে ধাক্কা খেল না একটাও।

একটা বাদুড় উড়তে উড়তে আলোর এত কাছাকাছি চলে এল, ডানার ঝাপটায় নিভে গেল লাইটার। খস করে টিপে আবার জ্বালল মুসা। মেঝেতে রাখা একটা হ্যারিকেন চোখে পড়ল। পুরানো, তবে মরচে পড়া নয়। বেশ

ঘষেমেজে রাখা হয়েছে। হ্যারিকেনটা তুলে আরও অবাক হলো। তেল ভরা। আশ্চর্য! ভ্যাম্পায়ারদের আলোর দরকার হয় নাকি? হ্যারিকেনও ব্যবহার করে! মনে পড়ল, কাউন্ট ড্রাকুলার দুর্গে প্রচুর লণ্ঠন ছিল। তবে সেগুলো ব্যবহারের প্রয়োজন পড়ত না কাউন্টের। মেহমান এলে তাদেরকে জ্বেলে দিত।

হ্যারিকেন নিয়ে মাথা ঘামাল না আর। বাদুড়ের দিকেও নজর দেয়ার সময় এখন নেই। জিনা বেঁচে আছে। ওকে বের করে নিয়ে যাওয়া দরকার।

হ্যারিকেন ধরিয়ে লাইটারটা পকেটে রেখে দিল সে। দেখতে লাগল ঘরে কি কি আছে।

জানালা থেকে দূরে দেয়াল ঘেঁষে রাখা একটা জিনিস চোখে পড়ল। চিনতে সময় লাগল না। শাইছে! কেঁপে উঠল মুসা। কফিন! ডালা নামানো। জন নিশ্চয় ওই কফিনে ঢুকে শুয়ে আছে!

আঙুলগুলো আরও শক্ত হয়ে চেপে বসল দাঁড়ের গায়ে।

বেশিক্ষণ ঘরে থাকল না বাদুড়গুলো। বেরিয়ে গেল। ঝটাপটির শব্দ বন্ধ হলো। তবে আবার আসবে ওরা, বুঝতে পারছে মুসা। যে কোন সময় ঝাঁক বেঁধে এসে ঢুকবে ঘরে। এখানে বাদুড়ের নিত্য আসা-যাওয়া, আচরণেই বোঝা যায়। আলফ্রেড হিচককের 'বার্ড' ছবিটার কথা মনে পড়ল। ছবির পাখিগুলোর মত খেপে গিয়ে বাদুড়রা যদি একযোগে এসে এখন আক্রমণ করে ওকে? ছিন্নভিন্ন করতে সময় লাগবে না! ওগুলোর মধ্যে জলাতঙ্ক রোগের জীবাণু বহন করছে এমন বাদুড়ও থাকতে পারে···

উদ্ভট ভাবনাগুলো জোর করে মন থেকে তাড়িয়ে দিয়ে জিনার দিকে ঘুরল সে। কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে ফিসফিস করে ডাকল, 'জিনা! জিনা!'

গলা কাঁপছে ওর।

জিনার কাঁধ চেপে ধরে ঝাঁকি দিয়ে কণ্ঠস্বর আরেকটু চড়িয়ে আবার ডাকল, 'জিনা! ওঠো! এই জিনা!'

শিহরণ বয়ে গেল জিনার শরীরে। কিন্তু চোখ মেলল না।

'জিনা?' আরও জোরে কাঁধ ধরে নাড়া দিল মুসা।

আবার শিহরণ বইল জিনার শরীরে। কিন্তু মাথা তুলল না।

দুই হাতে ওর মাথাটা চেপে ধরে সোজা করল মুসা। চোখের পাপড়ি ধরে পাতা খোলার চেষ্টা করল।

'জিনা! ওঠো! উঠে পড়ো!' ভয়ে কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে আসতে চাইছে মুসার। 'আই, জিনা, প্লীজ! বেরিয়ে যেতে হবে এখান থেকে!'

নড়ে উঠল জিনা।

ভরসা পেয়ে আরও জোরে ঝাঁকাতে লাগল মুসা।

অবশেষে চোখ মেলল জিনা। গুঙিয়ে উঠল। 'কে?'

'আমি, জিনা, আমি! মুসা! জলদি ওঠো! পালাতে হবে!'

পেছনে কারও উপস্থিতি টের পাওয়া গেল।

ঝট করে ঘুরে গেল মুসা।

জন!

ঠোঁট ফাঁক করে, শ্বদন্ত বের করে, জানোয়ারের নখের মত আঙুল বাঁকিয়ে মুসার গলা টিপে ধরতে ছুটে এল সে।

আঠারো

গলা চিরে বুনো চিৎকার বেরিয়ে এল মুসার। নিজের কণ্ঠস্বর নিজেই চিনতে পারল না। ঘরের দেয়ালে দেয়ালে প্রতিধ্বনিত হলো সে শব্দ। বাইরে বাদুড়ের কলরব বেড়ে গেল।

ক্ষণিকের জন্যে থমকে গেল জন। পরক্ষণে আবার আঙুল বাঁকা করে এগিয়ে এল মুসার দিকে। চকচক করছে ওর বড় বড় শ্বদন্ত।

জলজ্যান্ত ভ্যাম্পায়ারকে চোখের সামনে দেখে আতঙ্কে দিশেহারা হয়ে গেছে মুসা। ভাবনার সময় নেই। পরিকল্পনার সময় নেই। দাঁড়টা তুলে ধরল। চোখা দিকটা জনের দিকে করে।

এগিয়ে আসছে জন।

সামনে ছুটে গেল মুসা। কোনভাবেই যাতে মিস না হয়, একবারেই ঢুকিয়ে দিতে পারে জনের বুকে, সেভাবে দাঁড়টা ঠেলে দিল সামনের দিকে।

থ্যাপ করে জনের বুকে লাগল দাঁড়ের মাথা। পাঁজরের হাড় ভাঙার বিশ্রী শব্দ হলো। গলা চিরে বেরিয়ে এল বিকট চিৎকার।

দাঁড়টা ওর বুকে ঢোকেনি।

ঢোকানোর জন্যে টান দিয়ে পিছিয়ে এনে আবার ঠেলে দিতে যাবে মুসা, এই সময় দেখল তার আর প্রয়োজন নেই। হাঁটু ভাঁজ হয়ে পড়ে যাচ্ছে জন। গড়িয়ে পড়ল মেঝেতে।

এত সহজে ভ্যাম্পায়ারকে কাবু করতে পেরে বিমূঢ় হয়ে গেল মুসা। চিৎকার করার জন্যে মুখ খুলেছে, মুখে এসে বসল একটা বড় মথ। থাবা দিয়ে ওটাকে সরাতেই কানে এল জিনার চিৎকার। 'মুসা, মুসা, বাঁচাও আমাকে! মেরে ফেলল!'

চরকির মত পাক খেয়ে ঘুরে গেল মুসা। লীলার সঙ্গে ধস্তাধস্তি করছে জিনা।

এত তাড়াতাড়ি হাজির হয়ে গেল!

বোট হাউসের তৃতীয় নৌকাটার কথা মনে পড়ল মুসার। দাঁড় হাতে লীলাকে গুঁতো মারার জন্যে এগোতে যাবে, এই সময় সাঁড়াশির মত পা চেপে ধরল শক্ত, শীতল কয়েকটা আঙুল। মরেনি জন। এত সহজে মরে না ভ্যাম্পায়ার।

লাথি মেরে পা ছাড়ানোর চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়ে আবার দাঁড়টা তুলে ধরল মুসা। উত্তেজনা, আতঙ্কে গুঁতো মারার কথা ভুলে গায়ের জোরে বাড়ি মারল জনের মাথা সই করে। ঢিল হয়ে এল আঙুলের চাপ। পা'টা ছাড়িয়ে নিল মুসা।

আবার বাড়ি মারল জনকে সই করে। তাড়াহুড়োয় জায়গামত না লেগে অর্ধেক লাগল মেঝেতে। ভেঙে দু'টুকরো হয়ে গেল দাঁড়।

ভালই হলো। দাঁড়ের ডাণ্ডার মত অংশটা ওর হাতে রয়ে গেছে। ভাঙা দিকটা বর্শার ফলার মত চোখা। সেটা বাগিয়ে ধরে লীলার বুকে বসিয়ে দেয়ার জন্যে ছুটল সে।

মুসাকে আসতে দেখে অস্বাভাবিক ক্ষিপ্রতায় লাফ দিয়ে সরে গেল লীলা। শেষ মুহূর্তে যেন ব্রেক কষে দাঁড়াল মুসা। সামলাতে না পারলে দাঁড়টা লাগত জিনার গায়ে। ওর পেটে ঢুকে যেত।

ঘুরে দাঁড়াল আবার মুসা। লীলাকে সই করে দাঁড় তুলে ছুটল।

আবার সরে গেল লীলা।

নেচে উঠল আলোটা। কেন, দেখার জন্যে ফিরে তাকানোর সময় নেই। মুসার নজর লীলার ওপর।

গুঁতোটা এড়াতে পারল না এবার আর লীলা। তবে ঠিকমত লাগল না। যেখানে লাগাতে চেয়েছিল মুসা, তার সামান্য ডানে লাগল, হৃৎপিণ্ডে নয়।

আর্তনাদ করে বুক চেপে ধরে জনের পাশে পড়ে গেল লীলা। গোঙাতে লাগল। ওই সামান্য আঘাতে মরবে না। ঘাড়ের পাশে বাড়ি মারল মুসা। নড়াচড়া বন্ধ হয়ে গেল লীলার।

'জিনা! জলদি চলো...' বলে ওর দিকে ঘুরে দেখল হ্যারিকেনটা হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে জিনা। চোখে অদ্ভুত দৃষ্টি। এগিয়ে যেতে শুরু করল মেঝেয় পড়ে থাকা দুই ভ্যাম্পায়ারের দিকে।

'কি করছ?'

বিড়বিড় করে জবাব দিল জিনা, 'আগুনে নাকি ধ্বংস হয়ে যায় ভ্যাম্পায়ার!'

হতবুদ্ধি হয়ে দাঁড়িয়ে আছে মুসা। কি করবে বুঝতে পারছে না। ভ্যাম্পায়ারের ধ্বংস সে-ও চায়। একটু আগে দাঁড় দিয়ে গুঁতো মেরে তা-ই করতে চেয়েছিল।

দুজনের গায়ে তেল ঢেলে দিল জিনা। মুসাকে জানালার দিকে যেতে বলে নিজেও পিছাতে শুরু করল। দাঁড়িয়ে গেল জানালার কাছে এসে। একটা মুহূর্ত তাকিয়ে রইল পড়ে থাকা দুই ভ্যাম্পায়ারের দিকে।

নড়তে শুরু করেছে লীলা। মরেনি। বেহুঁশ হয়ে ছিল।

দুজনকে সই করে জ্বলন্ত হ্যারিকেনটা ছুঁড়ে মারল জিনা।

কি ঘটে দেখার জন্যে অপেক্ষা করতে চাইল না মুসা। তাড়াতাড়ি জিনাকে নিয়ে বাইরে বেরিয়ে এল। আগুনে সত্যি সত্যি ধ্বংস হবে কিনা ভ্যাম্পায়ার, নিশ্চিত নয় সে। হলে তো ভাল। নইলে ওরা আবার জেগে ওঠার আগেই পালাতে হবে দ্বীপ থেকে।

বুনোপথ দিয়ে ছুটতে ছুটতে সৈকতে এসে পড়ল দুজনে। তিনটে ডিঙি এখন ঘাটে বাঁধা। যেটাতে করে এসেছিল মুসা, সেটাতে দাঁড় নেই। জন যেটায় করে জিনাকে নিয়ে এসেছিল, সেটাতে উঠল।

তাড়াতাড়ি দাঁড় বেয়ে সরে যেতে শুরু করল দ্বীপের কাছ থেকে।

সারাক্ষণ ভ্যাম্পায়ারের আক্রমণের আশঙ্কায় দুরুদুরু করছে বুক। দ্বীপের দিক থেকে কোন বাদুড় নৌকার বেশি কাছে এলেই চমকে উঠছে। ভাবছে বাদুড়ের রূপ ধরে চলে এসেছে জন কিংবা লীলা।

তবে এল না ওরা।

জিনা আবার নেতিয়ে পড়েছে। কোন কথা বলছে না। সাংঘাতিক ধকল গেছে ওর ওপর। নিশ্চয় ভয়াবহ রক্তশূন্যতায় ভুগছে। ফিরে গিয়েই আগে হাসপাতালে পাঠানোর ব্যবস্থা করতে হবে।

মূল ভূখণ্ডের তীর দেখা যাচ্ছে। ফিরে তাকাল মুসা। দ্বীপের দিকে। গাছপালার ফাঁক দিয়ে আগুন চোখে পড়ল মনে হলো। নিশ্চয় বীচ হাউসটাতে আগুন লেগে গেছে।

লাগুক। পুড়ে ছাই হয়ে যাক ভ্যাম্পায়ারের আস্তানা। অনেক জ্বালান জ্বালিয়েছে জন আর লীলা। রিকিকে খুন করেছে।

রিকির কথা মনে হতেই অজান্তে হাত চলে গেল পকেটে। লাইটারটা ছুঁয়ে দেখল মুসা। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে জোরে জোরে নৌকা বাইতে শুরু করল তীরের দিকে।

✡

পরদিন খুব সকালে আবার সৈকতে এসে হাজির হলো সে। দৌড়ে চলল বোট হাউসটার দিকে। ছবির খামটা পড়ে গিয়েছিল ওখানে। প্রচণ্ড এক কৌতূহল টেনে নিয়ে চলেছে ওকে। ছবিগুলো দেখতে চায়। দেখবে জনের ছবি সত্যি উঠেছে কিনা।

আগের রাতে সে যাবার পর আর বোধহয় কেউ আসেনি এদিকে। খামটা বালিতে পড়ে আছে। শিশিরে ভেজা।

উবু হয়ে তুলে নিল। টান দিয়ে মুখ ছিঁড়ে বের করল একটা ছবি। প্রথমেই বেরোল সেই ছবিটা, ফেরিস হুইলের মেটাল কারে পাশাপাশি বসা জন আর জিনার ছবি। স্পষ্ট উঠেছে। বরং বলা যায় জিনার চেয়ে জনের ছবিটা আরও স্পষ্ট। হতবাক হয়ে গেল মুসা। তাড়াতাড়ি বাকি ছবিগুলো বের করে দেখতে লাগল। কোনটাতেই বাদ পড়েনি জন। সবগুলোতে আছে।

এর মানেটা কি? ভ্যাম্পায়ার বিশেষজ্ঞদের তত্ত্ব কি তবে ভুল? পিশাচেরও ছবি ওঠে?

মনের মধ্যে খুঁতখুঁত করতে লাগল ওর। জিনাকে বাঁচানো গেছে বটে, হয়তো জন আর লীলাও ধ্বংস হয়েছে, কিন্তু এই ভ্যাম্পায়ার রহস্যের সমাধান এখনও হয়নি। সমূলে ওদের ধ্বংস করতে হবে। সেটা করা তার একার পক্ষে সম্ভব নয়। মাথা ঘামানোর কাজগুলো তাকে দিয়ে হবে না। কিশোরের সাহায্য দরকার।

মনস্থির করে ফেলল, ফোনে যোগাযোগ করতে না পারলে কিশোরকে নিয়ে আসার জন্যে আগামী দিনই রকি বীচে রওনা হয়ে যাবে।

***